q¡S¡l hRl d-l
S¢ql l¡uq¡e

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বিশ্ব সাহিত্যের দুটো বিভাজন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- উপন্যাসের সংজ্ঞা ও পরিচয় দিতে পারবেন;
- উপন্যাসের উপাদান ও গঠনরীতির পরিচয় দিতে পারবেন;
- উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।

সাহিত্য জীবনের কথা বলে, সাহিত্য সমাজের কথা বলে। সাহিত্য আমাদের মুখোমুখী করে জীবন সত্যের ও সমাজ সত্যের; আমরা উপলব্ধি করি জীবনের তাৎপর্য এবং সামাজিক বাস্তবতা। সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা প্রবেশ করি এমন এক নির্মল আনন্দলোকে যে আনন্দলোক সৃষ্টি হয় সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের দ্বারা।

আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সাহিত্যের অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য সুস্পষ্টভাবে দুটো শিবিরে বিভক্ত। একদল মনে করেন সাহিত্যের বা শিল্পের প্রয়োজন কেবল সাহিত্যের জন্যেই; যাকে বলা হয় 'শিল্পের জন্য শিল্প'। আর অন্য দলে যাঁদের অবস্থান তাঁরা বলেন, না সাহিত্যের জন্যই কেবল সাহিত্য নয়। জীবনের প্রতি সমাজের প্রতি সাহিত্যের অবশ্যই এক প্রকার দায়বদ্ধতা আছে। এ জন্য তাঁরা বলেন 'জীবনের জন্য শিল্প'। এই দুই শিবিরের সাহিত্যবোদ্ধা এবং সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে কার গ্রহণযোগ্য আর কার মত বর্জনীয় তার মীমাংসা খুব সহজ নয়। দু'দলের পক্ষেই রয়েছে নানা যুক্তি, নানা তথ্য, নানা প্রমাণ। তবে দু'পক্ষের মধ্যে কোন এক পক্ষ যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত এমন ধারণা করবার কোন কারণ নেই; তেমনি অন্য পক্ষকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মনে করাও অনুচিত। তাঁদের মধ্যেকার এ-পার্থক্যকে কেবল দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য হিসেবেই মেনে নেয়া উচিত। দু'পক্ষের সাহিত্যিকেরাই সামাজিক সত্যকে অবলম্বন করে জীবনকেই তাঁদের সাহিত্যে উপস্থাপন করতে চান। হয়তো পথ তাঁদের ভিন্ন, এই যা। সাহিত্যের রয়েছে নানা প্রকাশ মাধ্যম- নাঁক, কবিতা, প্রবন্ধ, ছোঁগল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। প্রকাশ মাধ্যমের পার্থক্যের কারণে এক শ্রেণীর সাহিত্য অন্য শ্রেণীর সাহিত্য থেকে আলাদা। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষার সাহিত্যের শুরুতেই পাওয়া গেছে কবিতা। এজন্য কবিতাকে বলা চলে সাহিত্য শিল্পের আদি মাধ্যম। নাঁকের বয়স কবিতার মত অতটা পুরাতন হয়তো নয় কিন্তু বেশ পুরাতন। যীশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগে গ্রিসে রচিত হয়েছিল অপূর্ব সব নাঁক। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃত নাঁটকের বহু প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে।

প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং ছোঁগল্প সাহিত্যের এ-সকল প্রকাশ মাধ্যম তুলনামূলকভাবে বয়সের দিক দিয়ে নবীন। বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব কোনভাবেই সাড়ে তিনশত বছর পেরিয়ে যাবে না। আর ছোঁগল্পের বয়স তো আরো কম। তবে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় 'উপন্যাস' সবার ওপরে স্থান পাবে। মনে রাখবেন, আগে যেমন বলেছি, সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার আঙ্গিকের (Form) মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সাহিত্যের মূল উপজীব্য মানব-জীবন ও মানব-সমাজ। মানব জীবন ও মানব সমাজ কখনো কবিতায়, কখনো নাঁকে, কখনো উপন্যাসে, কখনো প্রবন্ধে, কখনো বা ছোঁগল্পে ধরা পড়ে। সাহিত্যের প্রতিটি আঙ্গিকেরই রয়েছে একান্ত নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য, কিছু নীতি ও রীতি, যার কারণে এক প্রকার মাধ্যম অন্য মাধ্যম থেকে আলাদা। উপন্যাসেরও রয়েছে তেমন কিছু স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করলে উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের পক্ষে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা সহজ হবে।

উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ

শুধু কতকগুলো শব্দের সাহায্যে কোন সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মকে সংজ্ঞায়িত করা অসম্ভব। কারণ তাতে ঐ বিশেষ শিল্পকর্মের সকল বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। এ-কারণে সৃষ্টিশীল বিষয়ের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ। উপন্যাস যেহেতু একটি সৃষ্টিশীল প্রকাশ মাধ্যম, স্বাভাবিকভাবে তার ও সকলের কাছে সমানভাবে গৃহীত কোন সংজ্ঞার্থ

নেই। তবে বৈশিষ্ট্যানুসারে বলা যায়, গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনীকে অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাকে উপন্যাস বলে।

উপন্যাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Novel শব্দটি ইংরেজিতে এসেছে ইতালিয় শব্দ novella থেকে, আর এর অর্থ হচ্ছে 'tale, piece fo news। উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করে J. A Cuddon তাঁর Dictionary of literary terms-এ লিখেছেন 'It is a form of story or prose narrative containing characters, action and incidents and perhaps a plot. অন্যভাবে বলা যায়, Novel is a fictitious prose narrative or tale presenting a picture of the man and women portrayed.

'উপন্যাস' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় উপ+নি+অস; অর্থাৎ 'উপ' পূর্বক, 'নি' পূর্বক 'অস' ধাতুর সঙ্গে 'অ' প্রত্যয় যোগে 'উপন্যাস' শব্দটি গঠিত, যার অর্থ 'উপন্যাস'।

মানুষের জীবন প্রকৃতপক্ষে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার পুঞ্জীভূত রূপ। জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সাফল্য-ব্যর্থতা, ভালবাসা-ঘৃণা এ-সকল বিপরীত মুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হাত ধরাধরি করে চলে। সুখের উল্টো পিঠেই যেন থাকে দুঃখ, আনন্দের পাশেই থাকে বেদনা। একজন ঔপন্যাসিক মানুষের সমগ্র জীবনকে যেহেতু তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ করতে চান ফলে তাঁকে অর্জন করতে হয় জীবন সম্পর্কে পরিপূণ ধারণা। কিন্তু জীবন বড় জটিল এবং সূক্ষ্ম, আর তার চেয়ে বেশি সূক্ষ্ম ও বিচিত্র মানুষের মন। সুতরাং ঔপন্যাসিককে মানুষের জীবনের বহির্বাস্তবতা ও আন্তর্বাস্তবতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয়। কারণ তিনি মানব মনের গহীনে ভ্রমণ করেন।

উপন্যাস যেহেতু বর্ণনাত্মক, ফলে তার বাহন হচ্ছে গদ্য। গদ্যের যৌক্তিক শৃঙ্খলায় উপন্যাস গতি পায় এবং বিকশিত হয়। বিশ্বের প্রতিটি সাহিত্যকেই উপন্যাস প্রাপ্তির জন্য ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে যতদিন না ঐ ভাষার গদ্য একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরে নানামুখী চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য যে ভিত্তি ও অবস্থান অর্জন করেছিল তাকে অবলম্বন করেই প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৫৮ সালে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন।

উপন্যাসের উপাদান ও গঠনরীতি

উপন্যাসের প্রধান উপাদান ৫টি : ১. ঘটনা (Plot), ২. চরিত্র (Character), ৩. সংলাপ (Dialogue), ৪. ভাষা (Diction), ৫. ঔপন্যাসিকের জীবন দর্শন (Authors philosophy or thought)।

একটি উপন্যাসের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে তাতে একটি ঘটনা থাকতে হবে, তা যত ছোঁই হোক না কেন। সেই ঘটনাটি কতকগুলো চরিত্রকে অবলম্বন করে বিকশিত, পল্লবিত এবং পরিণামমুখী হয়ে উঠবে। আর চরিত্রগুলোর বিকাশের প্রয়োজনে লেখক সংলাপের সাহায্য গ্রহণ করেন, তার উপযোগী একটি ভাষাভঙ্গি নির্বাচন করেন এবং উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনকে পাঠকের সামনে ক্রমশ উন্মোচন করেন।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন, সকল শিল্পেরই মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের সার্বিক সত্যকে প্রকাশ করা। উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। সে কারণে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে মানুষ কিন্তু সে মানুষ আমাদের চারপাশের টুকরো টুকরো মানুষ নয়, অখণ্ড, অভিজাত মানুষ। একজন মানুষ তাঁর জীবনের নানা কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন, তিনি হয়তো বেঁচেও থাকেন দীর্ঘদিন। কিন্তু ঔপন্যাসিকের কাছে তাঁর জীবনের নির্বাচিত অংশ যখন উপন্যাসে অবলম্বিত হয়, তখন কিন্তু তাকে খণ্ডিত করা হয় না। আমরা প্রতিদিন যে সকল কর্মসম্পাদন করি, তার সবকিছুই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য মূল্যবান নয়, এমন কি প্রতিদিনের জন্যও মূল্যবান নয়। সে কারণে ঔপন্যাসিক জীবনের সেই অংশগুলোকেই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নির্বাচন করেন যা তাঁর সমগ্র সত্তাকে প্রতিবিম্বিত করে। ঘটনা নির্বাচনের কৃতিত্বের ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করে উপন্যাসের সাফল্য বা ব্যর্থতা।

একই সঙ্গে ঔপন্যাসিককে সময় নির্বাচনের ব্যাপারেও হতে হয় সতর্ক। কোন সময়ের বা কোন সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা বিকশিত হচ্ছে তাকেও সমান গুরুত্বের সঙ্গে ঔপন্যাসিককে বিবেচনা করতে হয়। সমালোচকদের বিবেচনায়, কার্যকারণ শৃঙ্খলা সূত্রে আবদ্ধ করে উপন্যাসের চরিত্র এবং সময়ে ব্যবহারে যে ঔপন্যাসিক যত সতর্ক তাঁর উপন্যাস ততো সার্থক।

জহির রায়হান রচিত 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে আমরা দেখবো এ-উপন্যাসের দুটি প্রধান চরিত্র, মন্তু আর টুনি এখানে ঔপন্যাসিক তাদের জীবনের সেই সময় এবং কর্মকে শব্দে রূপ দিয়েছেন যার মাধ্যমে ঐ দুটি মানব-মানবীর চাওয়া-পাওয়া,

আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে পাঠক সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। তাদের জীবনের কার্যকারণ শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত সময়ের নির্বাচিত ঘটনাংশই পাঠককে একটি সামগ্রিক (Total) ধারণা প্রদানে সমর্থ হয়েছে। আর ঐ প্রধান চরিত্র দুটোকে বিকশিত এবং বিশ্বাস্য করে উপস্থাপনের জন্য লেখক একটি সামাজিক পরিমণ্ডল এবং সামাজিক সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ

আগেই বলেছি, সৃষ্টিশীল বিষয়ের ব্যাপারে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন মত নির্ধারণ করা বেশ দুরূহ। উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগের বেলাতে সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে সে কারণেই রয়েছে মতভেদ। অধিকাংশের মতে ঘটনা প্রধান উপন্যাস প্রধানত চার শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। সেগুলো হলো :

১. সামাজিক উপন্যাস
২. ঐতিহাসিক উপন্যাস
৩. পৌরাণিক উপন্যাস
৪. আঞ্চলিক উপন্যাস

এর বাইরে আবার অনেকে 'কাব্যধর্মী উপন্যাস' এবং ' ডিটেকটিভ উপন্যাস' নামে দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর কথা বলেন। এবার আসুন আমরা উল্লিখিত উপন্যাসের প্রধান প্রধান শ্রেণী সম্পর্কে খানিকটা বিস্তারিত আলোচনা করি।

১. সামাজিক উপন্যাস

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজেই তাঁর অবস্থান এবং সমাজকে কেন্দ্র করেই তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। যে উপন্যাসে সমাজ জীবনের বাস্তব ঘটনা বা কাহিনীই প্রধান অবলম্বন তাকে সামাজিক উপন্যাস বলা যায়। সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বিষয়াবলি যেমন পরিবার, রাজনীতি, দেশ, ধর্ম, দর্শন এসকল বিষয় স্বাভাবিকভাবে স্থান করে নেয় সামাজিক উপন্যাসে। সমাজের সম্ভাবনা, তার সবলতা-দুর্বলতা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলোকে ঔপন্যাসিক কখনো সহমর্মিতায় কখনো বা সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামাজিক উপন্যাসে উপস্থাপন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ' ও 'চোখের বালি'; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীসমাজ, 'দেনা পাওনা', 'গৃহদাহ'; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি', 'আরোগ্য নিকেতন', 'গণ দেবতা', 'ধাত্রী দেবতা' ও 'পঞ্চ গ্রাম'; বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'ইছামতি, 'পথের পাঁচালী, ও 'অপরাজিত'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের 'ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি ও 'দিবারাত্রির কাব্য'; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লাল সালু' এবং শওকত ওসমানের 'জননী' প্রভৃতিকে সামাজিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

২. ঐতিহাসিক উপন্যাস

ইতিহাসের বিশাল জগৎ থেকে কোন চরিত্র বা ঘটনা নিয়ে যে উপন্যাস রচিত হয় তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে। ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত না করে ঔপন্যাসিক নতুন করে তার মধ্যে একটি তাৎপর্য আবিষ্কারের বাসনা থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। তবে সব সময় লেখকের পক্ষে ইতিহাসের উপাদানকে অবিকলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে লেখক তাতে কল্পনার রঙ মিশিয়ে দেন। এতে ইতিহাস বিকৃত হয় না বরং নতুন তাৎপর্য লাভ করে; পাঠকের সামনে প্রচলিত ইতিহাসকে নতুনভাবে মূল্যায়নের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী, 'রাজসিংহ' ও 'চন্দ্রশেখর'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি, 'বউ ঠাকুরানীর হাঁ'; রমেশচন্দ্রের 'জীবন প্রভাত' ও 'জীবন সন্ধ্যা', প্রভৃতি ঐতিহাসিক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

৩. পৌরাণিক উপন্যাস

পুরাণ বা মিথকে নির্ভর করে যে-সকল উপন্যাস রচিত হয়, তাকে বলা যায় পৌরাণিক উপন্যাস। আদিকালের মানব সমাজের লোকবিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, তাদের সংস্কারকে আমরা পুরাণ বলে জানি। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা ইলিয়াড, ওডিসিতে সেই কালের মানুষের যে কর্মকাণ্ড বা আচার-আচরণের পরিচয় পাই তাকে আমরা পৌরাণিক জগতের বিষয় বলে বিবেচনা করতে পারি। আধুনিক কালের অনেক মানুষই পুরাণের জগতের কাহিনীকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনায় উৎসাহী হয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে রচিত জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাসটি সমগ্র পৃথিবীর উপন্যাস সম্পর্কিত

ধারণাকে এক সময় প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। বাংলা ভাষায় সত্যেন সেন 'অভিশপ্ত নগরী' ও 'পাপের সন্তান' নামে দুটি অসাধারণ পৌরাণিক উপন্যাস রচনা করেছেন। তাছাড়া শওকত ওসমানের 'ক্রিতদাসের হাসি' এবং সেলিনা হোসেনের 'কালকেতু ফুল্লারা'কেও এক অর্থে পৌরাণিক উপন্যাস বলা যায়।

৪. আঞ্চলিক উপন্যাস :

কোন বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি, তাদের হাসি কান্না এমনকি তাদের আচরণ ও উচ্চারণ অবিকৃত ভঙ্গিতে যে-সকল উপন্যাসে স্থান পায় তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায়। একই দেশের মধ্যে হলেও, প্রতিটি অঞ্চলেই থাকে কিছু পার্থক্যসূচক স্বাতন্ত্র্য। খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যেও বেশ লক্ষ্যযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। যেমন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বা নোয়াখালি অঞ্চলের মানুষেরা শুধু ভাষার দিক দিয়েই নয় জীবনরীতির অনেক বিষয়ের দিক দিয়েই বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের মানুষ থেকে আলাদা। একজন ঔপন্যাসিক যখন বিশেষ অঞ্চলের মানুষের এই সাংস্কৃতিক ও নৃ-তাত্ত্বিক পার্থক্যকে ফুটিয়ে তুলে কোন উপন্যাসকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন তখনই আঞ্চলিক উপন্যাস সার্থকতা লাভ করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'; সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোড়াই চরিত মানস'; দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'; আলাউদ্দীন আল আজাদের 'কর্ণফুলি'; অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

এছাড়াও গঠনকৌশল, জীবন দৃষ্টির ও শিল্পচেতনার পার্থক্যের দিক দিয়ে উপন্যাসকে আরও অনেকভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায়। যেমন, কাব্যধর্মী উপন্যাস, ভ্রমণ উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, গোয়েন্দা উপন্যাস, প্রতীকী উপন্যাস, মহাকাব্যিক উপন্যাস প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পৃথিবীর সাহিত্য প্রধানত কোন দুটি ভাগে বিভক্ত?

১. ----------

২. সাহিত্য আমাদেরকে কিসের মুখোমুখি করে?

২. ----------

৩. সাহিত্যের যে নানা প্রকাশ মাধ্যম রয়েছে সেগুলো কী কী?

৩. ----------

৪. পৃথিবীর সকল সাহিত্যেরই আদিরূপ কী?

৪. ----------

৫. জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে সাহিত্যের কোন মাধ্যমটি সবার ওপরে স্থান পাবে?

৫. ----------

৬. ঔপন্যাসিককে বিশেষভাবে কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হয়?

৬. ----------.

৭. উপন্যাসের প্রধান উপাদান কয়টি? সেগুলোর নাম লিখুন।

৭. ----------.

৮. সকল শিল্পেরই মূল লক্ষ্য কী?

৮. ----------

৯. ঘটনা প্রধান উপন্যাস প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?

৯. ----------

১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কোন ধরনের উপন্যাস?

১০. ----------

উত্তরমালা

১. একদল বিশ্বাস করেন 'শিল্পের জন্য শিল্প' আর অন্য দল 'জীবনের জন্য শিল্প'
২. সাহিত্য আমাদের জীবন-সত্যের ও সমাজ-সত্যের মুখোমুখি করে দেয়।
৩. নাঁক, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোঁগল্প ইত্যাদি।
৪. পৃথিবীর সকল সাহিত্যেরই আদিরূপ হচ্ছে কবিতা।
৫. জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে উপন্যাস সবার ওপরে স্থান পাবে।
৬. ঔপন্যাসিককে মানুষের জীবনের বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হয়।
৭. উপন্যাসের প্রধান উপাদান পাঁচটি। সেগুলো হলো : ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, ভাষা ও ঔপন্যাসিকের জীবন দর্শন।
৮. সকল শিল্পেরই মূল লক্ষ্য মানব জীবনের সার্বিক সত্যকে প্রকাশ করা।
৯. ঘটনা প্রধান উপন্যাস প্রধানত চার প্রকার। সেগুলো হচ্ছে : সামাজিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৌরাণিক উপন্যাস ও আঞ্চলিক উপন্যাস।
১০. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' একটি সামাজিক উপন্যাস।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- হাজার বছর ধরে উপন্যাসে বিধৃত সমাজের বর্ণনা দিতে পারবেন।

ইউরোপিয় সাহিত্যে বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটে। দানিয়েল ডিফো তাঁর রবিন্‌সন ক্রুশো (১৭১৯) রচনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষকে সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু করে তুললেন এবং বিশ্বসাহিত্যের কাছে পৌঁছে দিলেন এই বার্তা যে, গোষ্ঠী জীবনের যে সাহিত্য সমগ্র মধ্যযুগের চর্চার বিষয় ছিল, তার কাল ফুরিয়েছে। এই নতুন ধরনের সাহিত্য মাধ্যম খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয় সমগ্র পশ্চিমা সাহিত্যে। ডিকেনস্ ও জর্জ এলিয়েট, বালজাক ও জোলা, দস্তয়ভস্কি ও টলস্টয় তাঁদের অসাধারণ রচনাকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁদের কালে উপন্যাসকে মহত্তম শিল্প মাধ্যমে পরিণত করেন। বিংশ শতাব্দীতেও যাঁদের উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের মধ্যে জয়েস, প্রুস্ত ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এবং নবোকভ প্রধান।

বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব

এ-কথা প্রায় আমরা সবাই মেনে নিয়েছি যে বাংলা উপন্যাস ইংরেজি সাহিত্যের সরাসরি প্রভাবে উদ্ভূত এবং সমৃদ্ধ। তবে অনেক প্রাচীন সাহিত্যেই উপন্যাসের নানা লক্ষণ ও ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য যেমন- রামায়ণ, মহাভারতে বাস্তব সমাজ চিত্রের যে ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া এবং সামাজিক মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার যে ছবি পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে উপন্যাসের আদি লক্ষণ। সংস্কৃত গদ্য সাহিত্য যেমন- 'কথা সরিৎসাগর', বেতাল পঞ্চবিংশতি', দশকুমার চরিত', 'কাদম্বরী' প্রভৃতির মধ্যেও গল্প বর্ণনার প্রথাবদ্ধ রীতির অন্তরালে উপন্যাসের মৌলিক উপাদানসমূহ খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া জাতরেক গল্পগুলোর মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবন বর্ণনার সূত্রে বাস্তব জীবনের লোভ-লালসা, ভক্তি ভণ্ডামি, সৌহার্দ্য-ঈর্ষার যে চিত্র পাওয়া যায় তা যে কোন উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অনুরূপ।

শুধু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেই নয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও পাওয়া যায় উপন্যাসের বেশ কিছু পূর্ব লক্ষণ। বাংলা ভাষায় রচিত লৌকিক ধর্ম সাহিত্য যেমন 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'মনসামঙ্গল' দেবী কীর্তনের পাশাপাশি সমকালীন মানুষ, তাদের জীবনের নানা জটিলতা ও সম্ভাবনা নিখুঁতভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। বাস্তবতার নিখুঁত রূপায়ণই হচ্ছে উপন্যাস রচনার প্রাথমিক শর্ত। এছাড়াও চৈতন্য বিষয়ক সাহিত্য, ময়মনসিংহ গীতিকা, বাংলা রোমান্সমূলক কাব্যগুলোতে পাওয়া যায় উপন্যাসের নানাবিধ লক্ষণ ও চিহ্ন। প্রাচীন সাহিত্যের উপন্যাসের যে পূর্বলক্ষণগুলো পাওয়া যায় তা একটি কথা প্রমাণ করে যে বাংলা ভাষায় উপন্যাস একেবারে 'নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময় বা অজ্ঞাত প্রহেলিকার মত' হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসের ছদ্মবেশী উপস্থিতি এবং সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল, ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শ তাকে কেবল রূপ, রীতি ও প্রকৃতি গঠনে সহায়তা করেছে মাত্র।

উপন্যাস সৃষ্টির জন্য গদ্যের যে সাবলীলতা প্রয়োজন তার আয়োজন চলে উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর ধরে। ১৮০১ সালে ফোঁ উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা গদ্য বিকাশের একটি পথ উন্মোচিত হয়। সে পথের প্রথম সচেতন পথিক হিসেবে বাংলাদেশে অভ্যুদয় ঘটে সংবাদপত্রের, কারণ গদ্যই হচ্ছে সংবাদপত্রের বাহন। ১৮১৮ সালে বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের পর থেকে সামাজিক-ধর্মীয় বা সমাজ সংস্কারমূলক সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা। রাজা রামমোহন রায় তাঁর ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলকাতার তৎকালীন সমাজ জীবনে যে বিক্ষোভ ও তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রতিটি ঘাত প্রতিঘাতই ধরা পড়ল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। শুধু তর্ক-বিতর্কই নয় সমগ্র দেশের বাস্তব জীবনের ছবিও ক্রমে ক্রমে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় উঠে আসতে লাগল। এজন্য বলা হয় যে 'উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত হইয়াছে, সংবাদপত্রের এই সামাজিক প্রভাব বাংলা গদ্যের চেহারাকে একদিকে যেমন বদলে দিল পাশাপাশি দেশ জুড়ে তৈরি করলো সংবাদভূক পাঠক শ্রেণী। নব উদ্ভূত এই পাঠক শ্রেণীর চাহিদাও বাংলা ভাষায় উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয় প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-কে ঊনবিংশ শতাব্দীর কোলকাতা কেন্দ্রিক সামাজিক জীবনের বাস্তব বর্ণনায়, চরিত্র-চিত্রণে ও মননশীলতায় 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হলেও বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস হিসেবে সজীব ও প্রাণবন্ত।

বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে গণ্য। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ নন্দিনী' প্রকাশিত হয়। কাহিনী নির্মাণে, চরিত্র চিত্রণে ও ভাষার ব্যবহারে এ উপন্যাসে তিনি যে রূপ ও রীতি নির্ধারণ করেন বহুদিন পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস তার বাইরে যেতে পারেনি। 'দুর্গেশ নন্দিনী' ছাড়াও 'কপাল কুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'চন্দ্র শেখর' (১৮৭৫), 'আনন্দমঠ'(১৮৬৬) প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের নানামুখী উপন্যাস প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। বঙ্কিমের সমকালে উপন্যাস রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর রচিত 'বিষাদ সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

বঙ্কিম চন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সর্বাধিক। বঙ্কিমের উপন্যাসর ইতিহাস ও সমাজ চেতনার যে ছবি ছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে অবিকল সে ছবিই আঁকলেন না। প্রাথমিক অবস্থায় ইতিহাস অবলম্বনে দু'একটি উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসই সমাজ, মনস্তত্ত্ব ও রাজনীতি নির্ভর। 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'গোরা' (১৯০৯), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ উপন্যাস। প্রকৃতপক্ষে, এ সকল উপন্যাসের মধ্য দিয়েই বাংলা উপন্যাস হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মানের উপন্যাস।

বাংলা উপন্যাসকে সাধারণ পাঠকের কাছে জনপ্রিয় ও সমাদৃত করে তোলার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকার কোন তুলনা নেই। রবীন্দ্র পরবর্তী এই ঔপন্যাসিক বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা অসামান্য ভঙ্গিতে তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যুক্ত হয়েছিল দীর্ঘকালের অবহেলিত নারী সমাজের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও দরদ। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষার নিপুণ তুলিত শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া হিন্দু সমাজের নানা আচরণ এবং সংস্কারের চিত্রও শরৎচন্দ্র পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছিলেন। তাঁর রচিত 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'পল্লী সমাজ' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (চার খণ্ড ১৯১৭-৩৩) 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'গৃহদাহ ' (১৯২০), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩), 'পথের দাবী' (১৯২৬) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর বাংলা উপন্যাস অর্জন করেছে নানারূপ বৈচিত্র্য। জীবন চিত্রণের ক্ষেত্রে, উপন্যাসের গঠন কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে, জীবনোপলব্ধিতেও তার প্রকাশে এ-সময়ের উপন্যাস বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য অর্জন করেছে। একাধিক শক্তিমান ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবে বাংলা উপন্যাস সমৃদ্ধ থেকে ক্রমশ সমৃদ্ধতর হয়েছে। যাঁদের রচনার মাধ্যমে বাংলা উপন্যাস অর্জন করেছে এই সিদ্ধি তাঁদের মধ্যে নরেশ সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪); বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১); অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬); প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬); বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৮৮) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯); প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-৮৩), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-৬৫); সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-৮০), কমল কুমার মজুমদার (১৯১৫-৭৯); সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-৮৬); বনফুল (১৮৯৬-১৯৭৯); এবং সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের উপন্যাস

বাংলা উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবার পরও অর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক কারণে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের তুলনায় বাংলাদেশের উপন্যাস চারিত্র্যে ও চিত্রে স্বতন্ত্র। নদীমাতৃক বাংলাদেশের উপন্যাস চারিত্র্যে ও চিত্রে স্বতন্ত্র। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাস্তবতা কৃষিনির্ভর জীবন, জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বোধ ও এ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার মানুষের সঙ্গে একটি অনিবার্য পার্থক্য তৈরি করেছে। ৭১ সালের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ যে স্বতন্ত্র জীবন ধারা অর্জন করেছে তাকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের উপন্যাস। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে লক্ষ করা যায় কোলকাতা কেন্দ্রিক উপন্যাসের সঙ্গে একটি অমোচনীয় স্বাতন্ত্র্য। সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি ও বাস্তব জীবন উপন্যাসে যতটা প্রতিফলিত হয় অন্য কোন সাহিত্য মাধ্যমে ততটা হয় না। সে কারণেই বিভাগপূর্ব ও বিভাগোত্তর কালের কয়েক দশকে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছে বাংলাদেশের উপন্যাসে ধরা পড়েছে তার নিখুঁত ছবি। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর মোহাজের ও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের এক পবিত্র ও শ্রেষ্ঠতম ঘটনা। ভাষার প্রশ্নে এবং শহীদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাঙালির মধ্যে যে নতুন চেতনার সঞ্চার হল তা বাঙালি জীবনকে নিয়ে গেছে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের দিকে। সে পরিবর্তনের জোয়ার তীব্রতর হয়ে উপলব্ধি হয়েছে আমাদের স্বাধীনতাও স্বাধীকার অর্জনের আন্দোলনেও। এর পরিণাম হিসেবে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। এ সকল ঘটনা বাংলাদেশের সমাজ ও জনজীবনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, বাঙালির চেতনায় যে নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় বাংলাদেশের উপন্যাসে। তার একদিকে কৃষিভিত্তিক পল্লীজীবন অপরদিকে আধুনিক দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ নাগরিক জীবন, এক দিকে বাংলাদেশের ঐশ্বর্যময় বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা, অপর দিকে আধুনিক মানুষের জটিল অন্তর প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ; এক দিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ, অপর দিকে রোমান্টিক কল্পনার বিলাস; একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ পটভূমিকায় মানুষের অস্থিরতা, অপরদিকে হৃদয়ের চিরন্তন পটে প্রতিষ্ঠিত প্রেমিক মানুষ, সবই বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান)

বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সেখানে উপন্যাস কোন পদ্ধতিগত ধারাবাহিকতায় রচিত হয়নি। ফলে নানা বিষয়ে ও নানা ধরনের উপন্যাস সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। নানা বিষয় ও নানা ভঙ্গিতে রচিত বাংলাদেশের উপন্যাসগুলোকে নিম্নলিখিত ধারায় বিভক্ত করা যায়।

১. গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস :

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু', কাঁদো নদী কাঁদো', আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ি', সরদার জয়েন উদ্দীনের 'আদিগন্ত', জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'চন্দ্র দ্বীপের উপাখ্যান', কাজী আফসার উদ্দিনের 'চড়ভাঙা চর', শওকত ওসমানের 'জননী' আবুল মনসুর আহমদের 'আবেহায়াত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২. নগর জীবনের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস ঃ

আবুল ফজলের 'জীবন পথের যাত্রী', রশিদ করিমের 'উত্তম পুরুষ' ও প্রসন্ন পাষাণ', আবু রুশদের 'সামনে নতুন দিন', 'ডোবা হল দীঘি' ও 'নোঙর', দিলারা হাশেমের 'ঘর মন জানালা', আমজাদ হোসেনের 'অসামাজিক কাহিনী', নীলিমা ইব্রাহিমের 'বিশ শতকের মেয়ে', আহসান হাবিবের 'অরণ্য নীলিমা', আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'নাম না জানা ভোর' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩. নগর ও গ্রামের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা', শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক', সরদার জয়েন উদ্দিনের 'অনেক সূর্যের আশা', আবুল মনসুর আহমদের 'জীবন ক্ষুধা' আবুল ফজলের 'রাঙা প্রভাত' আনোয়ার পাশার 'নীড় সন্ধানী' ইত্যাদি।

৪. আঞ্চলিক জীবনচিত্র প্রধান উপন্যাস

আলা উদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী', তাসাদ্দুক হোসেনের 'মহুয়ার দেশে', শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সারেং বৌ', শামসুদ্দিন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা', ও 'কাঞ্চন মালা', সরদার জয়েন উদ্দিনের 'পান্নামতি', ইত্যাদি।

৫. মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক চেতনা সমৃদ্ধ উপন্যাস
আলাউদ্দিন আল আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' ও 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন', রাজিয়া খানের 'বটতলার উপন্যাস' ও 'অনুকল্প', সৈয়দ শামসুল হকের 'দেয়ালের দেশ', 'এক মহিলার ছবি', অনুপম দিন' ও 'সীমানা ছাড়িয়ে', সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা', শওকত আলী 'পিঙ্গল আকাশ' ইত্যাদি।

৬. ঐতিহাসিক চেনা-সমৃদ্ধ উপন্যাস :
শামসুদ্দিন আবুল কালামের 'আলম নগরের উপকথা', সরদার জয়েন উদ্দিনের 'নীল রঙ', আবু জাফর শামসুদ্দিনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' ইত্যাদি।

৭. বিবিধ বিষয় অবলম্বনে রচিত উপন্যাস :
শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' ও 'সমাগম', সত্যেন সেনের 'রুদ্ধদার মুক্তপ্রাণ', আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'শেষ রজনীর চাঁদ ইত্যাদি।

হাজার বছর ধরে : উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক

জহির রায়হান ছিলেন নানামুখী প্রতিভার অধিকারী। ঔপন্যাসিক, ছোঁ গল্পকার, চিত্র পরিচালক এবং চিত্র প্রযোজক হিসেবে সমকালে এবং আজও জহির রায়হানের সুখ্যাতি রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ছাত্র অবস্থাতেই তিনি খ্যাতিমান লেখক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। শুরুতে কিছুদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত থাকলেও মূলত তিনি আমৃত্যু চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে জহির রায়হান যে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা সুলভ নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর অত্যাচার ও মানবতার যে অবমাননার কথা এর সেলুলয়েডে বন্দী করে রেখেছেন তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক নির্ভরযোগ্য ও অসামান্য দলিল। সাহিত্য রচনার শুরুতে তিনি গল্পকার হিসেবে আবির্ভূত হলেও উপন্যাস রচনাতেই তার সাফল্য সর্বাধিক। চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলেই জহির রায়হানের অধিকাংশ উপন্যাসে চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্মাণ ও সংলাপ পদ্ধতি প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল দেখা যায়। এর ফলে তাঁর উপন্যাসগুলো একটি তাৎপর্যপূর্ণ নতুন শিল্প ভঙ্গিতে নির্মিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলোতে লক্ষ করা যায় সমাজ, রাজনীতি ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবন সম্পর্কে কতকগুলো মৌলিক প্রশ্ন। সে প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো লেখক প্রদান করেন নি কিন্তু পাঠকের মনকে একটি নতুন চিন্তার সূত্র প্রদান করতে সমর্থ হয়েছেন।

'হাজার বছর দরে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। এর আগে তাঁর গল্প গ্রন্থ 'সূর্য গ্রহণ (১৯৬৫) এবং একটি উপন্যাস 'শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০) প্রকাশিত হয়েছিল। 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটিতে লেখক বস্তুত হাজার বছরের পুরনো অচল, অনড় ও পরিবর্তনশীল গ্রাম বাংলাকে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে উপস্থাপন করলেন। উপন্যাসটির নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি জীবনান্দ দাশের একটি কবিতার চরণ তেকে সরাসরি ঋণ গ্রহণ করলেন (হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি)। জীবনান্দ তাঁর ঐ চরণের মাধ্যমে বাংলার পথে প্রান্তরে ভ্রমণরত যে পরিব্রাজক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন জহির রায়হান যেন তারই বর্ণময় রূপ তুলে ধরলেন এ-উপন্যাসে। টুণি, মন্তু, আম্বিয়া, বুড়ে মকবুল এরা কেবল একটি চরিত্রই নয় তাঁরা এক বিশাল ব্যাপ্ত সময়ের প্রতিনিধি।

'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) জহির রায়হানের অন্যতম রচনা। বাংলাদেশের গ্রামীণ বাস্তবতার দীর্ঘ পরিসরকে ঔপন্যাসিক তাঁর রচনার পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যে গ্রামীণ জীবন হাজার বছর ধরে উপন্যাসের পটভূমি সেখানে তেমন কোন চলমানতার ছোঁয়া নেই। প্রথাবদ্ধ, বিস্তরঙ্গ, উন্নয়ন বিহীন গ্রামীণ বাস্তবতা এবং সেই গ্রাম সম্পর্কিত সহজ সরল প্রায় নিরক্ষর মানবমণ্ডলীর জীবনসত্য উঠে এসেছে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে। কিন্তু লেখক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতির মধ্যেও খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছেন চিরকালের মানবিক আবেগ ও তার প্রাণময় স্পন্দন। এ উপন্যাসে লেখক কোন শক্তিশালী চরিত্র সৃষ্টি কিংবা চরিত্রের উত্থান-পতন না দেখিয়ে তিনি সন্ধান করেছেন জীবনের অখণ্ডরূপ। আর সে অখন্ড রূপের এক একটি উপকরণ হিসেবে বুড়ো মকবুল, সুরত আলী, ছমির শেখ, গনু মোল্লা, রশীদ, আবদুল, মন্তু, টুনি, আম্বিয়া, হালিমা, হীরন, সালেহা, আমেনা, ফাতেমা প্রভৃতি - চরিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামের ঐ সকল মানুষের জীবনে ঘটনার তেমন কোন বৈচিত্র্য নেই, অতি সাধারণ তাদের চাওয়া-পাওয়া। সমালোচকের ভাষায় 'তাদের জীবনের দিগন্ত প্রসারিত নয়, তাদের জীবনে চিরসঙ্গ, দারিদ্র্য, ঈর্ষা, কলহ আর অবুঝ ভালবাসা। জহির রায়হান এই জীবনের চিরন্তনতার বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন এই উপন্যাসে। সামন্ত সমাজের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি, নারীর প্রতি পুরুষের শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচারের চিত্র অঙ্গনে জহির রায়হান সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। বুড়ো মকবুল যখন 'জোড়া বউকে ঢেকির উপরে তুলে দিয়ে রাত জেগে ধান ভানে', 'তখন পাশের বাড়ির আম্বিয়ার যে গান ভেসে আসে, তার মধ্য দিয়েই যেন সমাজের মুক্তিহীন কারাগারে

বন্দি নারী জীবনের শূন্যতা, অচরিতার্থতা, ব্যর্থতা ও যন্ত্রণা প্রকাশিত হয় : 'স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার স্বপ্নে গেলো চইলারে। দুদের মতো সুন্দর কুমার কিছু না গেলো বইলারে।' শোষণমূলক, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীকে ভারবাহী পশুতে রূপান্তরিত করেছে। এ যেন সুস্থ জীবনের বিপরীতে মানবতার এক করুণ পরাজয়।

ফসলের দিনে সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায় তখন তিন বউকে লাগিয়ে ধান মাড়ানোর কাজটা সেরে ফেলে ও বর্ষা পেরিয়ে গেলে বাড়ির উপরে যে ছোঁ জমিটা রয়েছে তাতে তিন বউকে কোদাল হাতে নামিয়ে দেয় মকবুল।'

গ্রামীণ জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতার ছবি অঙ্কনের পাশাপাশি ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জীবনের আবহমান ও চিরকালীন রূপটিও লেখক সন্ধান করেছেন। নিস্তরঙ্গ, ঘটনাবিহীন একঘেঁয়ে জীবনের মধ্যে মন্তু, টুনি, আম্বিয়া বা বুড়ো মকবুল চরিত্রের গতিশীলতা উপন্যাসটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবন চিত্রণে দক্ষতা, সামন্ত সমাজের অসঙ্গতি নির্দেশে সাহসিকতা এবং চরিত্র নির্মাণের কুশলতা হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটিকে সার্থক করে তুলেছে 'হাজার বছর ধরে' ছাড়াও জহির রায়হান যে সকল উপন্যাস লিখেছেন সেগুলো মধ্যে রয়েছে : 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৮), 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯) ও 'আর কতদিন' (১৯৭০)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. দানিয়েল ডিফো রচিত উপন্যাসটির নাম কী?
ক. আনা কারেনিনা খ. ওয়র অ্যান্ড পিস
গ. রবিনসন ক্রুশো ঘ. টম স্যারার

২. ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাস রচনার সূত্র ঘটে-
ক. সপ্তদশ শতকে খ. অষ্টাদশ শতকে
গ. উনবিংশ শতকে ঘ. বিংশ শতকে

৩. নিচের কোন রচনায় বাংলা উপন্যাসের আদি লক্ষণ পাওয়া যায়?
ক. রামায়ণ-মহাভারত খ. চণ্ডীমঙ্গল-মনসা মঙ্গল
গ. চৈত্রন্য সাহিত্য ময়মনসিংহ গীতিকা ঘ. ওপরের সবগুলোতে

৪. ফোঁ উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৮০১ সালে খ. ১৮০২ সালে
গ. ১৮০৩ সালে ঘ. ১৮০৪ সালে

৫. উপন্যাসের প্রথম খসড়া তৈরি হয় কোথায়?
ক. প্রবন্ধে খ. রম্য রচনায়
গ. সংবাদপত্রে ঘ. ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে

৬. বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস কোনটি?
ক. নববাবু বিলাস খ. হুতোম প্যাঁচার নকশা
গ. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ঘ. আলালের ঘরের দুলাল

৭. বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারে প্রথম উপন্যাস লেখেন-
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
ক. কপাল কুণ্ডলা খ. বিষবৃক্ষ

গ. দুর্গেশনন্দিনী ঘ. চন্দ্র শেখর

৯. কোনটি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নয়?

ক. ঘরে বাইরে খ. চোখের বালি

গ. চার অধ্যায় ঘ. পল্লী সমাজ

১০. হিন্দু সমাজের সংস্কার ও হিন্দু নারীর অবস্থা বর্ণনা করে কোন ঔপন্যাসিক খ্যাতিমান হয়েছেন?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলা উপন্যাস উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

২. বাংলাদেশের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

৩. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে বিধৃত সমাজের বর্ণনা দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

q¡S¡l hRl d-l

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- উপন্যাসটির পটভূমি বলতে পারবেন;
- প্রধান দুটো চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হবেন;
- সাধারণ মানুষের জীবনে লোক-বিশ্বাসের ভূমিকা বলতে পারবেন।

মস্ত বড় অজগরের মতো সড়কটা একেঁবেঁকে চলে গেছে বিস্তীর্ণ ধান খেতের মাঝখান দিয়ে।
মোঘলাই সড়ক। লোকে বলে, মোঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে শাহ সুজা যখন আরাকান পালিয়ে যাচ্ছিল তখন যাবার পথে কয়েক হাজার মজুর খাটিয়ে তৈরি করে গিয়েছিল এই সড়ক।
দুপাশে তার অসংখ্য বটগাছ। অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দীর্ঘকাল ধরে।
ওরা এই সড়কের চিরন্তন প্রহরী।
কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা।
মাঝে মাঝে ধান খেত সরে গেছে দূরে। দুধারে শুধু অফুরন্ত জলাভূমি। অথই পানি। শেওলা আর বাদাবনের ফাঁকে ফাঁকে মাথা দুলিয়ে নাচে অগণিত শাপলার ফুল।
ভোর হতে আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োরা ছুটে আসে এখানে। এক বুক পানিতে নেমে শাপলা তোলে ওরা। হৈ-হুল্লোড় আর মারামারি করে, গালাগাল দেয় একে অন্যকে। বাজারে দর আছে শাপলার। এক আঁটি চার পয়সা করে।
কিন্তু এমনো অনেকে এখানে শাপলা তুলতে আসে, বাজারে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করা যাদের ইচ্ছে নয়।
মন্তু আর টুনি ওদেরই দলে।
ওরা আসে ধল-পহরের আগে, যখন পূর্ব আকাশের শুকতারা ওঠে। তার ঈষৎ আলোয় পথ চিনে নিয়ে চুপি চুপি আসে ওরা। রাতে শিশিরে ভেজা ঘাসের বিছানা মাড়িয়ে ওরা আসে ধীরে ধীরে। টুনি ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকে।
মন্তু নেমে যায় পানিতে।
তারপর, অনেকগুলো শাপলা তুলে নিয়ে, অন্য সবাই এসে পড়ার অনেক আগে সেখান থেকে সরে পড়ে ওরা।
পরীর দিঘির পাড়ে দুজনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। শাপলার গায়ে লেগে থাকা আঁশগুলো বেছে পরিষ্কার করে।
মন্তু বলে, বুড়ো যদি জানে তোমারে আমারে মাইরা ফালাইবো।
টুনি বলে, ইস্, বুড়ার নাক কাইটা দিমু না।
নাক কাইটলে বুড়ো যদি মইরা যায়?
মইরলে তো বাঁচি। বলে ফিক করে হেসে দেয় টুনি, বলে, পাখির মতো উইড়া আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু।
বলে আবার হাসে, সে হাসি আশ্চর্য এক সুর তুলে পরীর দিঘির চার পাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।
এ দিঘি এককালে এখানে ছিল না।
আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োদের প্রশ্ন করলে তারা মুখে মুখে বলে দেয় এ দিঘির ইতিহাস। কেউ চোখে দেখেনি, সবাই শুনেছে। কেউ শুনেছে তার বাবার কাছ থেকে। তার বাবা জেনেছে তার দাদার কাছ থেকে। আর তার দাদা শুনেছে তারও দাদার কাছ থেকে।
সে অনেক বছর আগে।
তখন সড়ক ছিল না। কিছুই ছিল না এখানে। শুধু মাঠ, মাঠ আর মাঠ। সীমাহীন প্রান্তর। বৈশাখী পূর্নিমা রাতে পরীরা নেমে আসত এই পৃথিবীতে । ওরা নাচত, গাইত, খেলত।
লাল পরী, নীল পরী আর সবুজ পরী। পরীদের অনেকের নামও জানা আছে এ গাঁয়ের লোকের। পুঁথিতে লেখা আছে সব।
একদিন হঠাৎ পরীদের খেয়াল হল, একটা দিঘি কাটার। যার পানিতে মনের আনন্দে সাঁতার কাটতে পারবে ওরা। ডুব দিয়ে পানি ছিটিয়ে, ইচ্ছেমতো হৈ-হুল্লোড় করতে পারবে।
যেই চিন্তা সেই কাজ।

আকাশ থেকে খন্ডা কোদাল আর মটি ফেলবার ঝুড়ি নিয়ে এল ওরা।
বৈশাখী পূর্ণিমার রাত।
রূপালি জোছনার স্নিগ্ধ আলোয় ভরেছিল এই সীমাহীন প্রান্তর। দক্ষিণের মৃদু বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল পরীদের হাসির শব্দ।
কথায় গানে আর কাজে।
রাত ভোর হবার আগে দিঘি কাটা হয়ে গেল।
পাতাল থেকে কলকল শব্দে পানি উঠে ভরে গেল দিঘি।
সেই দিঘি।
তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম। এক নয়, অনেক।

শব্দার্থ ও টীকা

মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব : ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫২৬ সালে। সম্রাঁ বাবর ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। বাবরের পর আকবর ভারতবর্ষে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের মুত্যুর পর শাহজাহান সিংহাসনে বসেন। কিন্তু শাহজাহানের মৃত্যুর আগেই তার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই গোলযোগের মধ্যে আওরঙ্গজেব তার অন্যান্য ভাই যেমন দারা, সুজা প্রমুখকে যুদ্ধে বা কূটকৌশলে হারিয়ে দিয়ে মোঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আওরঙ্গজেবের জন্ম ১৬১৮ সালে এবং তিনি ১৬৫৮ সালে সর্বশেষ শক্তিমান মোঘল সম্রাঁ হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

শাহসুজা - আওরঙ্গজেবের ভাই এবং সম্রাঁ শাহজাহানের পুত্র। **আরাকান** - বর্তমানে মায়ানমারের অন্তর্গত একটি প্রদেশে। **চিরন্তন** - চিরকালীন, চিরকালব্যাপী; **বাদাবন** – চাষ না হওয়া জঙ্গলযুক্ত জায়গা; **ধলপহর** - ভোর হওয়ার আগে যখন রাতের অন্ধকার ভেদ করে একটু একটু করে আলো ফুটতে থাকে। **শুকতারা** – সূর্য ওঠার আগে পূর্ব আকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে যে নক্ষত্র দেখা যায়; **পুঁথি** – হাতে লেখা পুরনো দিনের গ্রন্থ।

বস্তুসংক্ষেপ

কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে দীর্ঘ সড়ক তার দুপাশে দেখা যাবে বিস্তীর্ণ ধানখেত; আর যেখানে ধানক্ষেত নেই সেখানে অফুরন্ত জলাভূমি। এলাকার লোকেরা বিশ্বাস করে এ-সড়কটি তৈরি করেছিলেন শাহ সুজা। তিনি যখন আওরঙ্গজেবের ভয়ে আরাকান পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কয়েক হাজার মজুর খাটিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন এই সড়ক। সড়কের দুপাশে পুরনো যে বটগাছগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে তারাই যেন পাহারা দিয়ে রেখেছে সড়কটিকে।
সড়কের পাশের জলাভূমিতে ফুটে থাকে অসংখ্য শাপলা ফুল। ভোর না হতেই আশেপাশের গাঁ থেকে ছেলে-বুড়ো অনেকেই আসে শাপলা তুলতে। বাজারে সেগুলো বিক্রি করে দুপয়সা উপার্জন হয়। যারা শাপলা তুলতে আসে তারা সবাই যে সেগুলো বাজারে বিক্রি করে এমন নয়। মন্তু আর টুনি যেমন– 'ওরা শাপলা তুলতে আসে আনন্দ পাবার জন্য। তবে তারা আসে অন্য সবাই এসে পড়ার আগে – বাড়ির কাউকে না জানিয়েই। শাপলা তোলা শেষ হলে পরীর দিঘির পাড়ে বসে তারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়। শাপলার গায়ে লেগে থাকা আঁশ পরিষ্কার করে। মন্তু টুনিকে ভয় দেখায় তাদের এই লুকিয়ে শাপলা তোলার ব্যাপারটি যদি বুড়ো মকবুল জানতে পারে তবে বিপদ হবে। টুনি অবশ্য ভয় পায় না মকবুলকে বরং সে বুড়োর মৃত্যু কামনা করে। যে পরীর দিঘির পাড়ে বসে টুনি আর মন্তু বিশ্রাম নেয় আশেপাশের গ্রামের লোকেদের ধারণা, কোন এক বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে আকাশ থেকে পরীরা নেমে এসে এক রাতের মধ্যে কেটেছিল এই দিঘি। উদ্দেশ্য ছিল, দিঘির পানিতে নেমে আনন্দ করা।
এই পরীর দিঘিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেছে অনেকগুলো গ্রাম। সে গ্রামের মানুষের জীবন কাহিনীই এই উপন্যাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের বাম দিকের দেয়া প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান দিকের খালি জায়গায় উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. আওরঙ্গজেব কে ছিলেন?	
২. শাহ সুজা কেন আরাকান পালিয়ে গিয়েছিল?	
৩. শুকতারা পূর্বাকাশে কখন উদিত হয়?	
৪. মন্তু আর টুনি শাপলা তুলতে আসে কেন?	
৫. কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়কের পাশে বটগাছগুলো কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে?	
৬. এক আটি শাপলার মূল্য কত?	
৭. 'রাতে শিশিরে ভেজা ঘাসের বিছানা মাড়িয়ে ওরা আসে ধীরে' -এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে?	

রচনামূলক প্রশ্ন-উত্তর

১. কুমিল্লা- চট্টগ্রাম সড়কের দুপাশের বর্ণনা দিন।
২. কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়ক কীভাবে তৈরি হয়েছিল বলে এলাকাবাসীর ধারণা?
৩. মন্তু আর টুনির পরিচয় দিন।
৪. পরীর দিঘি সম্পর্কে লোক বিশ্বাসের বর্ণনা দিন।
৫. হাজার বছর ধরে উপন্যাসের পটভূমির পরিচয় দিন।

ব্যাখ্যা লিখুন

১. রাতে শিশিরে ভেজা ঘাসের বিছানা মাড়িয়ে ওরা আসে ধীরে ধীরে।
২. পাখির মতো উইড়া আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু।

নমুনা উত্তর

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আওরঙ্গজেব ছিলেন মোঘল বাদশাহ

২. আওরঙ্গজেবের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে আরাকান পালিয়ে যায়

৩. সুর্য ওঠার আগে পূর্ব আকাশে শুকতারা উদিত হয়।

৪. কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়কের পাশের জলাভূমিতে শাপলা তুলতে আসে মন্তু আর টুনি। কিন্তু অন্যদের মতো তারা বাজারে শাপলা বিক্রি করে না। তারা শাপলা তুলে আনন্দ পায় বলেই আসে; অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

৫. কুমিল্ল-চট্টগ্রাম সড়কের দুপাশের বটগাছগুলো চিরন্তন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

৬. বাজারে এক আটি শাপলার মূল্য চার পয়সা।

৭. এখানে মন্তু আর টুনির কথা বলা হয়েছে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের সড়কটি মস্তবড়। ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে একেঁবেঁকে চলে গেছে। লোকে এটাকে মোগলাই সড়ক বলে। এর দুপাশে ডালপালা মেলে সারি সারি বটগাছ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সড়কের দুপাশের ধান খেত কোথাও কোথাও দূরে সরে গেছে আর সেখানে জায়গা করে নিয়েছে জলাশয়। অফুরন্ত জলাশয়, পানির যেন থৈ

নেই। পানিতে শেওলা আর বাদাবনের ফাঁকে ফাঁকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য শাপলা ফুল। বাতাসের দোলায় শাপলাগুলো আনন্দে নেচে ওঠে।

২. এলাকাবাসী মনে করে কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়ক তৈরি করেছিলেন শাহ সুজা। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভয়ে আরকানে পালিয়ে যাবার সময় তিনি কয়েক হাজার মজুর খাটিয়ে এ সড়ক তৈরি করিয়েছিলেন। এ-জন্য সড়কটির নাম মোগলাই সড়ক। এটি একটি লোক বিশ্বাস, যার সঙ্গে সব সময় সত্যের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।

৩. মন্তু আর টুনি পরীর দিঘিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গ্রামগুলোর কোন একটির বাসিন্দা। বুড়ো মকবুলের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী টুনি। স্বামীর সঙ্গে বয়সের বিস্তর পার্থক্য থাকায় মন্তুর সঙ্গে টুনির একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। মন্তু মকবুলদের বাড়িরই ছেলে- সম্পর্কে তাই টুনির দেবর স্থানীয়।

৪. পরীর দিঘি সম্পর্কে এ-এলাকার লোকেদের মধ্যে রয়েছে একটি লোক বিশ্বাস- যা ছেলে বুড়ো সবারই জানা। সবাই ঘটনাঁটা শুনেছে বাবা বা দাদার কাছ থেকে, কেউ চোখে দেখেনি। অনেক বছর আগের কথা- যখন এখানে সড়ক, গ্রাম কিছুই ছিল না। কেবল মাঠ আর মাঠ। আর সে সীমাহীন বিস্তীর্ণ মাঠে বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে আকাশ থেকে পরীরা নেমে এসে নাচত, খেলত, গান গাইত। লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী কত না নাম পরীদের। হঠাৎই একদিন পরীদের খেয়াল হল দিঘি কাঁবে যেখানে তারা মনের আনন্দে সাতাঁর কেটে, ডুব দিয়ে, পানি ছিটিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে সময় কাঁটাতে পারবে। যে কথা সেই কাজ। আকাশ থেকে খোন্তা, কোদাল আর মাটি ফেলার ঝুড়ি নিয়ে এল তারা- এক রাতের মধ্যেই দিঘি কাঁটা হয়ে গেল। আর পাতাল থেকে কলকল করে পানি ওঠে ভরে গেল দিঘির বুক। আস্তে আস্তে ঐ দিঘিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল গ্রামগুলো। এ ধরনের লোক বিশ্বাসের কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে না- কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে এর প্রভাব অবশ্যই লক্ষ করা যায়।

ব্যাখ্যা উত্তর

পাখির মতো উইড়া আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু।

উত্তর : আলোচ্য অংশটুকু কথাশিল্পী জহির রায়হান রচিত 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস হতে নেয়া হয়েছে। এখানে টুনি মকবুলের মৃত্যু হলে কী করবে তা মন্তুকে নিঃসঙ্কোচে জানিয়েছে।

টুনি বুড়ো মকবুলের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। ঘরে তার দুজন সতীন, যাদের একজনের বিবাহ যোগ্য কন্যা রয়েছে। টুনি মকবুলের সঙ্গে তার এই অসম বিয়ে মন থেকে কোন দিনই মানতে পারেনি। ফলে মকবুল সম্পর্কে তার এক ধরনের বীতস্পৃহা সব সময়ই ছিল। অন্যদিকে বয়স এবং মনের মিল থাকায় টুনির সঙ্গে তার দেবর সম্পর্কীয় মন্তুর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা দুজনে মিলে ধল-পহরের আগে চলে যায় কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়কের পাশের জলাশয়ে শাপলা তুলতে। মনের আনন্দে শাপলা তুলে পরীর দিঘির পাড়ে বসে বিশ্রাম নেয়, শাপলার গায়ে লেগে থাকা আঁশ পরিষ্কার করে। তাদের এই গোপন কিন্তু অনাবিল আনন্দের কথা কেউ জানে না। তাই মন্তু টুনিকে বলে যদি তার স্বামী জানতে পারে এসব, তবে তাদেরকে জ্যান্ত রাখবে না। মন্তুর এই আশঙ্কা শুনে টুনি বলে যে সে বুড়োর নাক কেটে দেবে। আর এতে যদি সে মরে যায় তবে সে পাখির মতো উড়ে বাপের বাড়ি চলে যাবে।

টুনির এই একটি কথার মধ্য দিয়ে তার জীবনের দুঃখ-বেদনার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রায় বালিকা বয়সেই সে অসম বিয়ের সুবাদে মকবুলের ঘরে এসে ওঠেছে। কিন্তু সে এটাকে কোন দিন মন থেকে মানতে পারেনি। ফলে মকবুল সম্পর্কে তার বীতস্পৃহা সব সময়ই ছিল। তাছাড়া পাখির সঙ্গে তার বাবার বাড়ি চলে যাবার দৃশ্যের উপমার মধ্য দিয়ে টুনির চঞ্চল মনের পরিচয়ও এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

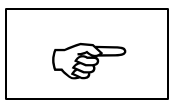

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- মকবুলের বাড়ি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মকবুলের সংসারের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- গ্রামের নারী সমাজের কর্মক্লিষ্ট জীবনের পরিচয় দিতে পারবেন।

গভীর রাতে ধপাস ধপাস ঢেঁকির শব্দে গমগম করে গ্রামগুলো।

জোড়া বউকে ঢেঁকির ওপরে তুলে দিয়ে রাত জেগে ধান ভানে বুড়ো মকবুল। পিদিমের শিখাঁটা ঢেঁকির তালে তালে মৃদু কাঁপে।

মকবুল ধমকে ওঠে বউদের, কি, গায়ে শক্তি নাই? এতেঠ আস্তে ক্যান। আরো জোরে চাপ দাও না, হুঁ। এমনভাবে গর্জে ওঠে মকবুল, যেন খেতে লাঙল ঠেলতে গিয়ে রোগা লিকলিকে গরু জোড়াকে ধমকাচ্ছে সে। হুঁ, হট হট। হুঁ আরো জোরে। আরো জোরে ধমক খেয়ে ঢেঁকিতে আরো জোরে চাপ দেয় ওরা। টুনি আর আমেনা। পাশের বাড়ি থেকে আম্বিয়ার গান শোনা যায়। 'স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার, স্বপ্নে গেল চইলারে। দুধের মতো সুন্দর কুমার কিছু না গেল বইলারে'।

ঢেঁকিতে চড়লেই গান গাওয়ার সখ চাপে আম্বিয়ার। সতেরো আঠারো বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনো বিয়ে হয়নি ওর। চেহারায় মাধুর্য আছে। চোখ জোড়া বড় বেশি তীক্ষ্ণ। ঢেঁকিতে চড়লে, ঢেঁকিকে আর সুখ দেয় না ও। এতেঠ দ্রুত তালে ধান ভানতে থাকে, মনে হয় ঢেঁকিটাই বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ধান ভানা শেষ হলে গায়ে দর দর ঘাম নামে ওর। একটা চাঁটাইয়ের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে জোরে শ্বাস নেয় আম্বিয়া।

ঢেঁকির পাশে বসে এই মুহূর্তে বারবার আম্বিয়ারর কথা মনে পড়ছিল বুড়ো মকবুলের। দাঁত মুখ খিঁচে বউদের আবার ধমক মারল ও শুনছনি, আম্বিয়া কেমন ধপাস ধপাস কইরা ধান বাইনতাছে। আর তোরা, কিছু না কিছু না, বলে বার কয়েক মাটিতে থুথু ফেললো মকবুল। বাঁ হাতে কপালের ঘামগুলো মুছে নিল সে। দাওয়ার ওপাশে পিদিম হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল ফকিরের মা। সেখান থেকে বলল, আহা মকবুল! বউগুলোর বুঝি এই রাতেরবেলাও আর শান্তি দিবি না তুই। সারাদিন তো খাঁটাইছস, এহন এই দুপুর রাইতেও-, বলে টুনি আর আমেনার জন্য আফসোস করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেল ও।

এ বাড়িতে মোঁ আঁ ঘর লোকের বাস।

সামনে নুয়ে পড়া ছোঁ ছোঁ ঘরগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো। বাঁশের তৈরি বেড়ার ভাঙা অংশগুলো তালপাতা দিয়ে মোড়ান। চালার স্থানে স্থানে খড়কুটো ওঠে ফুটো হয়ে গেছে। দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ এসে একবার করে সে ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে যায় ঘরের ভেতরে। আম কাঁঠাল পাটি পাতা আর বেতাক বনে ঘেরা বাড়ির চারপাশ। মাঝে মাঝে ছোঁ বড় অনেকগুলো সুপুরি আর নারকেল গাছ লাগানো হয়েছে অনেক আগে। দুএকটা খেজুর গাছও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে সেখানে। ছোঁ পুকুর। পুকুরে শিং কই আর মাগুর মাছের কমতি নেই। দিনরাত শব্দ করে ঘাই দেয় ওরা। পানিটাকে সারাক্ষণ ঘোলাটে করে রাখে। সামনে মাঝারি ওঠোন। শীত কিংবা গ্রীষ্মে শুকিয়ে একরাশ ধুলো জমে। বর্ষায় এক হাঁটু কাদা। কাদার ওপর ছোঁ ছোঁ ব্যাঙ এসে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। হাঁস কি মোরগ দেখলেই তাড়া করে ওদের। ধরে ধরে মারে। পুবের সারে উত্তরের ঘরটা মকবুলের। বাড়ির অন্য সবার চেয়ে ওর অবস্থাঁটা কিছু ভালো। মকবুল তিন বিয়ে করেছে। তিন বউই বেঁচে আছে ওর।

বড় বউ আমেনা। কালো মোঁটা আর বেঁটে। বয়স প্রায় ত্রিশের কোঠায় পৌঁছেছে এবার। খুব ঘন ঘন কথা বলে। কথা বলার সময় পোকায় খাওয়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুতু ছিটিয়ে সামনের লোকগুলোকে ভিজিয়ে দেয়। পারিবারিক কলহ বাধলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাবার হুমকি দেখায়।

মেজ ফাতেমা। দেখতে রোগা, হ্যাংলা আর লম্বা। বছরের তিন মাস পেটের অসুখে ভোগে। ছমাস বাপের বাড়িতে কাঁটায়। বয়সের হিসেবটা সে নিজেও জানে না।। কেউ পনেরো বলেও সায় দেয়। পঁচিশ বললেও মেনে নেয়।

সবার ছোঁ টুনি। গায়ের রং কালো। ছিপছিপে দেহ। আয়ত চোখ। বয়স তার তের-চৌদ্দর মাঝামাঝি। সংসার কাকে বলে সে বোঝে না। সমবয়সী কারো সঙ্গে দেখা হলে সব কিছু ভুলে মনের সুখে গল্প জুড়ে দেয়। আর হাসে। হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় টুনি।

বুড়ো মকবুলের পরিবারে আরো একজন আছে।
নাম তার হীরন। ও তার বড় মেয়ে। বড় বউ-এর সন্তান। এবার দশ ছেড়ে এগারোয় পড়লো সে। এখন থেকে মকবুল ওর বিয়ের জন্যে ওঠে-পড়ে লেগেছে। দুএক জায়গায় এর মধ্যে সম্বন্ধও পাঠিয়েছে সে। বড়, মেজ আর ছোঁ এই তিন বউ নিয়ে মকবুলের সংসার। তিন বউকে বসিয়ে খাওয়ানোর মতো জমিজমা নেই ওর। আসলে বউদের আয় দিয়ে চলে ও। বড় দুই বউ দিব্যি আয় করে। বাজার থেকে পাতা কিনে এনে দিয়েই খালাস মকবুল। দুই বউ মিলে একদিনে তিন চারটে চাঁটাই বুনে শেষ করে। মাঝে মাঝে টুনিও বসে পড়ে ওদের সঙ্গে, কাজ করে। চাঁটাইগুলো বাজারে বিক্রি করে লাভের অংশ দিয়ে পেঁয়াজ, লঙ্কা আর পান-সুপুরি কেনে মকবুল।
ফসলের দিনে সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায় তখন তিন বউকে লাগিয়ে ধান মাড়ানোর কাজটা সেরে ফেলে ও। বর্ষা পেরিয়ে গেলে বাড়ির ওপরে যে ছোঁ জমিটা তাতে তিন বউকে কোদাল হাতে নামিয়ে দেয় মকবুল। নিজেও সঙ্গে থাকে। মাটি কুপিয়ে কুমড়ো আর শিমের গাছ লাগায়। দুবেলা জল ঢেলে গাছগুলোকে তাজা রাখে। সুখ আছে আবার সুখ নেইও মকবুলের জীবনে। তিন বউ যখন ঝগড়া বাধিয়ে চুল ছেঁড়ার লড়াই শুরু করে তখন বড় বিষাদ লাগে ওর। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে তিন জনকে সমানে মারে সে। কাউকে ছাড়াছাড়ি নেই।
মকবুলের পাশের ঘরটা ফকিরের মার।
তার পাশেরটা আবুলের।
তার পাশে থাকে রশিদ।
পাশাপাশি তিনটে ঘর।
সবার দক্ষিণে যে ঘরটা সবার চেয়ে ছোঁ, ওটায় থাকে মন্তু। একা মানুষ। বাবা মা ভাইবোন কেউ নেই। বাবাকে হারিয়েছে ও জন্মের মাসখানেক আগে। মাকে, দশ বছর বয়সে। লোকে বলে, মন্তু নাকি বড় একগুঁয়ে আর বদমেজাজি। স্বভাবটা ঠিক জানোয়ারের মতো।
টুনি বলে, অমন মাটির মানুষ নাকি এ জন্মে আর দেখেনি সে।
আহা অমনটি আর হয় না।
ওপাশে আর কোন ঘর নেই।
পশ্চিমের সারে, দক্ষিণের ঘরটা মনুর।
তার পাশে থাকে সুরত আলী।
তার পাশে গনু মোল্লা।
গনু মোল্লা নির্ভেজাল মানুষ। কারো সাতেও থাকে না, পাঁচেও না। জমিজমা নেই। চাষবাসের প্রশ্ন ওঠে না। সারাদিন খোদার এবাদত করে। যেখানে যায় তসবির ছড়াঁটা হাতে থাকে তার। আপন মনে তসবিহ পড়ে।

শব্দার্থ ও টীকা

চাঁটাই – হোগলার পাতা বা বাঁশের চটা দিয়ে বানানো আসন বিশেষ। **পিদিম** – প্রদীপ শব্দটির আঞ্চলিক রূপ; **ঘাই** – আঘাত। **পুবের সারে** – পূর্ব দিকের সারিতে। **তল্পিতল্পা** – বিছানাপত্র এবং অন্যান্য জিনিসের গাঁট, পোঁটলা-পুঁটলি, **আয়ত চোখ** – টানাঁটানা চোখ; বিষাদ – স্বাদ নেই এমন; **নির্ভেজাল** – ভেজালহীন।

বস্তুসংক্ষেপ

বুড়ো মকবুল তার দুই বউ টুনি আর আমেনাকে দিয়ে ঢেকিতে ধান ভানায়। মাঝে মাঝে জোরে পা চালানোর জন্যে ধমক দেয়। পাশের বাড়ির আম্বিয়া এ-গ্রামের অনেকের মতো টোকিতে ধান ভানে। তবে ঢেঁকিতে পা রাখলেই সতেরো-আঠারো বছর বয়সের এই অবিবাহিত মেয়েটির গলায় গান আসে। সে সুর করে গায় স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার, স্বপ্নে গেল চইলারে। আর গানের তালে তালে নির্দয়ভাবে ঢেঁকিতে পা চালাতে থাকে। বুড়ো মকবুল দিনরাত বৌদের দিয়ে এভাবে খাঁটায় আর মাঝে মাঝে ধমক দেয় যেন তারা হালের বলদ, এমন আচরণ মকবুলের।
মোঁ আঁঘর লোকের বাস মকবুলদের বাড়িতে। ছোঁ ছোঁ ঘর, বাঁশ আর তালপাতার তৈরি—একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো। সবগুলোরই চালের দশা জরাজীর্ণ। সূর্যের আলো আর জোছনা দুটোই সহজে ঘরের চাল ভেদ করে ঢুকে পড়ে। পুবের সারে উত্তরের ঘরটা মকবুলের। বাড়ির অন্য সবার চেয়ে তার অবস্থা কিঞ্চিত ভাল। তাই বিয়েও করেছে তিন তিনটা। বড় বউ আমেনা, কালো, মোঁটা আর বেঁটে; বয়স ত্রিশের কোঠায়। মেঝ বউ ফাতেমা, রোগা, হ্যাংলা আর লম্বা। সবার ছোঁ টুনি;

গায়ের রং কালো, ছিপছিপে দেহ। বয়স তের-চৌদ্দের কাছাকাছি। তিন বউ আর বড় বউ আমেনার মেয়ে হীরনকে নিয়ে মকবুলের সংসার। হীরন দশ ছেড়ে এগার বছরে পড়ল। এর মধ্যে মকবুল তার বিয়ের জন্যে ওঠে পড়ে লেগেছে। মকবুলের তেমন জমিজমা নেই। বউগুলো দিয়ে কাজ করিয়ে সে উপার্জন করে। তাদের দিয়ে চাঁটাই বোনায়, ধান মাড়াই করায়, জমি চাষ করায়, খেতের দেখাশুনা করায়। আর তিন বউতে ঝগড়া লাগালে তিন জনকেই সমানে মারে। তা ছাড়া তার সংসার ভালোই চলে।

মকবুলের পাশের ঘরটা ফকিরের মায়ের; তার পাশেরটা আবুলের; তার পাশে রশিদের ঘর। সবার দক্ষিণের ছোঁ ঘরটায় থাকে মন্তু। একা মানুষ। লোকে বলে মন্তু খুব একগুয়ে আর বদমেজাজি কিন্তু টুনি বলে অমন মাটির মানুষ আর হয় না। পশ্চিমের সারে দক্ষিণের ঘরটা মনুর; তার পাশে সুরত আলী আর সবার শেষে নির্ভেজাল মানুষ গনু মোল্লার ঘর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. গভীর রাতে ঢেঁকির শব্দে গ্রামগুলো গমগম করে কেন?
২. মকবুল বউদেরকে মাঝে মাঝে ধমকায় কেন?
৩. আম্বিয়ার বয়স কত? সে দেখতে কেমন?
৪. মকবুলের বাড়িতে মোঁ কত ঘর লোকের বাস?
৫. ফাতেমা দেখতে কেমন? তার বয়স কত?
৬. হীরন মকবুলের কোন স্ত্রীর সন্তান? তার সম্পর্কে বর্তমানে মকবুল কী ভাবছে?
৭. মন্তুর ঘরটা বাড়ির কোন দিকে? সংসারে মন্তুর আর কে আছে?
৮. 'আহা এমনটি আর হয় না'- কার সম্পর্কে টুনি এ-কথা বলে?

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. ঢেঁকিতে চড়লে ঢেঁকিকে সুখ দেয় না কে?
   ক. আমেনা খ. আম্বিয়া
   গ. ফাতেমা ঘ. টুনি
২. ফাতেমা তার বয়স পনের বা পঁচিশ যেটাই বলা হোক মেনে নেয় কেন?
   ক. বয়সের হিসেব নিজে জানে না বলে খ. রোগা শরীর তাই বয়স বোঝা যায় না বলে
   গ. অন্যের কাছে বয়স লুকাতে চাইত বলে ঘ. এসব ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ ছিল না বলে
৩. মকবুল তার বউদের ওপর রাগ করে কেন?
   ক. রাগ করাই তার স্বভাব খ. কাজকর্ম করতে চায় না বলে
   গ. আম্বিয়ার কাজ করা দেখে ঘ. রাগ করলে বউগুলো বেশি কাজ করে
৪. 'সংসার কাকে বলে সে বোঝে না' - কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
   ক. আমেনা খ. আম্বিয়া
   গ. গনু মোল্লা ঘ. টুনি
৫. ফসলের দিনে মকবুল কী দিয়ে ধান মাড়াই করে?
   ক. গরু দিয়ে খ. মহিষ দিয়ে
   গ. মেশিন দিয়ে ঘ. বউদের দিয়ে
৬. সংসার মকবুলের কাছে কখন বিষাদ লাগে?
   ক. আয়-রোজগার ভাল না হলে খ. নিজেদের মধ্যে বিবাদ লাগলে
   গ. তিন বউ যখন ঝগড়া বাধায় ঘ. মকবুলকে কেউ ভুল বুঝলে

ব্যাখ্যা লিখুন

১. দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ এসে একবার করে সে ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে যায় ঘরের ভেতর।
২. সংসার কাকে বলে সে বোঝে না।
৩. আহা অমনটি আর হয় না।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মকবুলের বাড়ির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. মকবুলের পরিবার সম্পর্কে আপনি যা জানেন লিখুন।
৩. গ্রামীণ জীবনে নারী সমাজে যে শ্রমক্লিষ্ট চিত্র এ-পাঠে পাওয়া যায় তার পরিচয় দিন।

উত্তরমালা

ক. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. গ্রামের অনেকেই ঢেঁকিতে ধান ভানে বলে।
২. মকবুল বউদের মাঝে মাঝে ধমকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে যাতে তারা আরো বেশি কাজ করে; আরো জোরে ঢেঁকিতে চাপ দেয়।
৩. আম্বিয়ার বয়স সতের আঠারো। চেহারায় মাধুর্য আছে, এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখের জন্য তার সে মাধুর্য আরো বেড়ে গেছে।
৪. মকবুলের বাড়িতে মোঁ আঁ ঘর লোকের বাস।
৫. ফাতেমা দেখতে রোগা, হ্যাংলা আর লম্বা। প্রায়ই অসুস্থ থাকে বলে চেহারায় রোগা একটা ভাব স্পষ্ট। কেউ বলে তার বয়স পনের কেউ বলে পঁচিশ।
৬. হীরন মকবুলের প্রথম স্ত্রী আমেনার সন্তান। সে দশ বছর পার করে এগারোয় পড়েছে। এর মধ্যেই মকবুল তার বিয়ের জন্যে ওঠে পড়ে লেগেছে। দুএক জায়গায় এর মধ্যে সম্বন্ধও পাঠিয়েছে।
৭. বাড়ির সবার দক্ষিণের ছোট্ট ঘরটা মন্তুর। জন্মের মাসখানেক আগে বাবাকে হারিয়েছে আর মা'কে হারিয়েছে ওর বয়স যখন দশ বছর। মা-বাবা হারা মকবুলের সংসারে সে এখন একা।
৮. মন্তু সম্পর্কে টুনি একথা বলে। যদিও অন্যেরা মন্তুকে একগুঁয়ে আর বদ মেজাজী বলেই জানে কিন্তু টুনির ধারণা সে একেবারে মাটির মানুষ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. গ

ব্যাখ্যা

১. দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ এসে একবার করে সে ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে যায় ঘরের ভেতর।

উত্তর : আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান রচিত 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে।
এখানে লেখক করুণা মিশ্রিত ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে মকবুলের বাড়ির অন্য সবার আর্থিক দৈন্যের কথা প্রকাশ করেছেন।
মকবুলের বাড়িতে মোঁ আঁঘর লোকের বাস। একটার সঙ্গে একটা গায়েগায়ে লেগে থাকা ঘরে তারা বাস করে। পুরনো হতে হতে ঘরগুলো সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। ঘরের সামনে মাঝারি ওঠোন। শীতকালে একরাশ ধুলো আর গরমকালে একটু বৃষ্টি হলে সমস্ত উঠান কাদায় মাখামাখি হয়ে ওঠে। ঘরের বাসিন্দাদের মতোই ঘরের বেড়ার অবস্থা জরাজীর্ণ। বাঁশের তৈরি বেড়া তাও আবার ভাঙা। বেড়ার ভাঙা অংশগুলো তালপাতা দিয়ে জোড়াতালি দেয়া। চালার দশাও একই রকম। চালার জায়গায় জায়গায় খড়কুটো ওঠে ফুটো হয়ে গেছে। আর সেই ফুটো দিয়ে নির্বিবাদে ঢুকে পড়ে সূর্যের আলো আর রাতের জোছনা।
প্রকৃতপক্ষে লেখক মকবুলের বাড়ির প্রতিটি বাসিন্দার জরাজীর্ণ ঘরের প্রতীকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে তাঁর বর্ণনার ভঙ্গিটি কাব্যিক এবং মনোমুগ্ধকর- যা লেখকের শক্তিসত্তার পরিচয়বাহী।

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ২ : মকবুলের পরিবার সম্পর্কে আপনি যা জানেন লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের আর দশটা পরিবারের মতোই মকবুলের পরিবার– দারিদ্র্য, অভাব, অনাহার আর রোগ জর্জর জীবন নিয়ে । তবে খানিকটা ব্যতিক্রমী ভাবও আছে পরিবারটিতে। মকবুল বয়সে বৃদ্ধ। তার তিনটে বউ। বড় বউ আমেনা, বয়স ত্রিশের কোঠায়। তার একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে, নাম হীরন। মেঝ বউ ফাতেমা, দেখতে রোগা, হ্যাংলা আর লম্বা। তার বয়সের কোন হিসাব নেই। পনেরও হতে পারে আবার পঁচিশও। সবার ছোঁট বউ টুনি বয়স তের চৌদ্দর মাঝামাঝি, সংসার কাকে বলে বোঝে না। চোখে, মুখে এবং মনে এখনো সে কিশোরী। তিন বউকে বসিয়ে খাওয়ানোর মতো জমিজমা মকবুলের নেই। তাই সে বউদের দিয়ে চাঁটাই বানানো, জমি কোপানো, ধান ভানা থেকে ধান মাড়াই অবধি সকল কাজই করায়। তিন বউতে ঝগড়া বাধালে হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়েই বেদম প্রহার করে। এই হত দরিদ্র অবস্থাকে সঙ্গী করেই মকবুলের পরিবার গড়ে ওঠেছে - যেখানে জীবনের নিমর্মতাই স্পষ্ট, আনন্দ নয়।

৩. প্রশ্ন : গ্রামীণ জীবনে নারী সমাজে যে শ্রমক্লিষ্ট চিত্র এ-পাঠে পাওয়া যায় তার পরিচয় দিন।

উত্তর : বাংলাদেশের নারী সমাজ, বিশেষত বৃহত্তর গ্রামবাংলার নারী সমাজ এখনো পর্যন্ত নানা রকম শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচারের শিকার। হিসাব করলে দেখা যাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গৃহস্থালি কাজের সর্বটা করেও আবার সে পুরুষের কাজের সঙ্গে হাত মেলায়। তারপরও তার ওপর নেমে আসে নানা অত্যাচার যা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। পরীর দিঘির পারের প্রতিটি গ্রামই রাতেরবেলা ঢেঁকির শব্দে গমগম করে। মেয়েরা রাত জেগে ধান ভানে। আম্বিয়া তাদের মধ্যে একজন। মকবুল তিন তিনটে বিয়ে করেছে কিন্তু তাদের বসিয়ে খাওয়ানোর মতো জমি তার নেই। ফলে বউগুলোই তার উপার্জনের হাতিয়ার। দিনরাত তাদেরকে দিয়ে ধান ভানায়। কাজে সামান্য ঢিলেমি দেখলেই ধমক লাগায় যেন তারা মানুষ নয়, গরু, এমন আচরণ মকবুলের। বউদের দিয়ে সে চাঁটাই বোনায়; দিনে তিন-চারটে করে চাঁটাই বোনো তারা। ফসলের দিনে সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায় তখন সে বউদের লাগিয়ে দেয় ঐ কাজে। কোদাল দিয়ে জমি চাষ করায়, জমিতে দুবেলা পানি দেয়ায়। এ-অবস্থা কেবল মকবুলের তিন বউয়েরই নয়। এটা সত্য গ্রামবাংলার অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রেই।

দেখা যাচ্ছে বিচিত্র কাজের সঙ্গে গ্রামবাংলার বিশাল নারী সমাজ সম্পর্কযুক্ত। অথচ পুরুষশাসিত সমাজে তাদের সে কর্মের কোন স্বীকৃতি নেই। বরং কাজে সামান্য গাফিলতিও তাদের জন্য বয়ে আনে নানা লাঞ্ছনা ও শারীরিক নির্যাতন। এই কর্মক্লিষ্ট নারী সমাজের একটি টুকরো কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব ছবি জহির রায়হান এখানে উপস্থাপন করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- শিকদার বাড়ি পত্তনের ইতিহাস বলতে পারবেন;
- বউদের দিয়ে লাঙল টানানোর জন্য মকবুলের পরিকল্পনা বলতে পারবেন;
- টুনি আর মন্তুর লুকিয়ে মাছ ধরার কথা বলতে পারবেন।

দিঘিকে কেন্দ্র করে এই গ্রাম।

কখন কোন যুগে পত্তন ঘটেছিল এ গ্রামের কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু, এ বাড়ির পত্তন বেশি দিন আগে নয়। আশি কি খুব জোর নব্বই বছর হবে।

সেই তেরশ' সনের বন্যা।

অমন বন্যা দুচার জন্মে কেউ দেখে নি।

মাঠ ভাসল, ঘাঁ ভাসল, ভাসল বাড়ির উঠান। ঘর ভাসল, বাড়ি ভাসল, ভাসল কাজির কুশান।

কিছু বাদ নেই। ঘরবাড়ি গোয়াল গরু সব। এমন কি মানুষও ভাসল। জ্যান্ত মানুষ। মরা মানুষ।

তাল গাছের ডগায় ঝোলান বাবুই পাখির বাসায়ও কিছুকালের জন্য পরম নিশ্চিন্তে ঘর বেঁধেছিল পুঁটি মাছের ঝাঁক।

রহমতোগঞ্জ কুলাউড়া নিজামপুর ভেসে সব একাকার হল।

বুড়ো কাসেম শিকদার ছিল কুলাউড়ার বাসিন্দা।
বুড়ো আর বুড়ি। ছেলেপিলে ছিল না ওদের। মাটির নিচে পুঁতে রাখা টাকা ভরা কলসিটা বুকে জড়িয়ে ধরে বানের জলে ভাসান দিল বুড়ো আর বুড়ি।
কলা গাছের ভেলায় চারদিন চার রাত। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। একেবারে উপোস। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। ভেলা ভাসছে আর ভাসছে।
অবশেষে এসে ঠেকল এই দিঘির পাড়ে।
লাল পরী নীল পরী আর সবুজ পরীর দিঘি। ছোঁখাঁ একটা পাহাড়ের মতো উঁচু যার পাড়।
গ্রামটা পছন্দ হয়ে গেল কাশেম শিকদারের।
কলসি থেকে টাকা বের করে দুচার বিঘে জমি কিনে ফেলল সে গোড়াপত্তন হল এ বাড়ির।
বাড়ির চারপাশে আম কাঁঠাল সুপুরি আর নারকেলের গাছ লাগাল কাশেম শিকদার। পুকুর কাঁল। ভিটে বাঁধল। পছন্দ মতো ঘর তুললো বড় করে। কিন্তু মনে কোন শান্তি পেল না সে। ছেলে পুলে নেই। মারা গেলে কে দেখবে এতেঠ বড় বাড়ি।
মাঝে মাঝে চিন্তায় এতেঠ বিভোর হয়ে যেতো যে খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকত না তার। বুড়ি ছমিরন বিবি লক্ষ করতেন সব। বুঝতেন কেন স্বামীর মনে সুখ নেই, চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। মনে মনে তিনিও দুঃখ পেতেন।
তারপর, একদিন জলভরা চোখে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন ছমিরন বিবি।
আস্তে করে বললেন, তুমি আর একডা নিকা কর। বলতে গিয়ে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল তাঁর দুগন্ড বেয়ে অবিরাম পানি গড়িয়ে পড়ছিল।
তবু স্বামীকে নিজ হাতে সাজিয়ে দিলেন ছমিরন বিবি। হাতে মেহেদি দিলেন। মাথায় পাগড়ি পরালেন। নতুন বউ-এর দিকে তাকাতে সাহস পেলেন না ছমিরন বিবি। ছুটে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে কে যেন তখন কলজেটা কুটিকুটি করে কঁটছিল তাঁর। নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারলেন না তিনি। পুকুর পাড়ে ধুতরা ফুলের সমারোহ। গুনে গুনে চারটে ফুল হাতে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সেগুলো মুখে পুরে দিয়ে নীরবে ঘুমিয়ে পড়লেন। দিঘির পাড়ে উঁচু ঢিপির মতো তার কবরটা আজো চোখে পড়ে সবার আগে।
ধপাস ধপাস ঢেঁকির শব্দে গমগম শিকদার বাড়ি।
ঘুমে ঢুলুঢুলু বউ দুটোর গা বেয়ে দরদর ঘাম নামে। এতেঠক্ষণে রীতিমতো হাঁপিয়ে ওঠেছে ওরা। আঁচলটা কাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে, সামনে হাত রাখার বাঁশের ওপরে গুটিয়ে রেখেছে দুইজনে। মাঝে মাঝে তুলে নিয়ে বুক আর গলার ঘাম মুছে নিচ্ছে। ঘামে কাপড়টা চপ চপ করছে ওদের।
সেদিকে খেয়াল নেই মকবুলের। ও ভাবছে অন্য কথা।
বাড়ির ওপরের জমিটাতে লাঙল না দিলে নয়। অথচ হাল যে একটা ধার পারে সে সম্ভাবনা নেই। লাঙল অবশ্য যা হোক একটা আছে ওর। অভাব হল গরুর। গরু না হলে লাঙল টানবে কিসে। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়। মকবুল ভাবল, বউ দুটোকে লাঙলে জুড়ে দিয়ে, দূর এটা ঠিক হবে না। লোকে গালাগাল দেবে ওকে। বলবে, দেহ বউ দুইডা দিয়া লাঙল টানায়। তার চেয়ে এক কাজ করলে কি ভালো হয় না? না। বউদের দিয়েই লাঙল টানাবে সে। দিনে নয়, রাতে। বাইরের কোন লোকে দেখবার কোন ভয় থাকবে না তখন। বউরা অবশ্য আপত্তি করতে পারে। কিন্তু ওসব পরোয়া করে না মকবুল। মুফত বিয়ে করে নি সে। পুরো চার চারটে টাকা মোহরানা দিয়ে এক একটা বিয়ে করেছে। হুঁ।
ভাবছিল আর সোনারঙ ধানগুলো ঢেঁকির নিচে ঠেলে দিচ্ছিল মকবুল। হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ করে হাতটা চেপে ধরল সে। অসতর্ক মুহূর্তে ঢেকিটা হাতের ওপর এসে পড়েছে ওর। আল্লারে বলে মুখ বিকৃত করল মকবুল।
টুনি আর আমেনা এতেঠক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঢেকির ওপর। ঘোর কাঁতে ছুটে নেমে এল ওরা। ওদের কাছে এগিয়ে আসতে দেখে ওদের গায়ের ওপরে থুতু ছিটিয়ে দিল মকবুল, দূর-হ দূর-হ আমার কাছ থাইকা। বলতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চাপাল মকবুল।
আমেনা বলল, দেহ কারবার, নিজের দোষে নিজে দুঃখ পাইল আর এহন আমাগোরে গালি দেয়। আমরা কি করছি।
তোরা আমার সঙ্গে শত্রুতামি করছস। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল মকবুল। তোরা দুই সতীনে ইচ্ছা কইরা আমার হাতে ঢেঁকি ফালাইছস। তোরা আমার দুশমন। হ্যাঁ দুশমনই তো। দুশমন ছাড়া আর কি। কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল আমেনা। টুনি এগিয়ে গেল ওর ফুলা হাতে একটা ভিজে ন্যাকড়া বেঁধে দেয়ার জন্যে। লাফিয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেল মকবুল। দরকার নাই, দরকার নাই। অত সোহাগের দরকার নাই। বলে একখানা সরু কাঠের টুকরো নিয়ে ওর দিক ছুঁড়ে মারল মকবুল। বিষ উঠছে নাহি বুড়ার? এমন করতাছে ক্যান। চাপা রোষে গজগজ করতে করতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল টুনি। খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতে ঠাণ্ডা বাতাসে দেহটা জুড়িয়ে গেল ওর। হঠাৎ মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

ওঠোন থেকে মন্তুর ঘরের দিকে তাকাল ও। একটা পিদিম জ্বলছে সেখানে। একবার চারপাশে দেখে নিয়ে মন্তুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল টুনি।

মাচাঙের ওপর থেকে কাঁথা বালিশটা নামিয়ে নিয়ে শোবার আয়োজন করছিল মন্তু। টুনি দোরগোড়া থেকে বলে, বাহ, বারে!

মন্তু মুখ তুলে তাকায় ওর দিকে। বলে ক্যান কি অইছে?

টুনি ফিসফিসিয়ে বলে, আজ যাইবা না?

মন্তু অবাক হয়, কই যামু?

টুনি মুখ কালো করে চুপ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে, ক্যান ভুইলা গেছ বুঝি?

মন্তুর হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বেড়ার সঙ্গে ঝোলান মাছ ধরার জালটার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলে, অ-মাছ ধরতে?

যাইবা না? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে টুনি।

মন্তু হেসে বলে, যামু যামু। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তিত হয়ে পড়ে সে, বুড়ো যদি টের পায় তাইলে কিন্তুক জানে মাইরা ফালাইবো।

হঠাৎ ফিক করে হেসে দেয় টুনি। মাইররে ডরাও নাকি?

মন্তু সে কথার জবাব না দিলে টুনি বলে, ভাত খাইছ?

না! তুমি খাইছ?

হুঁ। তুমি গিয়া খাইয়া আস যাও। জলদি কইরা আইসো। বিছানাটা আবার গুটিয়ে রেখে বেড়ার সঙ্গে ঝোলান জালটা মাটিতে নামিয়ে নেয় মন্তু।

ও ঘর থেকে আমেনার ডাক শোনা যায়, টুনি বিবি কই গেলা, খাইতে আহ!

আহি, বলে সেখান থেকে চলে যায় টুনি।

মাসখানের হল ফাতেমা বাপের বাড়ি গেছে। এখন টুনি একা। রাতেরবেলা ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ালেও ধরবার উপায় নেই। রাত জেগে মাছ ধরাঁটা ইদানীং একটা নেশা হয়ে গেছে ওদের। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে গ্রামের এ পুকুর থেকে অন্য পুকুরে জাল মেরে বেড়ায় ওরা। হাতে একটা টুকরি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকে টুনি। জালে ওঠা মাছগুলো ওর মধ্যে ভরে রাখে।

পর পুকুরের মাছ ধরতে গিয়ে সমস্ত সময় সজাগ থাকতে হয় ওদের। চারপাশে দৃষ্টি রাখতে হয়। একদিন প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল দুজনে। জমীর মুন্সির বড় পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিল সেদিন। আকাশে চাঁদ ছিল কিন্তু চাঁদনী ছিল না। কালো মেঘে ছেয়ে ছিল পুরো আকাশটা।

এক হাঁটু পানিতে নেমে জালটাকে সন্তর্পণে ছুঁড়ে দিয়েছিল সে। পুকুরের মাঝখানটাতে। শব্দ হয়নি মোটেও। কিন্তু পুকুর পাড় থেকে জোর গলায় আওয়াজ শোনা গেল, কে কে জাল মারে পুকুরে?

এক হাঁটু পানি থেকে নীরবে এক গলা পানিতে নেবে গেল মন্তু। টুনি ততক্ষণে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।

জমীর মুন্সির হাতের টর্চটা বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেল পুকুরের এপার থেকে ওপারে। মনে মনে বার বার খোদাকে ডাকছিল মন্তু, খোদা তুমিই সব।

একটু পরে পাড়ের ওপার থেকে টুনির চাপা গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, এই উইঠা আহ। মুন্সি চইলা গেছে। বলে খিলখিল শব্দে হেসে ওঠে সে। ওর হাসির শব্দে রাগে সমস্ত দেহটা জ্বালা করে ওঠেছে মন্তুর। এমন সময়ে মানুষ হাসতে পারে?

তারপর থেকে আরো সাবধান হয়ে গেছে মন্তু। গনু মোল্লার কাছ থেকে তিন আনা পয়সা খরচ করে একটা জোরদার তাবিজ নিয়েছে সে। রাতে বিরাতে গাঁয়ের পুকুরে মাছ ধরে বেড়ানো, বিপদ আপদ কখন কি ঘটে কিছুতো বলা যায়না। আগে থেকে সাবধান হয়ে যাওয়া ভাল। সগন শেখের পুকুর গাড়ে এসে, বাজুর ওপরে বাঁধা তাবিজটা কে আজ একবার ভাল করে দেখে নিল মন্তু। তারপর বুনো লতার ঝোপটাকে দুহাতে সরিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেল সে। টুনি পেছন থেকে বলল, বারে অত জোরে হাঁটলে আমি চলি কি কইরা? মন্তু জালটাকে গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, আস্তে আহ, তাড়া কিয়ের? টুনি বলে, বারে, আমার বুঝি ডর ভয় কিছুই নাই। যদি সাপে কামড়ায়? সাপের কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ একটা আঁধি সাপ ফোঁস করে ওঠে সরে যায় সামনে থেকে। আঁতকে ওঠে দুহাত পিছিয়ে আসে মন্তু। ভয় কেটে গেলে থুতু করে বুকের মধ্যে একরাশ থুথু ছিটিয়ে দেয় সে। পেছনে টুনির দিকে তাকিয়ে বলে, বুকে থুক দাও তাইলে কিচ্ছু অইবো না। কোন রকম বিতর্কে না এসে নীরবে ওর কথা মেনে নেয় টুনি। কপালটা আজ মন্দ ওদের। অনেক পুকুর ঘুরেও কিছু চিংড়িগুঁড়ো ছাড়া আর কিছু জুটল না। মাছগুলো কেমন যেন সেয়ানা হয়ে গেছে। পুকুরের ধারে কাছে থাকে না। থাকে গিয়ে একেবারে মাঝখানটিতে, এতেঠ দূর জাল উড়িয়ে নেয়া যায় না। টুনি বলে থাক, আইজ থাউক, চলো বাড়ি ফিইরা যাই। জালটাকে ধুয়ে নিয়ে মন্তু আস্তে আস্তে বলে, চল।

শব্দার্থ ও টীকা

পত্তন – প্রতিষ্ঠা, আরম্ভ, সূত্রপাত। **কুশান** – 'কুশাসন' শব্দটির আঞ্চলিক রূপ, কুশ বা তৃণ দিয়ে তৈরি আসন। **বানের জলে ভাসান দিল** – বন্যার পানিতে ভেসে চলল। **তেষ্টা** – পিপাসা। **বিভোর** – আত্মহারা। **দুগণ্ড** – দুইগাল। **অবিরাম** – থামে না এমন। **মুফত** – মাগনা, বিনমূল্যে। **তীব্র আর্তনাদ** – উচ্চ স্বরে চিৎকার। **স্তব্ধ** – নিশ্চল। **শত্রুতামি** – শত্রুতা শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **ন্যাকড়া** – ছেঁড়া কাপড়। **রোষ** – ক্রোধ, রাগ। **চাঁদনি** – জোছনা। **সন্তর্পণে** – সতর্কতার সঙ্গে, খুব সাবধনে। **বিদ্যুৎবেগে** – দ্রুতগতিতে। **বাজুর ওপরে** – বাহুর ওপরে। **আঁধি-সাপ** – । **সেয়ান** – চালাক, চতুর।

বস্তুসংক্ষেপ

দিঘিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে এ-গ্রাম। কিন্তু গ্রামের পত্তন কবে হয়েছিল তা কেউ বলতে পারে না। অবশ্য শিকদার বাড়ির পত্তনের ইতিহাস সবারই জানা। তেরশ' সনের মহাবন্যায় কুলাউড়া থেকে ভেলায় করে ভাসতে ভাসতে এসে বুড়ো কাসেম শিকদার আর বুড়ি ছমিরন বিবি ডাঙায় আশ্রয় পেয়েছিলেন পরীর দিঘির পাড়ে। গ্রামটা তাদের পছন্দ হয়ে গেল। আসবার সময় কলস ভর্তি করে যে টাকা নিয়ে এসেছিলেন সেখান থেকে কিছু টাকা বের করে জমিজমা কিনে বাড়ি ঘর তুলে, পুকুর কেটে এখানেই থেকে গেলেন তাঁরা। সেই থেকে শিকদার বাড়ির গোড়াপত্তন। বাড়ি হল, জমিজমা হল কিন্তু কোন সন্তান নেই বলে কাসেম শিকদারের মনে দুঃখের অন্ত ছিল না। বুড়ি ছমিরন তা বুঝতে পেরে নিজের হাতে সাজিয়ে স্বামীকে পাঠালেন নিকা করতে। কিন্তু ঘরে নতুন বউ আসার আগেই ধুতুরার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। দিঘির পারের উঁচু ঢ়িপির মতো কবরটা তারই।

মকবুলের দুই বউ আমেনা আর টুনি ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল আর মকবুল ঠেলে দিচ্ছিল ধান। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় ঢেঁকি এসে পড়ে তার হাতে। মকবুল ভাবে তার দুই বউ শত্রুতা করে এ-কাজ করেছে। তাই আঘাতের জায়গায় ভেজা ন্যাকড়া বেঁধে দিতে গেলে টুনির দিকে সে একটা কাঠের টুকরা ছুঁড়ে মারে।

রাতেরবেলায় মন্তু আর টুনি বের হয় জাল নিয়ে– উদ্দেশ্য পুকুরে পুকুরে লুকিয়ে জাল ফেলে মাছ ধরে আনা। ইদানীং রাতে লুকিয়ে মাছ ধরাঁটা ওদের দুজনের কাছে নেশার মতো হয়ে গেছে। মন্তু জাল ফেলে আর পেছনে টুকরি নিয়ে থাকে টুনি। এ-কাজে ধরা পড়ার ভয় যে নেই তেমন নয়। তাই মন্তু গনু মোল্লার কাছ থেকে তিন আনা পয়সা খরচ করে একটা জোরদার তাবিজ নিয়েছে। অবশ্য আজ রাতে তেমন মাছ পেল না ওরা, পেল শুধু কিছু গুঁড়ো চিংড়ি। তাই হতাশ হয়ে তারা বাড়ি ফিরে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সনাক্তকরণ

বাম দিকের বাক্যাংশগুলোর সঙ্গে তথ্যগতভাবে মিল রয়েছে এনন বাক্যাংশ ডান দিক থেকে খুঁজে বের করুন।

১. তেরশ সনের বন্যায়	১. চার দিন চার রাত।
২. কলসি থেকে টাকা বের করে	২. একটা জোরদার তাবিজ নিয়েছে।
৩. কাসেম শিকদার ভেলায় ভেসে ছিল	৩. গমগম শিকদার বাড়ি।
৪. মন্তু গনু মোল্লার কাছ থেকে	৪. বাবুই পাখির বাসায় ছিল পুঁটির ঝাঁক।
৫. রাত জেগে মাছ ধরা	৫. দুচার বিঘে জমি কিনে ফেললো।
৬. ধপাস ধাপাস ঢেঁকির শব্দে	৬. ইদানীং একটা নেশা হয়ে গেছে ওদের।
৭. বুড়ো কাসেম শিকদার সব পাবার পরও	৭. মনে মনে দুঃখ পেতেন।
৮. মাসখানের হল ফাতেমা	৮. কুলাউড়ার বাসিন্দা।
৯. মন্তু এক হাঁটু পানি থেকে নীরবে	৯. একগলা পানিতে নেমে গেল।
	১০. বাপের বাড়ি গেছে।

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. বুড়ি ছমিরন বুঝতেন কেন স্বামীর মনে সুখ নেই, ..., আহারে রুচি নেই।
২. গুনে গুনে ..... হাতে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সেগুলো মুখে পুরে দিয়ে .....।
৩. ..... বিয়ে করেনি সে। পুরো ..... মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছে।
৪. দরকার নাই, দরকার নাই। ..... দরকার নাই।
৫. মনে মনে বারবার ..... ডাকছিল মন্তু,.....।
৬. সাপের কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ একটা ..... ফোঁস করে ওঠে সরে যায় ..... ।
৭. টুনি বলে থাক, আইজ থাউক, চলো .....।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিকদার বাড়ি পত্তনের ইতিহাস বর্ণনা করুন।
২. বউদের দিয়ে লাঙল টানানোর জন্য মকবুল কী পরিকল্পনা করেছিল?
৩. মন্তু আর টুনির লুকিয়ে মাছ ধরার কথা বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

সনাক্তকরণ

১. বাবুই পাখির বাসায় ছিল পুঁটির ঝাঁক।
২. দুচার বিঘে জমি কিনে ফেললো।
৩. চারদিন চার রাত।
৪. একটা জোরদার তাবিজ নিয়েছে।
৫. ইদানীং একটা নেশা হয়ে গেছে ওদের।
৬. গমগম শিকদার বাড়ি।
৭. মনে মনে দুঃখ পেতেন।
৮. বাপের বাড়ি গেছে।
৯. একগলা পানিতে নেমে গেল।

শূন্যস্থান পূরণ

১. চোখে ঘুম নেই
২. চারটে ফুল; নীরবে ঘুমিয়ে পড়লেন।
৩. মুফত; চার চারটে টাকা
৪. অত সোয়াগের
৫. খোদাকে; খোদা তুমিই সব
৬. আঁধি সাপ; সামনে থেকে।
৭. বাড়ি ফিইরা যাই।

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ১ : শিকদার বাড়ি পত্তনের ইতিহাস বর্ণনা করুন।

উত্তর : তেরশ' সনের বন্যায় কুলাউড়া, নিজামপুর আর রহমতোগঞ্জ ভেসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। বন্যার পানি ওঠেছিল প্রায় তালগাছের মাথায়। ঘর-বাড়ি, গোয়াল, গরু, জ্যান্ত মানুষ, মরা মানুষ সব ভেসে একাকার হয়ে গেল। প্রাণে বাঁচবার জন্যে বুড়ো কাসেম শিকদার আর বুড়ি ছমিরন কলার ভেলায় চেপে বেরিয়ে পড়লেন অনির্দেশ্য পথে। চারদিন চাররাত ভাসতে ভাসতে অবশেষে পরীর দিঘির পাড়ে ডাঙায় এসে তারা শুকনোয় আশ্রয় পান। গ্রামটা দেখে ভাল লাগে কামেস শিকদারের। কলার ভেলায় ভাসবার আগে সঙ্গে করে যে টাকা ভর্তি কলসিটা নিয়ে এসেছিলেন সেখান থেকে টাকা বের করে দুচার বিঘে জমি কিনে থেকে যান সেখানেই। গোড়াপত্তন করেন শিকদার বাড়ির।

প্রশ্ন ২ : বউদের দিয়ে লাঙল টানানোর জন্য মকবুল কী পরিকল্পনা করেছিল?

উত্তর : আমেনা আর টুনি ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে ঢেঁকিতে চাপ দিচ্ছিল। সামনে বসে সোনারঙ ধানগুলো ঢেঁকির নিচে ঠেলে দিচ্ছিল মকবুল। আর মনে মনে ভাবছিল বাড়ির সামনের জমিটা কি করে লাঙল দেয়া যায়। তার লাঙল একটা আছে বটে কিন্তু গরু নেই গরু না হলে লাঙল টানবে কে? হঠাৎই বুদ্ধিটা তার মাথায় আসে। বউ দুটোকে সে লাঙলে জুড়ে দেবে। একবার মনে হল এতে লোকে অবশ্য তাকে গালাগাল করবে, নানা কথা বলবে। কিন্তু তার তো এখনই প্রয়োজন লাঙল দেয়ার। ফলে একটা বিকল্প চিন্তা তার মাথায় আসে। সে বউদের দিয়েই লাঙল টানাবে, তবে দিনে নয় রাতে। এতে লোকজনের দেখে ফেলার সম্ভাবনা নেই। বউদের আপত্তির কথা তার মনে হয় বটে কিন্তু সে তো পুরো চার টাকা মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছে, ফলে তাদের আপত্তি সে শুনবে না।

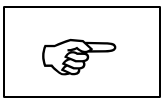

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- আবুলের চরিত্র সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- নারী নির্যাতন সম্পর্কিত একটি অমানবিক কিন্তু সত্যের বর্ণনা দিতে পারবেন।

সকালে ঘুম থেকে ওঠে ফুলা হাতটা কোলে নিয়ে বসে বসে আবুল আর হালিমার ঝগড়া দেখছিল মকবুল। অনেকক্ষণ কি একটা বিষয় নিয়ে তর্ক চলছে ওদের মধ্যে। দাওয়ায় বসে বসে যা মুখে আসছে ওকে বলে যাচ্ছে আবুল। হালিমাও একেবারে চুপ করে নেই। ওঠোনে একটা লাউয়ের মাচা বাঁধতে বাঁধতে দুএকটা জবাবও দিচ্ছে সে মাঝে মাঝে।

মকবুল হাতের ব্যথায় মৃদু কাতরাচ্ছিল আর পিটপিট চোখে তাকাচ্ছিল ওদের দিকে। হঠাৎ দাওয়া থেকে ছুটে এসে মুহূর্তে হালিমার চুলের গোছাঁটা চেপে ধরল আবুল। তারপর কোন চিন্তা না করে সজোরে একটা লাথি বসিয়ে দিল ওর তলপেটে। উঃ মাগো, বলে পেটটা দুহাতে চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল হালিমা। রাগে তখন ফোঁপাচ্ছে আবুল। জানে খতম কইরা দিমু না তোরে। কাইটা রাস্তায় ভাসায় দিমু না। বলে আবার ওর চুলের গোছাতে হাত দিতে যাচ্ছিল আবুল, বুড়ো মকবুল চিৎকার করে উঠল, খবরদার আবুইল্যা, তুই যদি বউয়ের গায়ে আরেকবার হাত তুলছস তাইলে ভালো অইবো না কিন্তুক। আমার গরনীর গায়ে হাত তুলি কি যা ইচ্ছা করি, কইবার কে আঁ? পরক্ষনে আবুল জবাব দিল, তুমি যহন তোমার ঘরনীরে তুলাপেডা কর তহন কি আমরা বাধা দিই।

অমন কোনঠাসা উত্তরের পর আর কিছু বলার থাকে না মকবুলের। শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে এক নজর ওর দিকে তাকাল মকবুল। আবুল তখন ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে চলেছে হালিমাকে। ভিতরে নিয়ে গিয়ে মনের সুখে মারবে। ওর ইচ্ছাটা হয়ত বুঝতে পারছিল হালিমা। এই মাটি আকড়ে ধরে গোঙাতে লাগল সে, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আর মাইরো না, মইরা যামু।

আহারে। এরে মাইয়াডারে মাইরা ফালাইস না। ওরে ও পাষাইণ্যা, দরজা খোল, মারিস না আর মারিস না, জাহান্নামে যাইবি, মারিস না। বাইরে থেকে দুহাতে ঝাঁপিটাকে ঠেলছে ফকিরের মা। আবুল একবার তাকাল সেদিকে, কিন্তু ঝাঁপি খুলল না।

বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। মেরে মেরে এর আগে দুটো বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে।

প্রথম বউটা ছিল এ গাঁয়েরই মেয়ে। আয়েশা। একটু বেঁটে, একটু মোঁটা আর রঙের দিক থেকে শ্যামলা। অপূর্ব সংযম ছিল মেয়েটির। আশ্চর্য শান্ত স্বভাব। কত মেরেছে ওকে আবুল। কোনদিন একটু শব্দও করেনি। একটা সামান্য প্রতিবাদ নেই। শুধু আড়ালে নীরবে চোখের পানি ফেলত মেয়েটা।

তারপর একদিন ভীষণভাবে রক্তবমি শুরু হল ওর। জমাঁট বাঁধা কালো রক্ত। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে মারা গেল আয়েশা।

আয়েশা টিকেছিল বছর তিনেক। তার পরেরটা কিন্তু ওর চাইতেও কম। মাত্র দুবছর।

অবশ্য জমিলার মাত্র দুবছর টিকে থাকার পেছনে একটা কারণও আছে। ও মেয়েটা ছিল একটু বাচাল গোছের আর একটু রুক্ষ মেজাজের। সহজে আবুলের কিল চাপড়গুলো গ্রহণ করতে রাজি হত না সে। মারতে এলে কোমরে আঁচল বেঁধে রুখে দাঁড়াত।

বাধা দিতে গিয়ে পরিণামে আরো বেশি মার খেত জমিলা। ও যখন মারা গেল আর ওর মৃত দেহটা যখন গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করছিল সবাই তখন ওর সাদা ধবধবে পিঠের ওপর সাপের মতো আঁকাবাঁকা ফুলে ওঠা রেখাগুলো দেখে শিউরে ওঠেছিল অনেকেই। ওরে পাষাইন্যারে এমন দুধের মতো মাইয়াঁডারে শেষ করলি তুই। আয়েশা মারা যাবার পর অবশ্য ভীষণ কেঁদেছিল আবুল। গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁদেছিল সারা ওঠোনে। পাড়াপড়শিদের বলেছিল, আহা বড় ভালো বউ আছিল আয়েশা। আমি পাষাইন্যা তার কদর বুঝলাম না। আহারে এমন বউ আর পামু না জীবনে।

আয়েশার শোকে তিনদিন এক ফোঁটা দানাপানিও মুখে পোরে নি আবুল। তিন রাত কাটিয়েছে ওর কবরের পাশে বসে আর শুয়ে। পাড়াপড়শিরা ভেবেছিল ওর চরিত্রে বুঝি পরিবর্তন এল এবার। এবার ভাল দেখে একটা বিয়ে শাদি করিয়ে দিলে সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করবে আবুল।

কিন্তু জমিলার সঙ্গেও সেই একই ব্যবহার করেছে আবুল। একই পরিণাম ঘটেছে জমিলার জীবনেও।

দ্বিতীয় বউয়ের মৃত্যুতে আবুলের গড়াগড়ি দিয়ে কান্নার কোন মূল্য দেয় নি পড়শিরা। মুখে বিরক্তি এনে বলেছে, আর অত ঢঙ করিস না আবুইল্যা। তোর ঢঙ দেইখলে গা জ্বালা করে।

আমার বউয়ের দুঃখে আমি কাঁদি, তোমাগো গা জ্বালা করে ক্যান? ওদের কথা শুনে ক্ষেপে ওঠে আবুল।

কপালে এক মুঠো ধুলো ছুঁয়ে সহসা একটা প্রতিজ্ঞা করে বসে সে, এই তওবা করলাম বিয়া শাদি আর করমু না। খোদা, আমারে আর বিয়ার মুখ দেখাইও না। বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে আবুল।

পড়শিরা গালে হাত দিয়ে বলেছে, ইয়া আল্লা, এই কেমনতর কথা। বউ মারলি তুই, সেই কথা বইলা কি শত্রুতামি করলাম নাকি আমরা? সাচা কথা কইলেই তো মানুষ শত্রু হয়। ঠিক কইছ বইচর মা, সাচা কথা কইলেই এমন হয়। তা, আমাগো কইবারও বা দরকার কি। ওর বউরে মারুক কি কাঁুক, কি নদীতে ভাসায় দিক, আমাগো কি আছে তাতে?

সেদিন থেকে আবুলের সাতে পাঁচে আর কেউ নেই ওরা।

আজকাল হালিমাকে যখন প্রহর অন্তর একবার করে মারে আবুল তখন কেউ কিছু বলে না। চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে বুড়ো মকবুল এক-আধটু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। আবুইল্যা, তোর কি মানুষের পরান না, এমন কইরা যে মারছ বউডারে তোর মনে একটুও চোঁ লাগে না আবুইল্যা? বউদের অবশ্য মকবুলও মারে। তাই বলে আবুলের মতো অত নির্দয় হওয়াঁটা মোটেই পছন্দ করে না সে। এ হলো মকবুলের নিজস্ব অভিমতো। অপরাধ, এমন কোন সাংঘাতিক করেনি হালিমা। পাশের বাড়ির নুরুর সঙ্গে কি একটা কথা বলতে গিয়ে হেসেছিল জোরে। দূর থেকে সেটা দেখে গা জ্বালা করে ওঠেছে আবুলের। একটা গভীর সন্দেহে ভরে ওঠেছে মন।

এমন মন খোলা হাসি তো আবুলের সঙ্গে কোনদিন হাসে নি হালিমা।

বেহুঁশ হালিমাকে ভেতরে ফেলে রেখে আবুল যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত নেমেছে ওর। পরনের লুঙ্গি দিয়ে গায়ের ঘামটা মুছে নিয়ে দাওয়ার ওপর দম ধরে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিল আবুল। মাটির হুঁকোঁটাকে নেড়েচেড়ে কি যেন দেখল, তারপর কলকেটা হাতে নিয়ে ওঠে দাঁড়াল সে।

রশীদের বউ সালেহা ওঠোনে বসে চাঁটাই বুনছিল। আবুলকে এদিকে আসতে দেখে সালেহা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ঘরনী যদি মনের মতো না হয় তাইলে কি তারে নিয়ে আর সুখে ঘর করণ যায়?

আর ভাবী, দুনিয়াদারী আর ভাল লাগে না। ইচ্ছা করে দুই চোখ যেই দিকে যায় চইলা যাই। বলে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে আবুল। তারপর কলকেটা সালেহার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, চুলায় আগুন আছে? একটুহানি আগুন দাও।

এই দিই, বলে কলকেটা হাতে নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল সালেহা। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এল সে। ও কাছে আসতে গলার স্বরটা একেবারে খাদে নামিয়ে এনে আবুল বলল, আইজ আর ছাড়ি নাই ভাবী। যতক্ষণ পারছি মারছি। তুমি একটু তেল গরম কইরা মালিশ কইরা দিও ওর গায়ে। হাড্ডি না দুই একখানা ভাইঙ্গা গেছে কে জানে। তাইলে তো বড় বিপদ অইবো। কাম কাজ কত পইর‍্যা রইছে। সব কিছু বন্ধ অইয়া যাইবো।

সেই কথা আগে খেয়াল আছিল না মিয়ার? সালেহা মুখ বাঁকাল। কাম কাজের যখন ক্ষতি অইবো জান, তহন না মারলেই পাইরতা। মারলা ক্যান।

উঁহু, আবুল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, মারছি ঠিক করছি, না মারলে আস্কারা পাইয়া যাইতো।

আর আস্কারা কি এমনে কম পাইছে? চারদিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে সালেহা বলল, নুরুর সঙ্গে কি আজকা কথা কইছে? ওতো রোজ রোজ কথা কয়।

কি? চোখ জোড়া আবার ধপ করে জ্বলে উঠলো আবুলের, আমারে এতেঠদিন কও নাই ক্যান?

সালেহা বলল, কি দরকার বাবু আমাগো মিছামিছি শত্রু বইনা। কইতাম গেলে তো অনেক কথাই কইতে অয়। তা কি আর একদিনে শেষ করা যায়।

কি কথা কও ভাবী। খোদার কসম ঠিক কইরা কও। তামাক খাওয়াঁটা একেবারে ভুলে গেল আবুল। সালেহা আস্তে করে বলল, যাই কও বাবু কারো বদনাম করার অভ্যাসই আমার নাই। কিন্তুক কই কি এই বউডা তোমার বড় ভালো অয় নাই। আমরা তো আয়শাকেও দেখছি, জমিলারেও দেখছি। ওরা তো আমাগো হাতের ওপর দিয়েই গেছে। ওগো তুলনা আছিল না। কিন্তু হালিমার স্বভাব চরিত্র বাবু আমার বড় ভাল লাগে না। বলতে গিয়ে বার কয়েক কাশল সালেহা। কাশটা গিলে নিয়ে আবার সে বলল, ইয়ে মানে, বাইরের মানুষের সঙ্গে হাসাহাসি। একটুখানি লজ্জা শরমও তো থাকা চাই। কথা শেষে আবুলের রক্তলাল চোখ জোড়ার দিকে দৃষ্টি পড়তে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল সালেহা। একটু ধমকের সুরে বলল, দেইখো বাপু, তুমি আবার মাইয়াডারে মারতে শুরু কইরো না। এমনিতেই বহুত মারছ। এতে যদি শিক্ষা না হয় তাইলে আর এ জন্মেও হইবো না। সালেহার কথাঁটা শেষ হবার আগে সেখান থেকে চলে গেছে আবুল। কল্‌কেটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে সে। একটু পরে আবার হালিমার কান্নার শব্দ শোনা গেল ঘর থেকে। আবুল আবার মারছে তাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

দাওয়া – বারান্দা। **লাউয়ের মাচা** – লাউ গাছের জন্য বাঁশ কঞ্চি ইত্যাদি দিয়ে বানানো উঁচু জায়গা। **মৃদু** – সামান্য। **জানে খতম কইরা দিমু** – প্রাণে মেরে ফেলবো। **ঝাঁপি** – বাঁশ দিয়ে বানানো বেড়া বিশেষ। **পৈশাচিক** – পিশাচের মতো, অমানবিক। **বাচাল** – যে অতিরিক্ত কথা বলে। **রুক্ষ** – কঠোর, রস-কষহীন। **ওঠোন** – প্রাঙ্গণ, আঙিনা। **পাষাইণ্যা** – পাষাণ শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **ঢঙ** – ছলাকলা, ছলনা, ভান। **সাচা কথা** – সত্য কথা। **প্রহর-অন্তর** – প্রত্যেক প্রহরে। **গলার স্বরটা একেবারে খাদে নামিয়ে** – কণ্ঠস্বরটা একেবারে নিচু করে বা আস্তে করে। **আস্কারা** – প্রশ্রয় দেয়া, লাই দেয়া। **শত্রু বইনা** – শত্রু হয়ে।

বস্তুসংক্ষেপ

হালিমা আর আবুল সকাল থেকেই ঝগড়া বাধিয়েছে। আগের রাতে মকবুল হাতে আঘাত পেয়েছে ফলে হাতটা ফুলে ওঠেছে। বারান্দায় বসে হাতের ব্যথা নিয়েই মকুবল ওদের ঝগড়া দেখছিল। ঝগড়ার এক পর্যায়ে আবুল রেগে গিয়ে হালিমার তলপেটে একটা লাথি কষিয়ে দেয় তারপর লাউয়ের মাচার নিচ থেকে ঘরে এনে ঘরের ঝাঁপি বন্ধ করে দিয়ে মারতে থাকে। মকবুল আর ফকিরের মা অবশ্য আবুলকে বাধা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু কোন লাভ হয় না। কারণ বউ পিটিয়ে আবুল যেন একটা পৈশাচিক আনন্দ পায়।

এর আগেও পিটিয়ে দুদুটো বউকে আবুল মেরে ফেলেছে। হালিমা তার তৃতীয় স্ত্রী। এ স্ত্রীকেও আবুল নির্বিচারে পেটায়, প্রহর অন্তর একবার করে মারে। আজকাল অবশ্য বাড়ির কেউ আর এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। সবাই ধরে নিয়েছে আবুলের চরিত্রের কোন প্রকার সংশোধনের সম্ভাবনা নেই। সে বউ পেটাবেই।

হালিমাকে আজ এভাবে মারার কারণ পাশের বাড়ির নুরুর সঙ্গে সে কি একটা কথা বলতে গিয়ে হেসেছিল। এতেই আবুলের মনে কুৎসিত একটা সন্দেহ দেখা দেয়। তারই প্রকাশ হালিমার প্রতি এই অমানবিক অত্যাচার। হালিমাকে মেরে মেরে ক্লান্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হুঁকা ধরানোর জন্যে আবুল রশীদের বউ সালেহার কাছে আগুন চায়। কুটনি প্রকৃতির সালেহা এই সুযোগে আবুলের মনে হালিমার চরিত্র সম্পর্কে আরো খানিকটা সন্দেহের বিষ ঢেলে দেয়। আবুল এতে দ্বিতীয় বারের মতো উত্তেজিত হয়ে প্রায় বেহুঁশ হালিমাকে আবার মারতে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের বাম দিকে দেয়া প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান দিকে উত্তর লিখুন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. আবুলের সঙ্গে ঝগড়ার সময় হালিমা কি করছিল?	
২. ফকিরের মা আবুলকে কি বলে হালিমাকে মারতে বাধা দেয়?	
৩. আবুল হালিমাকে মারে কেন?	
৪. আয়েশাকে আবুল কীভাবে মেরে ফেলেছিল?	
৫. জমিলার চরিত্র কেমন ছিল?	
৬. আয়েশার মৃত্যুর পর আবুল কী করেছিল?	
৭. বউদের মারা সম্পর্কে মকবুলের ধারণা কী?	
৮. সালেহা কীভাবে আবুলকে উত্তেজিত করে?	

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. আবুল দাওয়া থেকে ছুটে গিয়ে কী করল?
   ক. হালিমাকে একটা লাথি মারল — খ. হালিমার চুলের গোছা চেপে ধরল
   গ. হালিমাকে যাচ্ছে তাই বলে গালি দিল — ঘ. লাঠি দিয়ে হালিমাকে আঘাত করল

২. বউ মারায় আবুল-
   ক. ভীষণ আনন্দ পায় — খ. বেশ আনন্দ পায়
   গ. পৈশাচিক আনন্দ পায় — ঘ. অমানবিক আনন্দ পায়

৩. এই তওবা করলাম বিয়া শাদি আর করমু না। - কে বলেছে?
   ক. হালিমা — খ. আবুল
   গ. মকবুল — ঘ. আয়েশা

৪. কার সঙ্গে কথা বলার সময় হালিমা হেসেছিল?
   ক. আবুলের সঙ্গে — খ. মকবুলের সঙ্গে
   গ. জমিলার সঙ্গে — ঘ. নূরুর সঙ্গে

৫. 'আর অত ঢঙ করিস না আবুইল্যা' - কে বলেছিল?
   ক. মকবুল — খ. নূরু
   গ. হালিমা — ঘ. পড়শিরা

৬. 'যাই কও বাপু কারো বদনাম করার অভ্যাসই আমার নাই'- কার উক্তি?
   ক. সালেহার — খ. হালিমার
   গ. আয়েশার — ঘ. টুনির

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আবুলের চরিত্রের পরিচয় দিন।
২. 'গ্রামবাংলার নির্যাতিত নারীর প্রতীক হালিমা' - ব্যাখ্যা করুন।
৩. আবুল মানুষরূপী এক পশু - মানেন কী?

উত্তরমালা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ওঠোনে একটা লাউয়ের মাচা বাঁধছিল।

২. আহারে। মাইয়াডারে মাইরা ফালাইস না। ওরে ও পাষাইণ্যা, দরজা খোল, মারিস না আর মারিস না, জাহান্নামে যাইবি, মারিস না।
৩. আবুল মূলত বউ পিটিয়ে পৈশাচিক আনন্দ পায়। তবে আজ সে হালিমাকে মারছে কারণ পাশের বাড়ির নূরুর সঙ্গে কি একটা কথা বলতে গিয়ে জোরে হেসেছিল।
৪. প্রায়ই আয়েশাকে মারতো আবুল। মার খেয়ে খেয়ে একদিন রক্তবমি হয়ে ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে মারা গিয়েছিল আয়েশা।
৫. আবুলের বউদের মধ্যে জমিলা ছিল খানিকটা প্রতিবাদী। আবুল তাকে মারতে এলে সেও কোমরে আঁচল বেঁধে রুখে দাঁড়াত। অবশ্য তার এই প্রতিবাদী চরিত্রের কারণে পরিণামে সে বেশি মার খেত।
৬. আয়েশার মৃত্যুর পর আবুল কপালে ধুলো ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে আর কখনো বিয়ে করবে না। যদিও তার এ প্রতিজ্ঞা বেশি দিন টেকেনি।
৭. মকবুলও বউদেরকে কম বেশি মারে। তবে সে আবুলের মতো নির্দয় হওয়া পছন্দ করে না।
৮. সালেহা হালিমার স্বভাব চরিত্র যে ভাল নয় সে-কথা বলে আবুলকে উত্তেজিত করে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. ক

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন : আবুলের চরিত্রের পরিচয় দিন।

উত্তর : আবুল বুড়ো মকবুলের বাড়ির একঘর বাসিন্দা। তার ঘরে এখন তৃতীয় স্ত্রী, নাম হালিমা। এর আগে দুটো স্ত্রীকে সে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। বউ মারায় সে যেন পৈশাচিক আনন্দ পায়। আবুলের প্রথম স্ত্রী নাম ছিল আয়েশা, একই গ্রামের মেয়ে ছিল সে। আবুল তাকে কারণে অকারণে মেরেছে কিন্তু অপূর্ব সংযমী মেয়েটি কোন দিন প্রতিবাদ করেনি কেবল নীরবে চোখের জল ফেলেছে। মার খেতে খেতে শরীরের ভেতরে যে অদৃশ্য ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তার কারণেই হয়তো একদিন রক্ত বমি করে মাত্র দুঘণ্টার মধ্যে তার মৃত্যু ঘটে। একইভাবে সে জমিলাকেও বলতে গেলে খুন করেছে। জমিলার মৃত্যুর পর গোসলের সময়ও তার পিঠে জেগে ছিল সাপের মতো আঁকাবাঁকা আঘাতের চিহ্ন আবুল প্রকৃত পক্ষে অমানবিক এক চরিত্র।

তবে জমিলার মৃত্যুর পর আবুল কেঁদেছিল- তিনদিন এক ফোঁটা দানাপানিও মুখে দেয়নি। কবরের পাশে শুয়ে বসে থেকেছে। কবরের মাটি কপালে ঠেকিয়ে আর বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। কিন্তু এ-সব কিছুই তার বাহানা মাত্র। সে তৃতীয় বারের মতো বিয়ে করেছে এবং তৃতীয় স্ত্রী হালিমাকেও প্রবলভাবে মারধোর করেছে, কারণে-অকারণে।

আবুল প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতার এক ভয়ঙ্কর প্রতীক। যে পুরুষতান্ত্রিকতা নারীকে সম্মান দিতে পারে না, ভালবাসতে পারে না, অধিকার দিতে পারে না- আবুল তারই প্রতিনিধি। যে কোন সমাজের জন্যই সে এক কলঙ্ক। আবুলের জন্য আমাদের কাছে ঘৃণাই সঞ্চিত রয়েছে শ্রদ্ধা বা ভালবাসা নয়।

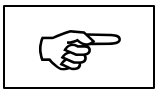

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- মন্তুর অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে পুঁথি পাঠের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কমলার পুঁথির কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।

এতেঠক্ষণে ঘুম থেকে উঠল টুনি।

এতেঠ শীঘ্র উঠত না সে, বুড়ো মকবুলের ধমক খেয়ে শুয়ে থাকাঁটা নিরাপদ মনে করল না। মনে মনে বুড়োকে এক হাজার একশো অভিশাপ দিল। চোখজোড়া জ্বালা করছে তার। মাথাঁটা ঘুরছে। ঘরের পাশে ছাইয়ের গাদা থেকে একটা পোড়া কাঠের কয়লা তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে দাঁত মাজতে পুকুরের দিকে চলে গেল। এক গলা পানিতে নেমে মন্তু গোসল করছে পুকুরে।

ঘোলাটে পানি আরো ঘোলা হয়ে গেছে।

কতগুলো হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে সাঁতার কাঁছে এপার থেকে ওপারে। আর মাঝে মাঝে মুখটা পানিতে ডুবিয়ে চ্যাপটা ঠোঁট দিয়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা।

কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো ঘাটের এক কোণে এসে নীরবে বসল টুনি। পা জোড়া পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে এক মনে দাঁতন করতে করতে হঠাৎ তার নজরে এল মন্তুর পিঠের ওপর একটা লম্বা কাঁটা দাগ। মনে হল কিছুক্ষণ আগেই বুঝি কিছুর সঙ্গে লেগে চিরে গেছে পিটঠটা। ওমা, বলে মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিল টুনি, এই এই শোন। মন্তু ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এইখানটা চিরলো কেমন কইরা, আঁ?

মন্তু হেসে দিয়ে বলল, গতকাল রাতে সগন শেখের পুকুর পাড়ে একটা বুনো লতার কাঁটা লাগছিল পিঠে।

টুনির চোখজোড়া মুহূর্তে করুণ হয়ে এল। দরদ ভরা কণ্ঠে সে আস্তে করে বলল, চলো কচু পাতার ক্ষির লাগাইয়া বাইন্দা দি, নইলে পাইকা যাইবো, শেষে কষ্ট পাইবা।

মন্তু আবার একগলা পানিতে নেমে যেতে যেতে বলল, দূর কিছু অইবো না আমার।

টুনি কিছু বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ মকবুলের উঁচু গলার ডাক ওর কথায় ছেদ পড়ল।

কই টুনি বিবি, বলি বিবিজানের মুখ ধোয়ন কি এহনো অইলো না নাকি? রান্নাঘর থেকে চিৎকার করছে বুড়ো মকবুল। কাল রাতে যে ধানগুলো ভানা হয়নি সেগুলো ভানতে হবে এখন। হাত ভেঙে ফুলে গেলেও সহজে বসে থাকার পাত্র নয় মকবুল।

তাড়াতাড়ি হা-মুখ ধুয়ে নিয়ে বুড়োর মৃত্যু কামনা করতে করতে ঘাঁ থেকে ওঠে গেল টুনি।

মন্তুর কোন জমিজমা নেই।

পরের জমিতে খেটে রোজগার করে। লাঙল চষে। ধান বোনে। আবার সে ধান পাকলে পরে কেটে এনে মালিকের গোলা ভর্তি করে। তারপর ধানের মরশুম শেষ হয়ে গেলে কলাই, মুগ, তিল, সরিষার খেতে কাজ করে মন্তু। মাঝে মাঝে এ বাড়ি ও বাড়ি লাকড়ি কাঁটার চুক্তি নেয়। পাঁচ মণ এক টাকা। কোন কোন দিন আঁ নয় মণ লাকড়িও কেটে ফেলে সে। মাঝে কিছুকাল মাঝি- বাড়ির মন্তু শেখের ছেলে করিম শেখের সঙ্গে নৌকা বেয়েছিল মন্তু। নৌকায় পাল তুলে অনেক দূরের গঞ্জে চলে যেত ওরা। ওখান থেকে যাত্রী কিংবা মাল নিয়ে ফিরত। ক্ষেতের রোজগারের চেয়ে নৌকায় রোজগার অনেক বেশি।

মাচাঙের ওপর থেকে আধ ময়লা ফতুয়াঁটা নামিয়ে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে মন্তু ভাবল, আজ একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করবে গিয়ে। তখন সন্ধার কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে গ্রামের বুকে। মিয়া-বাড়ির মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে। মাথায় টুটিপা পরে নিয়ে তসবিহ হাতে নামাজ পড়তে চলছেন গনু মোল্লা। মোরগ হাঁসগুলো সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার পর এখন ওঠোনের একোণে এসে জটলা বেঁধেছে। একটু পরে যার যার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকবে ওরা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল মন্তু। মাঝি-বাড়িটা বেশি দূরে নয়।

সগন মেখের পুকুরটা বাঁ দিকে রেখে ডান দিকে মিয়াদের খেজুর বাগানটা পেরিয়ে গেলে দুটো ক্ষেত পরে মাঝি-বাড়ি। বাড়ির সামনে দিয়ে দাঁড়াতে মন্তু শেখের গরু ঘরের পেছন থেকে একটা লোম ওঠা হাড় বেড় করা কালো কুকুর দৌড়ে এসে বিকট চিৎকার জুড়ে দিল। হেই হেই করে কুকুরটাকে তাড়াটাবার চেষ্টা করলো সে।

দেউড়ির সামনে বাঁশের ওপরে ঝুলিয়ে রাখা সুপুরি পাতার ঝালরের আড়াল থেকে একটা গানের কলি গুন্‌গুন্‌ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এল আম্বিয়া।
আরে মন্তু ভাই দেখি। কি খবর?
মন্তু বলল, করিম আছে নাহি?
মাথার চুলগুলো খোঁপার মধ্যে গুটিয়ে নিতে নিতে আম্বিয়া বলল, আছে।
আইজ কয়দিন থাইকা জ্বর অইছে ভাইজানের।
কি জ্বর? কহন অইছে? মন্তুর চোখে উৎকণ্ঠা।
আম্বিয়া আস্তে করে বলল, পরশু রাইত থাইকা অইছে। কি জ্বর তা কইবার পারলাম না।
মন্তু কি যেন চিন্তা করল। তারপর ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াতে আম্বিয়া পেছন থেকে ডাকল, চইলা যাও ক্যান? দেখা কইরা যাইবা না? আম্বিয়ার পিছু পিছু হোগলার বেড়া দেয়া ঘরটায় এসে ঢুকল মন্তু। কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে ম্লান হেসে করিম বলল, মন্তু মিয়া যে, তোমারে তো আইজ-কাল দেখাই যায় না। বাঁইচা আছি না মইরা গেছি তাও তো খোঁজ-খবর নাও না মিয়া।
মন্তু প্রথমে বিব্রত বোধ করল, তারপর বলল, দেখা না অইলে কি অইবো মিয়া খোঁজ-খবর ঠিকই নিই।
কল্‌কেতে তামাক সাজিয়ে এনে হুঁকোঁটা মন্তুর দিকে বাড়িয়ে দিল আম্বিয়া। তারপর জিজ্ঞেস করল পান খাইবা? মন্তু হাত বাড়িয়ে হুঁকোঁটা নিতে নিতে বলল, না থাউক। আপন মনে কিছুক্ষণ হুঁকো টানল সে। তারপর আসল কথাঁটা আলোচনা করল ওর সঙ্গে। করিম শেখের সঙ্গে আবার কিছুদিনের জন্য নৌকায় কাজ করতে চায় মন্তু।
শুনে খুশি হল করিম। বলল, নাওটারে একটু মেরামতো করন লাগব।
কাল পরশু একবার আইসো।
আবার আসবে বলে উঠতে যাচ্ছিল মন্তু।
করিম সঙ্গে সঙ্গে বলল, আহা যাও কই, বহ না।
না। রাইত অইছে যাই এইবার।
আম্বিয়া বলল, বহ মন্তু ভাই, চাইরডা ভাত খাইয়া যাও।
এর মধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে ছেঁড়া ময়লা শাড়িটা পাল্টে একটা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরে এসেছে আম্বিয়া।
মুখখানা গামছা দিয়ে মুছে এসেছে সে। কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মন্তু। ওকে অমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিব্রত বোধ করল আম্বিয়া, দাঁড়াইয়া রইলা ক্যান, বহ না।
মন্তু বলল, না আইজ না। আর একদিন খামু। বলে বাইরে বেরিয়ে এল মন্তু।
পিদিম হাতে দেউড়ি পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে গেল আম্বিয়া। মন্তু শুধাল তোমার আব্বা কই গেছে?
আম্বিয়া বলল, যেই কাজ কইরা বেড়ায় সেই কাজ করতে গেছে। যাইবো আবার কই। ওর গলায় ক্ষোভ।
ওর মুখের দিকে এক নজর তাকাল মন্তু। ওর ক্ষোভের কারণটা সহজে বুঝতে পারল। সাত গ্রামের মরা মানুষকে কবর দিয়ে বেড়ায় নন্তু শেখ। আশেপাশের গ্রামে গত ত্রিশ বছর ধরে যত লোক মরছে সবার কবর খুঁড়েছে নন্তু শেখ। এ তার পেশা নয় নেশা।

আম্বিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় নেমে এলো মন্তু তখন সে অনুভব করল বেশ রাত হয়েছে। চারপাশে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ডাক। মাঝে মাঝে গাছের মাথায় দু-একটা পাখি হঠাৎ পাখা ঝাঁপটিয়ে আবার নীরব হয়ে যাচ্ছে। আকাশে ভরা চাঁদ হাসছে খলখলিয়ে। বাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই সুরত আলীর সুর করে পুঁথি পড়ার শব্দটা কানে এল মন্তুর।
ওঠোনে বেশ বড় রকমের জটলা বেঁধেছে একটা। মাটিতে চাঁটাই বিছিয়ে বসেছে সবাই। আর তার মাঝখানে একটা পিদিমের আলোতে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত। পুরুষরা তার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেও মেয়েরা বসেছে একটু দূরে। যাদের বয়স কম তারা বসেছে আরো দূরে। দাওয়ার ওপরে।

বুড়ো মকবুল গুড়ুক গুড়ুক টানছে আর বারবার প্রশংসা করছে সুরত আলীর পুঁথি পড়ার। বড় সুন্দর পুঁথি পড়ে সুরত আলী। এ গাঁয়ের সেরা পুঁথি পড়ুয়া সে।
আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে। ভরা চাঁদ খলখলিয়ে হাসে। দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস অতি ধীরে তার চিরুনি বুলিয়ে যায় গাছের পাতায় পাতায়। কাক ডাকে না। চড়ুই আর শালিক কোন সাড়া দেয় না। গ্রামের সবাই সারা দিনের কর্মব্যস্ততার কথা ভুলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। নিঃশব্দ নিঝুম রাতে কুঁড়েঘরের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে হেলে পড়ে ওঠোনের মাঝখানে। তখন সুর করে পুঁথি পড়ে সুরত আলী। গাজি কালুর পুঁথি। ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি।

শুন শুন বন্ধুগণরে, শুন দিয়া মন।
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন।
কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।

উৎকর্ণ হয়ে শোনে সবাই। সুরত আলী পড়ে। ঢুলে ঢুলে সুর করে পড়ে সে। পুরুষেরা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানে। মেয়েরা পান চিবায়। মাঝে মাঝে কমলার পুঁথিটাও পড়ে শোনায় সুরত। কমলার কিচ্ছা বর্ণনা করে সবার কাছে। কিচ্ছা নয়, একেবারে সত্য ঘটনা। হিরণ্য নগরের মেয়ে ছিল কমলা। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ভোজ উৎসব করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একদিন বিয়ে হয়ে গেল তার হিরণ্য নগরের রাজকুমারের সঙ্গে। বড় সুখে দিন কাঁছিল ওদের।
এক বছর পরে একটা দুধের মতো মেয়ে জন্ম নিল ওদের।
আঁ বেহারার পালকি চড়ে একদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে লাল পরী নীল পরী আর সবুজ পরীর দিঘির পাড় দিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিল কমলা। দিঘি দেখে পালকি থেকে নামল সে। চৈত্র-মাসের খর রোদে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল ওর। দিঘির স্বচ্ছ পানি দেখে বড় লোভ হল কমলার। পানিতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে আঁজল ভরে পানি খেল সে। তারপর যখন উঠতে যাবে, দেখল, চুলের মতো সরু কি যেন একটা কড়ে আঙুলের গোড়ায় আঁকে রয়েছে। হাত দিয়ে ছাড়াতে গেল। পারল না কমলা। যত টানে তত লম্বা হয় সে চুল। তার এক প্রান্ত পানির ভেতরে, অন্য প্রান্ত কড়ে আঙুলের সঙ্গে গিট আঁটা। ছাড়াতেও পারে না কমলা, এগুতেও পারে না। এগুতে গেলে পানির ভেতর চুলে টান পড়ে। কে যেন টেনে ধরে রেখেছে ওটা। চারদিকে হই চই পড়ে গেল।
কত লোক এল। কত লোক গেল।
কত কামার কুমার ওঝা এসে জড়ো হল। কেউ কিছু করতে পারল না। ইস্পাতে তৈরি কুড়োল দিয়েও কাঁটা গেল না চুলটা? তিন মাস তিন দিন চলে গেল।

তারপরে- এক রাতে স্বপনে দেখিল সুন্দরী
দিঘির পানিতে আছে এক রাজপুরী

কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙে গেল কমলার। কাঁদল সবাই। বাবা, মা। স্বামী সবাই।
দিঘির পানি থেকে চুলে টান পড়ল এতেঠদিনে। পাতা পানি থেকে হাঁটু পানিতে নেমে গেল কমলা। হাঁটু থেকে বুক। তারপর গলা। ধীরে ধীরে দিঘির পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেল কমলা সুন্দরী।
চাঁদ হেলে পড়ে পুব থেকে পশ্চিমে।
ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।
ঢুলে ঢুলে পুঁথি পড়া শেষ করল সুরত আলী।

হীন মোয়াজ্জেমে কহেরে শুন সর্বজন
কমলা সুন্দরীর কিচ্ছা হইল সমাপন॥
ভুল চুক হইলে মোরে লইবেন ক্ষেমিয়া।
দোয়া করিবেন মোরে অধীন জানিয়া॥

পুঁথি পড়া শেষ হয়। কমলা সুন্দরী আর ভেলুয়া সুন্দরীর জন্যে অনেকে অনেক আফসোস করে মেয়ে বুড়োরা। আঁচল দিয়ে চোখের পানি মোছে আমেনা। টুনির চোখ জোড়াও পানিতে টলটল করে ওঠে। ফকিরের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সব খোদার ইচ্ছা, খোদা মাইরবার চাইলে কিনা করতা পারে। বুড়ো মকবুল কিছুক্ষণের জন্য হুকো টানতে ভুলে যায়। সে চুপ করে কি যেন ভাবে আর নীরব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।
খড়ম জোড়া তুলে নিয়ে হাত পা ধোয়ার জন্যে পুকুর ঘাটে চলে যায় মন্তু। অজু করে এসে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে আজ।
মাঝি বাড়ি থেকে ধপাস ধপাস ঢেঁকির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।
রাত জেগে আজও ধান ভানছে আম্বিয়া। বড় মিহি কণ্ঠস্বর ওর, বড় সুন্দর গান গায় সে।

ভুঁইরে না দিয়ো শাড়ি,
ভুঁই যাবো বাপের বাড়ি।
সর্ব লক্ষণ কাম চিক্কণ,
পঞ্চ রঙের ভুঁইরে॥

শব্দার্থ ও টীকা

ছাইয়ের গাদা – ছাইয়ের স্তূপ। **দাঁতন করা** – দাঁত মাজা। **মরশুম** – মৌসুম। **লাক্‌ড়ি** – খড়ি, জ্বালানী কাঠ। **খোয়াড়** – বাঁশ বা টিন দিয়ে বানানো হাঁস মুরগি রাখবার ঘর। **দেউড়ি** – বাড়িতে ঢোকার প্রধান পথ। **হোগলা** – তিনকোণা ও চ্যাপ্টা এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ। এগুলো দিয়ে সাধারণত ঘরের বেড়া দেয়া বা পাটি বানানো হয়। **নাও** – নৌকা। **অবিশ্রান্ত** – শ্রান্তিহীনভাবে, একটানা। **আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে** – যখন আকাশ জোছনার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। **মৃদু মন্দ** – নরম ও মধুর। **উৎকর্ণ** – শোনার জন্য কান খাড়া করে থাকা। **আঁ বেহারার পালকি** – যে পালকি আঁজন লোক ঘাড়ে করে নেয়। **স্বচ্ছ** – পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার। **আঁজল** – দুই হাত এক করে, অঞ্জলি। **ভুঁই** – । **অদৃশ্য** – যা দেখা যায় না।

বস্তুসংক্ষেপ

আগের রাতে বিভিন্ন পুকুরে লুকিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে ঘুমাতে দেরি হয় টুনির। ফলে ঘুম ভাঙতেও দেরি হয়। মকবুলের ধমক খেয়ে তাকে শাপ শাপান্ত করতে করতে টুনি ঘুম থেকে ওঠে।

মন্তুর নিজের কোন জমিজমা নেই। পরের জমিতে খেটে রোজগার করে যখন ক্ষেতের কাজ থাকে না তখন লাকড়ি কাটে। মাঝে মাঝে নৌকা চালানোর কাজও করে। এখন ক্ষেতের কাজ নেই তাই সন্ধ্যা বেলা করিম শেখের সঙ্গে দেখা করে নৌকা চালানোর কাজের কথা বলে। সেখানেই দেখা হয় আম্বিয়ার সঙ্গে। আম্বিয়া করিম শেখের বোন। আম্বিয়ার পীড়াপীড়িতে অনেকক্ষণ বসে রাত করেই সে বাড়ি ফিরে আসে।

বাড়িতে ফিরে দেখে সমস্ত উঠান জুড়ে জটলা পাকিয়ে বাড়ির সবাই সুরত আলীর পুঁথি পড়া শুনছে। সুরত আলী, ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি পড়ে, গাজীকালুর পুঁথি পড়ে। তবে আজ সে কমলার কিচ্ছা শুনাচ্ছিল সবাইকে। লাল পরী নীল পরী আর সবুজ পরীর দিঘিতে পানি খেতে নেমে এক আশ্চর্য চুলের বাঁধনে আঁকে গেল। তারপর একদিন কি করে সে দিঘির পানিতে হারিয়ে গেল। সুরত আলীর পুঁথির সুরে বাড়ির ছেলে-বুড়ো সবাই ভেলুয়ার বা কমলার দুঃখে দুঃখিত হয়। চোখের পানি মোছে। মন্তুও সুরত আলীর পুঁথি শোনে খানিকটা। তারপর পুকুর ঘাটে যায় কারণ হাতমুখ ধুয়ে আজ সে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের বাম দিকে দেয়া প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান দিকে উত্তর লিখুন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর
১. টুনির ঘুম থেকে উঠতে দেরি হল কেন আজ?	
২. মন্তুর পিঠে কাঁটা দাগ তৈরি হয়েছিল কীভাবে?	
৩. মন্তুর কতটুকু জমি আছে?	
৪. নৌকা নিয়ে মন্তু কোথায় কোথায় যায়?	
৫. নৌকা চালালে আয় কেমন হয়?	
৬. গ্রামের কোন বাড়িতে মসজিদ আছে?	
৭. করিম শেখের ক'দিন থেকে কী হয়েছে?	
৮. মন্তুকে পিদিম হাতে আম্বিয়া কতটুকু এগিয়ে দেয়?	
৯. মন্তু শেখের নেশা কী?	
১০. গাঁয়ের সেরা পুঁথি পড়ুয়া কে?	

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. কাঁঠাল গাছের -------- ঘাটের এক কোনে এসে নীরবে বসল টুনি।
২. পা জোড়া পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে এক মনে -------- হঠাৎ তার নজরে এল মন্তুর পিঠের ওপর একটা --------।
৩. মনে মনে বুড়োকে -------- অভিশাপ দিল।
৪. -------- মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে।
৫. দেউড়ির সামনে বাঁশের ওপরে ঝুলিয়ে রাখা -------- থেকে একটা গানের কলি গুনগুন করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এল --------।

সত্য মিথ্যা নির্ণয়

১. মন্তুর বাড়ি থেকে মাঝি বাড়ি বেশ দূরে।
২. দূরের গঞ্জ থেকে নৌকায় করে মন্তু যাত্রী বা মাল নিয়ে ফেরে।
৩. করিম শেষের জ্বর শুনে মন্তু তার সঙ্গে দেখা করে নি।
৪. মন্তু নৌকায় কাজ করতে চাওয়ায় করিম খুশি হয়।
৫. মন্তু বাড়িতে থাকতেই আম্বিয়া হালকা সাজগোজ করে।
৬. নন্তু শেখের বাড়ি থেকে মন্তু রাতে খেয়ে এসেছিল।
৭. বুড়ো মকবুল সুরত আলীর পুঁথি পাঠে বিরক্ত হয়।
৮. আম্বিয়ার গানের গলা বড় সুন্দর।
৯. কোথাও কেটে গেলে কচু পাতার ক্ষীরকে গ্রামে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মন্তু সাধারণত যে ধরনের কাজ করে তার বর্ণনা দিন।
২. গ্রামবাংলার জীবনের সঙ্গে পুঁথি পাঠ কীভাবে জড়িয়ে আছে তা বিবৃত করুন।
৩. কমলার পুঁথির কাহিনীটি বর্ণনা করুন।
৪. আপনি জানেন এমন কোন পুঁথির কাহিনী বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

সক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. গতরাতে বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে মন্তুর সঙ্গে সে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তাই ঘুমাতে দেরি হয়েছে - স্বাভাবিকভাবে ঘুম থেকে উঠতেও দেরি হয়েছে।
২. সগন শেখের পুকুর পাড়ে একটা বুনো লতা লেগে মন্তুর পিঠ কেটে গিয়ে ঐ দাগ তৈরি হয়েছিল।
৩. মন্তুর নিজের কোন জমিজমা নেই।
৪. করিম শেখের সঙ্গে নৌকা নিয়ে মন্তু দূর দূরান্তের বিভিন্ন গঞ্জে যায়।
৫. নৌকা চালালে আয় ক্ষেতে কাজ করার চেয়ে বেশি হয়।
৬. গ্রামের মধ্যে মিয়া বাড়িতেই মসজিদ আছে।
৭. কমির শেখের ক'দিন থেকে বেশ জ্বর।
৮. পিদিম হাতে আম্বিয়া মন্তুকে দেউড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।
৯. সাত গ্রামের মরা মানুষকে করব দেয়া হচ্ছে নন্তু শেখের নেশা। গত ত্রিশ বছর এ-গ্রামের বা আশেপাশের গ্রামে যত লোক মারা গেছে তাদের সকলের কবর খুঁড়ছে নন্তু শেখ। এটা তার পেশা নয়, নেশা।
১০. গাঁয়ের সেরা পুঁথি পড়ুয়া হচ্ছে সুরত আলী।

শূন্যস্থান পুরণ

১. গুঁড়ি দিয়ে বানানো

২. দাঁতন করতে করতে; লম্বা কাঁটা দাগ
৩. এক হাজার একশো
৪. মিয়া-বাড়ির
৫. সুপুরি পাতার ঝালরের আড়াল; আম্বিয়া।

সত্য মিথ্যা নির্ণয়

১. মিথ্যা ২. সত্য ৩. মিথ্যা ৪. সত্য ৫. সত্য ৬. মিথ্যা ৭. মিথ্যা ৮. সত্য ৯. সত্য

রচনামূলক প্রশ্ন উত্তর

প্রশ্ন ১ : মন্তু সাধারণত যে ধরনের কাজ করে তার বর্ণনা দিন।

উত্তর : মন্তুর নিজের কোন জমিজমা নেই। অন্যের জমিতে খেটে রোজগার করে। লাঙল চষে, ধান বোনে, ধান পাকলে জমি থেকে কেটে এনে মাড়াই করে তুলে দেয় মালিকের ঘরে। ধানের মওসুম শেষ হয়ে গেলে কলাই, মুগ, তিল বা সরিষার ক্ষেতে কাজ করে। ক্ষেতের কাজ না থাকলে এ-বাড়ি ও বাড়িতে লাকড়ি কাঁটার চুক্তি নেয়। পাঁচ মন লাকড়ি কাঁলে বিনিময়ে মন্তু পায় এক টাকা। কোন কোন দিন মন্তু আঁট-নয় মন লাকড়ি কেটে ফেলে। গ্রামের এ-ধরনের কোন কাজই যখন না থাকে তখন মন্তু করিম শেখের সঙ্গে নৌকা বায়। নৌকায় পাল তুলে চলে যায় দূর দূরান্তের গঞ্জে। আবার গঞ্জ থেকে ফিরে আসে মাল কিংবা যাত্রী বোঝাই করে। ক্ষেতে কাজ করার চেয়ে নৌকায় কাজ করলে অবশ্য আয় রোজগার বেশি হয়।

প্রশ্ন ২ : গ্রামবাংলার জীবনের সঙ্গে পুঁথি পাঠ কীভাবে জড়িয়ে আছে তা বিকৃত করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামের ছবিই কমবেশি এক। সেখানে মানুষের জীবনে তেমন কোন উত্তেজনা নেই, পরিবর্তন নেই, বলতে গেলে কোন আনন্দ-উচ্ছ্বাসও নেই। হাজার বছর ধরে তারা বংশ পরম্পরায় একই ধরনের কাজ করে, একই পেশায় নিয়োজিত থাকে। সেই পরিবর্তনশীল আনন্দহীন জীবনে পুঁথি পাঠ খানিকটা হলেও আনন্দের সঞ্চার করে। সারা দিনের কর্মক্লান্ত মানুষের কাছে পুঁথি শোনা ছাড়া আর কোন আনন্দের উপকরণ নেই। তাই সন্ধ্যার পর আকাশ ভাসিয়ে যখন জোছনার বান ডাকে তখন গ্রামের কর্মক্লান্ত মানুষেরা ওঠোনে গোল হয়ে বসে পুঁথি পাঠ শোনে।

মূলত পুঁথির মধ্যে এক ধরনের অসম্ভব জগতের কথা আছে। যে জগতের সঙ্গে সাধারণ মানুষেরা তাদের কল্পনার জগতকে মিলিয়ে নেয়। আর এক সময় ঐ অতিপ্রাকৃত কল্পলোককেই তারা সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এক সময় দেখা যায় তাদের সকল কাজের মধ্যে জড়িয়ে থাকে পুঁথির জগতের সত্য। যেন তাদের পূর্বপুরুষের কথা এসব- আজও যখন কেউ সুর করে সে পুঁথি পাঠ করে তারা তাই পুঁথির চরিত্রগুলোর দুঃখে দুঃখিত, তাদের আনন্দে আনন্দিত হয়। গ্রামবাংলার মানুষের সঙ্গে তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে পুঁথির জগত।

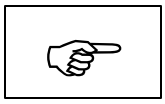

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ৬

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- আবুলের বৌ হালিমা কেন আত্মহত্যা করতে পারলো না তা বলতে পারবেন
- ভূতে ধরা সংক্রান্ত একটি লোক বিশ্বাসের বর্ণনা দিতে পারবেন।

পুকুর ঘাঁ থেকে ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মন্তু। ছোঁ পুকুরের পূর্ব পাড় থেকে কে যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাড়ের দিকে। আবছা আলোতে সব কিছু স্পষ্ট না দেখলেও মেয়েটিকে চিনতে ভুল হলো না মন্তুর। আবুলের বউ হালিমা। এতেঠ রাতে একা একা কোথায় যাচ্ছে সে। পশ্চিম পাড়ের লম্বা পেয়ারা গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা।

চারপাশে বার কয়েক ফিরে তাকাল সে। ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মন্তু। হাত-পাগুলো কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ওর।
পরনের কাপড়টার একটা প্রান্ত পেয়ারা গাছের মোঁটা ডালটার সঙ্গে বাঁধল হালিমা। আরেকটা প্রান্ত নিজের গলার সঙ্গে পেঁচিয়ে কি যেন পরখ করল সে।
মন্তুর আর বুঝতে বাকি রইল না, গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে চায় হালিমা-
এ দুনিয়াঁটা বোধ হয় অসহ্য হয়ে ওঠেছে ওর কাছে। তাই আর বাঁচতে চায় না ও।
মন্তু এ মুহূর্তে কি করবে ভেবে উঠতে পারছিল না।
হঠাৎ ওকে অবাক করে দিয়ে গলার ফাঁসটা খুলে ফেলে আপন মনে কেঁদে উঠল হালিমা। পেয়ারা গাছটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল সে।
হয়তো, বাবা-মার কথা মনে পড়েছে ওর। কিম্বা, দুনিয়াঁটা অতি নির্মম হলেও ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না হয়ত।
এর মধ্যে বার চারেক গলায় ফাঁস পরেছে আর খুলেছে হালিমা। ওর অবস্থা দেখে অতি দুঃখে হাসি পেলো মন্তুর। ধীরে ধীরে ওর খুব কাছে এগিয়ে গেল সে। তারপর অকস্মাৎ ওর একখানা হাত চেপে ধরল মন্তু।
একটা করুণ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে ঘুরে দাঁড়াল হালিমা। বড় বিষণ্ন চাহনি ওর। অনেকক্ষণ কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইল দুইজন। ঈষৎ চাঁদের আলোয় মন্তু দেখল, হালিমার নাক আর চোখ দুটো অসম্ভব রকম ফুলে গেছে। এতেঠ মার মেরেছে ওকে আবুল। মন্তু শিউরে উঠল। তারপর কি বলতে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ এক ঝটকায় ওর মুঠো থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে একটা চাপা কান্নার সঙ্গে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল হালিমা। বোবা দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইল মন্তু।
পুকুর পাড় থেকে ফিরে এসে ওঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সে। চেয়ে দেখে, ঘরের দাওয়ায় বসে পুঁথির কথাগুলো গুনগুন করছে টুনি।

দাওয়া থেকে নেমে এসে টুনি শুধাল, কোথায় গেছলা মিয়া। তোমারে আমি খুঁইজা মরি।
শোবার ঘর থেকে মকবুল আর আমেনার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। রশীদ আর সালেহাও কি নিয়ে যেন আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে।
সুরত আলীর ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।
আবুল আর হালিমার ঘরেও কোন বাতি নেই।
মন্তু সহসা টুনির কথার কোন জবাব দিল না।
টুনি আরো কাছে এগিয়ে এসে বলল, এহনি ঘুমাইবা বুঝি?
মন্তু বলল, হুঁ শরীরটা আইজ ভাল নাই।
ক্যান, কি অইছে? টুনির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা। জ্বর হয় নাই তো?
মন্তু বলল, না এমনি খারাপ লাগতাছে।
টুনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে করে বলল, আইজ শাপলা তুলতে যাইবা না?
মন্তু বলল, আইজ থাক, কালকা যামু।
টুনি কি যেন ভাবল। ভেবে বলল, পরশু দিনকা আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু।
তাই নাহি?
হুঁ। বাপজানের অসুখ, তাই।
অসুখের কথা কার কাছ থাইকা শুনলা? ওর মুখের দিকে তাকাল মন্তু।
টুনি আস্তে করে বলল, বাপজানে লোক পাঠাইছিল।
অ। ওঠোনের মাঝখানে দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। একটু পরে মন্তু নীরবতা ভাঙল, পরশু থাইকা আমিও নাও বাইতে যাইতেছি।
কোনহানে যাইবা? টুনি সোৎসাহে তাকাল ওর দিকে।
মন্তু বলল, কোনহানে যাই ঠিক নাই। করিম শেখের নাও। সে যেইহানে নিয়া যায় সেইহানেই যামু।
টুনি বলল, তোমার নায়ে আমারে বাপের বাড়ি পৌঁছায়া দিবা? বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল টুনি।
সহসা কোন জবাব দিতে পারে না মন্তু। তারপর ইতস্তত করে বলে, অনেক রাত অইছে এইবার ঘুমাও গিয়া বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় মন্তু।
পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল মন্তুর।

বাইরের ওঠোনে তখন কি একটা বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বাধিয়েছে আমেনা আর সালেহা। অকথ্য ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি দিচ্ছে ওরা। গনু মোল্লার ঘরের সামনে একটা বড় রকমের ভিড়।
গ্রামের অনেক ছেলে বুড়ো এসে জমায়েত হয়েছে সেখানে। ব্যাপারটা কি প্রথমে বুঝতে পাল না মন্তু। পরে বুড়ো মকবুলের মেয়ে হিরনের কাছ থেকে শুনল সব।
মজু ব্যাপারির মেজ মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে। ভূত তাড়াবার জন্য ওকে গনু মোল্লার কাছে নিয়ে এসেছে সবাই। ব্যাপারির ছোঁ ভাইকে সামনে পেয়ে মন্তু শুধাল, কি মিয়া ভূতে পাইল কহন অ্যাঁ?
ব্যাপারির ভাই আদ্যোপান্ত জানাল সব।
কাল ভোর সকালে পরীর দিঘির পাড়ে শুকনো ডাল পাতা কুড়োতে গিয়েছিল মেয়েটা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল মেয়ে আর ফিরে না। ওদিকে মেয়ের মা তো ভেবেই আকুল। বয়স্কা মেয়ে কে জানে আবার কোন বিপদে পড়ল। প্রথমে ওকে দেখল কাজি বাড়ির থুরথুরে বুড়িটা। লম্বা তেঁতুল গাছের মগডালে ওঠে দুপা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে টেনে টেনে দিব্যি গান গাইছে মেয়েটা। বুড়ি তো অবাক, বলি লজ্জা শরমের কি মাথা খাইছ? দিন দুপুরে গাছে নাহি উইঠা গীত গাইবার লাগছ। ও মাইয়্যা, বলি লজ্জা শরম কি সব উইঠা গেছে দুনিয়ার ওপর থ্যাইকা?

বুড়ি যত চিৎকার করে মরে, মেয়ে তত শব্দ করে হাসে। সে এক অদ্ভুত হাসি। যেন ফুরোতেই চায় না। খবর শুনে মজু ব্যাপারি নিজে ছুটে এলো দিঘির পাড়ে। নিচে থেকে মেয়ের নাম ধরে বারবার ডাকল সে। সখিনা, মা আমার নাক-কান কাটিছ না মা, নাইম্যা আয়।
বাবাকে দেখে ওর গায়ের ওপর থুথু ছিটিয়ে দিল সখিনা। তারপর খিলখিল শব্দে হেসে ওঠে বলল, আর যামু না আমি। এইহানে থাকুম।
ওমা কয় কি। মাইয়্যা আমার এই কি কথা কয়? মেয়ের কথা শুনে চোখ উল্টে গেল মজু ব্যাপারির।
থুরথুরে বুড়ি এতেঠক্ষণ চুপ করে ছিল। সহসা বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়ল সে, লক্ষণ বড় ভালো না ব্যাপারি। মাইয়্যারে তোমার ভূতে পাইছে।
খবরদার বুড়ি বাজে কথা কইস না। ওপর থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল সখিনা। বেশি বক বক করলে ঘাড় মটকাইয়া দিমু।
এ কথার পরে কারো সন্দেহের আর অবকাশ রইল না।
বুড়ি বলল, এ বড় ভালো লক্ষণ নয়, জলদি কইরা লোকজন ডাহ।
লোকজন ডাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ হাঁক-ডাক শুনে ততক্ষণে গ্রামের অনেক লোক এসে জড়ো হয়ে গেছে সেখানে। বুড়ো ছমির মিয়া বলল, দাঁড়ায়া তামাশা খেতাছ ক্যান মিয়ারা, একজন উইঠ্যা যাও না ওপরে। কে উঠবে, কে উঠবে না তাই নিয়ে বচসা হল কিছুক্ষণ। কারণ, যে কেউ তো আর উঠতে পারে না। এমন একজনকে ওপরে উঠতে হবে, মেয়ের গায়ে হাত ছোঁয়াবার অধিকার আছে যার। অবশেষে ঠিক হল তকু ব্যাপারিই উঠবে ওপরে। মেয়ের আপন চাচা হয় সে। সতরাং অধিকারের প্রশ্ন আসে না।
তকু ব্যাপারিকে ওপরে উঠতে দেখে ক্ষেপে গেল সখিনা। চিৎকার করে ওকে শাসাতে লাগল সে, খবরদার খবরদার ব্যাপারি, জানে খতম কইরা দিমু। বলে ছোঁ ছোঁ ডাল পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওর ঘাড়ের ওপরে ছুঁড়ে মারতে লাগল সে। তারপর অকস্মাৎ এক লাফে দিঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা। অনেক কষ্টে দিঘির পানি থেকে পাড়ে তুলে আনা হল তাকে।
কলসি কলসি পানি ঢালা হল মাথার ওপর। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এল সখিনার তখন সে একেবারে চুপ হয়ে গেছে। তারপর থেকে একটা কথাও বলে নি সখিনা। একটা প্রশ্নেরও জবাব দেয় নি সে। তাই আজ সকালে গনু মোল্লার কাছে নিয়ে এসেছে ওকে যদি ভূতটাকে কোন মতে তাড়ানো যায়। নইলে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হবে। ব্যাপারির ভাইয়ের কাছ থেকে সব কিছু শুনল মন্তু। গনু মোল্লার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা সাদা কাপড়কে সরষের তেলের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে তার মধ্যে আগুন ধরিয়ে সেই কাপড়টাকে সখিনার নাকের ওপর গনু মোল্লা ধরেছে আর চিৎকার করে বলছে, কোনহান থাইকা আইছস শিগ্‌গির কইরা ক, নইলে কিন্তুক ছাড়মু না আমি। ক শিগ্‌গির। সখিনা নীরব।
তার ঘাড়ের ওপর চেপে থাকা ভূতটা কোন কথাই বলছে না।
মন্তু আর দাঁড়াল না সেখানে। ঘরের পেছন থেকে একটা নিমের ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করতে করতে পুকুর ঘাটে চলে গেল সে। পুকুর পাড়ের পেয়ারা গাছের নিচে লাউ গাছগুলোর জন্য একটা মাচা বাঁধছে হালিমা। এখন দেখলে কে বলবে যে ওই মেয়েটাএই গতকাল রাতে ওই পেয়ারা গাছটার ডালে গলায় কাপড় বেঁধে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। ওর দিকে চোখ পড়তে, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার মাচা বাঁধতে লাগল হালিমা।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রান্ত – সীমা, কিনারা, একপাশ। অকস্মাৎ – হঠাৎ, সহসা, অতর্কিতভাবে। বিষণ্ন – দুঃখিত, ম্লান। **শুধাল** – জিজ্ঞেস করল, জানতে চাইল। **উৎকণ্ঠা** – ব্যাকুলতা, চিন্তা, ভাবনা। **ইতস্তত** – সঙ্কোচ, দ্বিধা। **আদ্যোপান্ত** – আগাগোড়া, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। **সহসা** – হঠাৎ, অকস্মাৎ। বিজ্ঞের মতো – পণ্ডিতের মতো, জ্ঞানীর মতো। **শাসাতে লাগল** – সাবধান করতে লাগল।

বস্তুসংক্ষেপ

চাঁদের আলোয় মাখানো ওঠোনে সবাই যখন সুরত আলীর পুঁথি পাঠে মগ্ন তখন আবুলের বউ হালিমা সবার অগোচরে পুকুর পাড়ে চলে যায়। তার উদ্দেশ্য আত্মহত্যা করা। আবুল তাকে আজ সকালে যারপর নেই মেরেছে। পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসবার সময় মন্তু দেখতে পায় আবুলের বউ পুকুর পারের পেয়ারা গাছে তার পরনের শাড়ির এক কোণা শক্ত করে বাঁধে। মন্তু ঠিক বুঝতে পারে না তার কী করা উচিত। কিন্তু এক মুহূর্ত পরই গাছে বাঁধা শাড়ির কোন খুলে নিয়ে পেয়ারা গাছটাকে জড়িয়ে ধরে হালিমা আপন মনে কেঁদে ওঠে। এ-অবস্থায় মন্তু তার দিকে এগিয়ে যায়; পরম মমতোটায় তার একটা হাত ধরে। জোছনার আলোয় দেখতে পায় মার খাওয়া হালিমার চোখ নাক ফুলে আছে।

পুকুর ঘাঁ থেকে ফিরে মন্তুর সঙ্গে দেখা হয় টুনির সঙ্গে। রাতে শাপলা তুলতে যাবার কথা বলে সে। কিন্তু জানায় তার শরীর ভাল নেই। তারপর টুনি তার বাবার অসুস্থতার খবর মন্তুকে দিয়ে বলে আগামী পরশু সে বাপের বাড়ি চলে যাবে। মন্তুও জানায় পরশু থেকেই সে করিম শেখের নৌকা চালাতে চলে যাবে।

পরদিন সকালে দেরি করে ঘুম ভাঙে মন্তুর। ওঠোনে একটা বড় রকমের জটলা দেখতে পায়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে মজু ব্যাপারির মেজ মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে তাই ভূত ছাড়ানোর জন্যে গনু মোল্লার কাছে তাকে নিয়ে এসেছে। গনু মোল্লা একটা সাদা কাপড়কে সরষে তেলের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে কাপড়টাকে সখিনার নাকের কাছে ধরে ভূত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। মন্তু সেখানে অন্য সবার মতো উৎসাহী হয়ে দাঁড়াল না বরং একটা নিমের ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে পুকুর পাড়ের দিকে চলে গেল। পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখলো হালিমা গত রাতে যে পেয়ারা গাছে শাড়ি জড়িয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল সে আজ নিচে লাউ গাছের জন্য একটা মাচা বাঁধছে। কে বলবে গত রাতে এই হালিমাই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সনাক্তকরণ

১. পরনের কাপড়টার একটা প্রান্ত পেয়ারা গাছের	১. চমকে ওঠে ঘুরে দাঁড়াল হালিমা
২. পেয়ারা গাছটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে	২. আর যামু না আমি।
৩. একটা করুণ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে	৩. মোঁটা ডালটার সঙ্গে বাঁধল হালিমা
৪. তারপর খিলখিল শব্দে হেসে ওঠে বলল	৪. কি মিয়া ভূতে পাইল কহন অ্যাঁ?
৫. তকু ব্যাপারিকে ওপরে উঠতে দেখে	৫. অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল সে।
৬. ব্যাপারির ছোঁ ভাইকে সামনে পেয়ে মন্তু শুধাল	৬. নইলে কিন্তু ছাড়মু না আমি
৭. কোনহান থাইকা আইছস শিগ্‌গির ক	৭. ক্ষেপে গেল সখিনা।

ব্যাখ্যা লিখুন

১. এ দুনিয়াঁটা বোধ হয় অসহ্য হয়ে ওঠেছে ওর কাছে।

২. এখন দেখলে কে বলবে যে ওই মেয়েটা এই গতকাল রাতে এই পেয়ারা গাছটার ডালে গলায় কাপড় বেঁধে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. হালিমা মোঁ কতবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছে?	১.
২. হালিমার অবস্থা দেখে দুঃখের মধ্যেও মন্তুর হাসি পায় কেন?	২.
৩. চাঁদের আলোয় মন্তু হালিমার চোখে-মুখে কী দেখেছিল?	৩.
৪. টুনি কেন তার বাবার বাড়িতে যাবে?	৪.
৫. মন্তু কার সঙ্গে নৌকা বাইতে যাবে?	৫.
৬. 'তোমার নায়ে আমারে বাপের বাড়ি পৌঁছায়া দিবা?- কে কাকে অনুরোধ করে বলেছিল?	৬.
৭. মন্তু যে নৌকা চালাতে যাচ্ছিল তার মালিক কে?	৭.
৮. মজু ব্যাপারির কোন মেয়েকে ভূতে পেয়েছে?	৮.
৯. পরীর দিঘির পারে মজু ব্যাপারির মেয়েকে প্রথম কে দেখতে পায়?	৯.
১০. মন্তু কী দিয়ে দাঁতের মাজন করে?	১০.

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. টুনির বাবা যে অসুস্থ এ-খবর টুনি পেয়েছিল কীভাবে?
ক. চিঠির মাধ্যমে খ. মকবুল বলেছিল
গ. মন্তু খবর নিয়ে এসেছিল ঘ. টুনির বাবা খবর দিয়ে লোক পাঠিয়েছিল

২. গনু মোল্লার ঘরের সামনে ভিড় ছিল কেন?
ক. আমেনা, সালেহার ঝগড়ার জন্যে খ. সবাই গনু মোল্লার দোয়া চায়
গ. ভূতগ্রস্ত মজু ব্যাপারির মেয়েকে দেখার জন্যে ঘ. অসুস্থ মকবুলকে দেখার জন্যে

৩. 'কোথায় গিছলা মিয়া। তোমারে আমি খুঁইজা মরি' - কে কাকে বলেছিল?
ক. হালিমা আবুলকে খ. আমেনা মকবুলকে
গ. টুনি মন্তুকে ঘ. হিরণ মকবুলকে

৪. মজু ব্যাপারির ভূতগ্রস্ত মেয়েটা গাছ থেকে কোথায় লাফিয়ে পড়ে?
ক. বাদা বনে গ. লোকজনের মধ্যে
গ. গাছের তলায় ঘ. দিঘির জলে

৫. মন্তু ভূতে পাবার ঘটনা কার কাছ থেকে শোনে?
ক. গনু মোল্লার কাছ থকে খ. টুনির কাছ থেকে
গ. মজু ব্যাপারির ভাইয়ের কাছ থেকে ঘ. মকবুলের কাছ থেকে

রচনামূলক প্রশ্ন

১. হালিমার আত্মহত্যা করতে না পারার কারণ কী? ব্যাখ্যা করুন।
২. মজু ব্যাপারির মেজ মেয়ের ভূতে ধরার বিষয়টি বর্ণনা করুন।
৩. ভূতে ধরার ব্যাপারটি আপনি বিশ্বাস করেন কি? এ- ব্যাপারে আপনার মতোটামতো কী?

উত্তরমালা

সনাক্তরণ

১. মোঁটা ডালটার সঙ্গে বাঁধল হালিমা।

২. অনেকক্ষণ ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল সে।
৩. চমকে ওঠে ঘুরে দাঁড়াল হালিমা।
৪. আর যামু না আমি।
৫. ক্ষেপে গেল সখিনা।
৬. কি মিয়া ভূতে পাইল কহন, অ্যাঁ?
৭. নইলে কিন্তুক ছাড়মু না আমি।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. এ দুনিয়াঁটা বোধ হয় অসহ্য হয়ে ওঠেছে ওর কাছে।

উত্তর : আলোচ্য অংশটুকু শক্তিমান কথাশিল্পী জহির রায়হান রচিত গ্রামবাংলার অকৃত্রিম জীবনের ছবি সম্বলিত উপন্যাস 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে।
এখানে লেখক আবুলের নির্যাতিত, অত্যাচারিত স্ত্রী হালিমার জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে।
আবুলের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হালিমা। এর আগের দুটো বউকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে আবুল। দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাবার পর নিজের আচরণে লজ্জিত হয়েছিল আবুল। মৃত স্ত্রীর কবরের পাশে শুয়ে থেকেছে তিনদিন তিন রাত- এক ফোঁটা দানাপানিও সে তখন স্পর্শ করে নি। সবাই ভেবেছিল আবুলের চরিত্রের বুঝি পরিবর্তন হল। কিন্তু তৃতীয় স্ত্রী হালিমাকেও যখন আবুল একই রকমভাবে কারণে অকারণে, প্রত্যেক প্রহরে মারধোর করতে শুরু করে তখন বাড়ির সবাই তার প্রতি বিরক্ত হয়; বুঝতে পারে বউ মেরে আবুল পৈশাচিক আনন্দ পায় সুতরাং তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা বৃথা। এই দুঃখময় ব্যক্তিগত জীবন থেকে বাঁচার জন্যে হালিমা আত্মহত্যার পরিকল্পনা করে। পেয়ারা গাছের মোঁটা ডালটার সঙ্গে শাড়ির এক প্রান্ত বেঁধে গলায় পরবার আগেই আবার সে ডাল থেকে খুলে নেয় শাড়ির প্রান্ত। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বোধ করি হালিমার মনে পড়ে যায় তার বাবা মায়ের কথা। হয়তো নির্মম এ পৃথিবীটাকে মুহূর্তেই তার কাছে সুন্দর মনে হয়- ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। আসলে জীবনের নিয়মই বুঝি এমন অসহ্য, নিষ্ঠুর, বহনের অযোগ্য মনে হলেও তাকে নিজের হাতে শেষ করে দেয়া সবচে কঠিন। হালিমার আচরণ পাঠকের সামনে সে সত্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. এর মধ্যে হালিমা মোঁ বার চারেক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।
২. বার বার আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় বলে দুঃখের মধ্যেও মন্তুর হাসি পায়।
৩. চাঁদের আলোয় মন্তু দেখতে পায় হালিমার নাক মুখ চোখ অসম্ভব রকম ফুলে ওঠেছে। এ-সবই হালিমার প্রতি আবুলের পৈশাচিক নির্যাতনের চিহ্ন।
৪. টুনির বাবা অসুস্থ, তাকে দেখবার জন্য টুনি বাবার বাড়ি যাবে।
৫. মন্তু করিম সেখের সঙ্গে নৌকা বাইতে যাবে।
৬. টুনি মন্তুকে অনুরোধ করে বলেছিল একথা।
৭. মন্তু যে নৌকা চালাতে যাচ্ছিল তার মালিক করিম শেখ।
৮. মজু ব্যাপারির মেঝ মেয়েকে ভূতে পেয়েছে।
৯. ভূতগ্রস্ত মজু ব্যাপারির মেয়েকে প্রথম দেখতে পায় কাজি বাড়ির থুর থুরে বুড়িটা
১০. নিমের ডাল দিয়ে দাঁতের মাজন করে।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ঘ ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. গ

রচনামূলক

প্রশ্ন : হালিমার আত্মহত্যা করতে না পারার কারণ কী? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : হালিমা আবুলের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। বুড়ো মকবুলের বাড়িতে বউ পেটানোর ব্যাপারে আবুলের কোন জুড়ি নেই। এর আগে দুটো বউকে সে পিটিয়েই মেরে ফেলেছে। মার খেতে খেতে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেছে হালিমার। কারণে

অকারণে, অমূলক সন্দেহের কারণে এভাবে মার খেয়ে পৃথিবীর প্রতি হালিমার ধারণাই বদলে গেছে। এই সুন্দর পৃথিবী, এই অমূল্য জীবন কিছুই আর তার তাকে আকর্ষণ করে না। তাই সে মৃত্যুর ভয়াল, কঠিন পথকেই সে বেছে নিতে যায়। আত্মহত্যার সব প্রস্তুতি শেষ করে শেষ মুহূর্তে সে আবার পিছিয়ে আসে। হঠাৎই তার কাছে আত্মহত্যা এক কঠিনতম কাজ বলে মনে হয়। হয়তো আত্ম-হত্যার ঐ পূর্ব মুহূর্তেই তার মনে পড়ে যায় জন্মদাতা মা-বাবার কথা। যাদের স্নেহে ভালবাসায় সে বড় হয়েছে। হয়তো এই নিষ্ঠুর পৃথিবীকে তার কাছে অতটা নিষ্ঠুর মনে হয় না। সে ভুলে যায় তার প্রতি আবুলের নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং পৈশাচিক অত্যাচারের কথা। হঠাৎই সে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনকে ভালবেসে ফেলে। আর তাই পেয়ারা গাছের ডালে বাঁধা শাড়ির আঁচল খুলে নিয়ে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। যেন ঐ কান্নার মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি জমে ওঠা সকল ক্ষোভকে ভুলে যায়। ভুলে যায় অপমান, অত্যাচার, নির্যাতনের কথা। মুখ ফিরিয়ে নেয় মৃত্যুর দিক থেকে জীবনের দিকে।

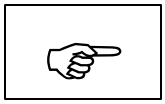

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ৭

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- নৌকার মাঝি হিসেবে মন্তুর জীবনের কথা বলতে পারবেন;
- শিকদার বাড়ির লোকেদের মানসিকতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মন্তুর বিয়ের প্রসঙ্গে তার মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হীরনের বিয়ের প্রসঙ্গটির বর্ণনা দিতে পারবেন।

নৌকাঁটা ঘাটে বেঁধে রেখে একগাদা কাদা ডিঙিয়ে পাড়ে ওঠে আসে ওরা। মন্তু আর করিম শেখ। হাটের এক কোণে মনোয়ার হাজির চায়ের দোকানে বসে গরম দুকাপ চা খায়।

হাটের নাম শান্তির হাঁ। কিন্তু সারাদিন অশান্তিই লেগে থাকে এখানে। দূর দূর বহুদূর গ্রাম থেকে লোক আসে। সওদা করতে। খুচরো জিনিসপত্রের চেয়ে পাইকারি জিনিসপত্রের বিক্রি অনেক বেশি। এখান থেকে মালপত্র কিনে নিয়ে গ্রামে গ্রামে আর ছোঁ ছোঁ হাঁ বাজারের দোকানিরা দোকান চালায়।

মাঝে মাঝে দুএকটা সার্কাস পার্টিও আসে এখানে। তখন সমস্ত পরগনায় সাড়া পড়ে যায়। দলে দলে ছেলে বুড়ো মেয়ে এসে জড়ো হয় এখানে। দোকানিদেরও তখন খুশির অন্ত থাকে না। জোর বিক্রি চলে। নদী পাড়ের ভরাঁ জায়গাঁটায় কয়েকটা দোচালা ঘর তুলে নিয়ে সেখানে হোটেল খোলে কেউ। ভিড় লেগেই থাকে। মনোয়ার হাজির সঙ্গে করিম শেখের অনেক দিনের খাতির। এহাটে এলে একমাত্র হাজির দোকানেই চা খায় করিম। হাজিও বাইরের কোথাও যেতে হলে করিম শেখের নাও ছাড়া অন্য কারো নৌকায় যায় না। চায়ের পয়সা দিতে এলে হাজি একমুখ হেসে শুধাল, কি মেয়া খবর সব ভাল তো?

করিম শেখ বিরক্তির সঙ্গে বলল, আর খবর, হাঁপানি হয়া মরতাছি।

আহা, ওইডা আবার কখন থাইকা হইল? হাজির কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর। তা মেয়া হাঁপানি নিয়া না বাইরলে পারতা।

কি আর কইমু ভাই। পেট তো চলে না। করিম শেখ আস্তে করে বলল, পেট তো ঠাণ্ডা গরম কিছু মানে না।

মন্তুকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে করিম।

কিছুক্ষণ হাটের মধ্যে ঘোরাফেরা করে ওরা।

তারপর আবার নৌকায়।

যাত্রী নিয়ে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় ওদের। করিম শেখ হাল ধরে বসে থাকে। মন্তু দাড় বায়। আকাশটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে লুকিয়ে রয়েছে দুপাশের গ্রামগুলো। মাঝে মাঝে দুএকটা মিটমিটে বাতি দেখে বোঝা যায় গেরস্থদের বাড়ি গেল একটা। কিম্বা হঠাৎ কোথাও একসার বাতি দুলতে দুলতে এগিয়ে যেতে দেখলে চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায় হাঁ থেকে ফিরছে ওরা, হাঁরের দল।

মাঝে মাঝে দুএকটা শিয়াল আর অনেকগুলো কুকুরের দলবাঁধা ডাক শোনা যায়। আর উজান নদীর একটানা কলকল শব্দ।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরে মন্তু।

গানের সুর বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। করিম শেখ হুঁকোঁটা এগিয়ে দেয় ওর দিকে, নাও মিয়া তামুক খাও হাত বাড়িয়ে হুঁকোঁটা নেয় মন্তু। গুড়ুক গুড়ুক টান মারে হাঁকোতে।

তারপর আবার গান ধরে, আশা ছিল মনে মনে।

গান শুনে করিম শেখের মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে এসে মন্তু দেখল বুড়ো মকবুলের ঘরের সামনে একটা ছোঁটখাঁট জটলা বসেছে। বাড়ির সবার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করছে মকবুল। বাড়ির সবার চেয়ে বড় সে। গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সকলকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করে না বুড়ো। অন্য সবার বেলাও তাই। মকবুলকে জিজ্ঞেস না করে বাড়ির কেউ কোনদিন কোন কাজ কারবার করে না। সুরত আলীর সঙ্গে হয়তো রশীদের মনোমালিন্য আছে। আবুলকে হয়তো মকবুল দুচোখে দেখতে পারে না। গনু মোল্লাকে হয়তো দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার অভিশাপ দেয় ফকিরের মা। কিন্তু, বাড়ির মান সম্মান জড়িয়ে আছে এমন কোন কাজের বেলা কারো সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। তখন সবাই এক। একসঙ্গে বসে পরামর্শ করবে ওরা। মন্তুকে আসতে দেখে ওর দিকে একখানা পিঁড়ি বাড়িয়ে দিল সালেহা, বহ মন্তু মিয়া বহ।

আলোচনার ধারটা মুহূর্তে বুঝে নিল মন্তু। বুড়ো মকবুলের মেয়ে হীরনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে টুনির বাবার বাড়ির গ্রাম থেকে। আজ সন্ধ্যায় টুনিকে নিয়ে যাবার জন্যে ওর বাবার বাড়ি থেকে লোক এসেছিল। সেই দিয়ে গেছে প্রস্তাবটা। জুলু শেখের বেটা কদম শেখ। হাল গরু জমি সব আছে ওদের। খাস গেরস্থ ঘরের ছেলে। বিয়ে একটা অবশ্য করেছিল একবার। মাস তিনেক হলো বউ মারা গেছে।

আমেনা বলছে, অত চিন্তা কইরা আর কি অইবো; পাকা কথা দিয়া দ্যান। গনু মোল্লা বলল, সব খোদার ইচ্ছা। মাইয়ার কপালে যদি সুখ থাকে তাইলে যেইহানে বিয়া দিবা সেইহানেই সুখে থাকব। বড় বেশি বাছ বিচার কইরো না।

মকবুল সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল, হ্যাঁ, তাতো ঠিক কথা।

হীরনের বিয়ের কথা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল, মাঝখানে রশীদের বউ সালেহা বলে উঠল, আমাগো মন্তু মিয়ারেও এইবার একটা বিয়া করাইয়া দ্যান। এক কোণে নীরবে বসেছিল মন্তু। ওর দিকে তাকিয়ে সকলে সালেহার কথায় একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠল।

বুড়ো মকবুল গম্ভীর গলায় বলল, হ, ঠিক কথা কইছ সালেহা।

ওর লাইগা একটা মাইয়া দেহন লাগে।

আমেনা বলল, ওর তো বাপ-মা কেউ নাই, আপনেরা আছেন দেইখা শুইনা করায়া দেন বিয়াডা।

সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজন মেয়ে নিয়েও আলাপ করল ওরা।

ফাতেমার এক খালাতো বোন আছে। রসুন তার নাম। রসুনের মতো সাদা হলুদে মেশানো গায়ের রঙ। টানা টানা চোখ। বয়স তের চৌদ্দ হবে।

আবুল বলল, ওর মামার এক মেয়ে আছে। দেখতে যেমন হুরপরী। তাই মামা আদর করে পরী বলে ডাকে শুধু স্বভাবটা যেন একটু কেমন কেমন। তাও তেমন কিছু নয়।

খায় একটু বেশি। আর ঘুমোয়। মকবুল পরক্ষণে বলল, ও মাইয়া ঘরে আইনা কাজ নাই মিয়া। আমেনা বলল, অত দূরে দূরে যাইতাছ ক্যান, নিজ গেরামে দেহ না। আমাগো আম্বিয়া কি খারাপ মাইয়া নাহি। ও হইলেই খুব ভালো হয়। দিনরাত গতর খাঁটাবার পারে। মন্তু মিয়ারে সুখে রাখবো। আম্বিয়ার প্রশ্নে কারো কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। ও মেয়ে গতর খাঁটাতে পারে এ কথা সত্যি। কিন্তু ঘরের বউ করে আনার মতো মেয়ে ও নয়।

মকবুল বলল, ওগো বংশে হাঁপানি রোগ আছে। শেষে হাঁপানি হইয়া মন্তুও মরবো।

মন্তু কিন্তু একটা কথাও বলল না। সে চুপ করে বসে রইল এক কোণে।

আলোচনা অসমাপ্ত রেখে সেদিনের মতো ওঠে গেল সবাই।

একটু পরে যে যার ঘরে চলে গেল ওরা।

পিদিম জ্বালিয়ে অবাক হল মন্তু। মাচাঙের ওপর একরাশ শাপলার ফুল ঝুলছে। বকের মতো সাদা ধবধবে পাতার মাঝখানে হলুদ রঙের কুঁড়ি। ডাঁটাসহ ফুলগুলো মাচাঙ থেকে নামিয়ে নিল মন্তু।

আজ সন্ধ্যায় বাপের বাড়ি চলে গেছে টুনি। যাবার আগে এগুলো রেখে গেছে ওর ঘরে। এক টুকরো ম্লান হাসি জেগে উঠল মন্তুর ঠোঁটের কোণে। ফুলগুলো আবার মাচাঙের ওপর তুলে রেখে বিছানাটা নামিয়ে নিল মন্তু।

কিছুদিন ধরে শীত পড়তে শুরু করেছে।

দিনের বেলা ঈষৎ গরম। শেষ রাতে প্রচন্ড শীত, হাড় কাঁপুনি শুরু হয়। কাঁথার নিচেও দেহটা ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। এ সময়ে বাড়ির সবাই মাটির ভাড়ে ভুসির আগুন জ্বেলে মাথার কাছে রাখে। মাঝে মাঝে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আগুনটাকে উস্কে দেয়। আজকাল ভোর হওয়ার অনেক আগে ঘুম থেকে ওঠে যায় মন্তু। সোয়া দুটাকা দিয়ে কেনা খদ্দরের চাদরটা গায়ে মাথায় মুড়িয়ে নিয়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে মাঝি বাড়ির দিকে ছোটে সে। ক'দিন হলো করিম শেখ হাঁপানিতে পড়েছে। সারাদিন খুক খুক করে কাশে আর লম্বা শ্বাস নেয়।

মন্তু বলে, একডা কবিরাজ দেহাও মিয়া।

করিম বলে, কিছু হয় না মিয়া, অনেক দেহাইছি।

আম্বিয়া বলে, হাটে গঞ্জে যাও ভাল দেইখা ডাকতর দেখাইতে পার না?

করিম শেখ চুপ করে থাকে কিছু বলে না। আজ সকালে মাঝি বাড়ির দিকে সবে রওয়ানা দিয়েছে মন্তু। দাওয়া থেকে মকবুল ডেকে বলল, রাইতের বেলা একটু সকাল কইরা ফিরো মন্তু মিয়া। হীরনের বিয়ার ফর্দ হইবো আজই।

বাড়ির সকলকে আজ একটু সকাল সকাল ঘরে ফিরে আসতে বলে দিয়েছে বুড়ো মকবুল। বিদেশ থেকে মেহমানরা আসবে ওদের, খাতির যত্ন করতে হবে। আদর আপ্যায়ন করে খাওয়াতে হবে ওদের। নইলে বাড়ির বদনাম করবে ওরা।

মন্তুর ওপরে আর একটা ভার দিয়েছে মকবুল। নাও নিয়ে গিয়ে টুনিকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।

দুএক দিনের মধ্যে নবীনগরে যাবে মন্তু। করিম শেখের শরীরটা একটু ভালো হয়ে উঠলেই নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে সে। পথের দুপাশের ক্ষেতগুলোতে কলাই, মুগ, মটর আর সরষে লাগানো হয়েছে। সারারাতের কুয়াশায় সকালে সতেজ হয়ে ওঠেছে ওরা। রোদ পড়ে শিশিরের ফোঁটাগুলো চিকচিক করছে ওদের গায়ে।

মাঝি বাড়ির দেউড়ির সামনে আম্বিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মন্তুর। পুকুর থেকে এইমাত্র গোছল করে ফিরছে সে। ঘণ কালো চুলগুলো থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এখনো পানি ঝরছে। হাতের ভেজা শাড়িটার পানি নিংড়াতে নিংড়াতে আম্বিয়া বলল, মন্তু ভাই হুট কইরা চইলা যাইও না। পিঠা বানাইছি খাইয়া যাইও।

মন্তু বলল, এই সকাল বেলা গোছল করছো তোমার শীত লাগে না? আম্বিয়া একটু হাসল শুধু। কিছু বলল না।

সারারাত মিয়া-বাড়িতে ধান ভেনেছে সে। এই শীতের রাতেও ধান ভানতে গিয়ে সারা দেহে ঘাম নেমেছে ওর। পুরো গায়ের কাপড়ে ঘামের বিশ্রী গন্ধ। তাই সকাল সকাল গোসল করে নিয়েছে আম্বিয়া। খেয়ে দেয়ে একটু পরে ঘুম দেবে সে। উঠবে সেই অপরাহ্নে। তারপর আবার মিয়া বাড়ি চলে যাবে আম্বিয়া ধান ভানবে, সারারাত।

মন্তুকে একটা পিঁড়িতে বসতে দিয়ে ওর সামনে এক বাসন পিঠা এগিয়ে দিল আম্বিয়া। কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে করিম শেখ বলল, খাও মিয়া খাও। বলে আবার কাশতে শুরু করল সে। আম্বিয়া তখন পাশের ঘরে গিয়ে একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মাথার চুল ঝাড়ছে। মাঝে মাঝে বুড়ো শেখের সঙ্গে কি যেন কথা বলছে সে। বেড়ার খুপরি দিয়ে ওকে দেখতে লাগল মন্তু। আম্বিয়াকে বিয়ে করবে সে। হোক হাঁপানি। সহসা একটা সিদ্ধান্ত করে বসল সে। করিম শেখ লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল, কি মিয়া হাত তুইলা বইসা রইলা যে? মন্তু তাড়াতাড়ি একটা পিঠা মুখে পুরে দিয়ে বলল, হুঁ হুঁ এইতো খাইতাছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো বাসনটা শূন্য করে দিল মন্তু। কাঁথাঁটা ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে করিম শেখ কাঁপা গলায় বলল, আমার বুঝি দিনকাল শেষ হইয়া আইলো মিয়া, আর বাঁচুম না।

আহা অমন কথা কয় না মিয়া। অমন কথা কয় না। পরক্ষণে ওকে বাধা দিয়ে মন্তু বলল, মরণের কথা চিন্তা কইরতে নাই। আয়ু কইমা যায়।

করিম শেখ তবু বিড়বিড় করে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় শোক প্রকাশ করতে লাগে।

রাতে এল ওরা।

বরের মামা, চাচা আরো দুতিনজন লোক।

হিরনের বিয়ের ফর্দ হবে আজ।

মকবুলের বাইরের ঘরটাতে ফরাস পেতে বসানো হল ওদের।

গনু মোল্লা বসলেন সবার মাঝখানে।

আবুল, রশীদ আর সুরত আলী ওরাও বসল সেখানে। বুড়ো মকবুল প্রথমে আসতে রাজি হয়নি। বলছিল, তোমরা সবাই আছ, ভালো মন্দ যা বুঝ আলাপ কর গিয়ে। আমারে ওর মধ্যে টাইনো না। রশীদ বলল, কি কথা, আপনের মাইয়া আপনে না থাকলে চলব কেমন কইরা?

ঘরের ভেতর থেকে বরের চাচা হাঁক ছাড়ল, কই, বেয়াই কই, তেনারে দেহি না ক্যান?

অবশেষে ঘরে এসে এককোণে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল মকবুল। প্রথমে মেহমানদের ভাত খাওয়ান হবে। তারপরে ফর্দ হবে বিয়ের। মন্তু এতেঠক্ষণ সুযোগ খুঁজছিল কখন বুড়ো মকবুলকে কিছুক্ষণের জন্যে একা পাওয়া যায়। তাহলে নিজের বিয়ের কথাঁটা ওকে বলবে সে। এই শীতে, হ্যাঁ এই শীতেই বিয়ে করে ঘরে বউ আনতে চায় মন্তু। কিন্তু মকবুলকে একা পাওয়া গেল না।

সারা বাড়িতে আজ ভিড়।

রান্না ঘরের ভিড়টা সবচেয়ে বেশি। বাড়ির মেয়ে-পুরুষ, কাচ্চা-বাচ্চা সবাই গিয়ে জুটেছে সেখানে। সারাক্ষণ বকবক করছে। কার কথা কে শুনছে কিছু বোঝা যায় না। হাঁড়িপাতিলগুলো একপাশে টেনে নিয়ে বাসন বাসন ভাত বাড়ছে আমেনা।

হঠাৎ মন্তুকে সামনে পেয়ে আমেনা জিজ্ঞেস করল, মানুষ ক'জন?

মন্তু বলল, আঁজন।

আঁজন! আমেনার মাথায় রীতিমতো বাজ পড়ল। আঁজনের কি ভাত রাঁনছি আমি? আমি তো রাঁনছি চাইরজনের। তোমার ভাইয়ে আমারে চারজনের কথা কইছিল।

বড়ঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে আসছিল মকবুল, কথাঁটা কানে গেল ওর। পরক্ষণে ভিতরে এসে রাগে ফেটে পড়ল সে। আমি কি জাইনতাম, আঁজন আইব ওরা? বারবার কইরা কইয়া দিছি চাইরজনের বেশি আইসেন না আপনেরা। ওরা তহন মাইনা নিছে। আর এহন- বলে ঠোঁটজোড়া বিকৃত করে একটা বিশ্রী মুখভঙ্গি করল মকবুল।

অইছে অইছে। আপনে আর চিল্লায়েন না, থামেন। মেজ বউ ফাতেমা চাপা গলায় বলল, যান যা আছে তা দিয়ে একবার খাওয়ান। আমরা না হয় পরে খামু।

ফাতেমার কথায় শান্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল মকবুল, মন্তুর দিকে চোখ পড়তে বলল, তাইলে মন্তু মিয়া তুমি কাইল পরশু একদিন নবীনগর যাও। কেমন?

মন্তু সংক্ষেপে ঘাড় নাড়ল।

নিজের কথাঁটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না সে। সহসা তার মনে একটা নতুন চিন্তা এল। টুনি ফিরে এলে ওকে দিয়ে কথাঁটা মকবুলকে বলাবে মন্তু?

খাওয়া-দাওয়া শেষে ফর্দ করতে বসল সবাই।

প্রথমে উঠল দেনা-পাওনার প্রশ্নটা।

বরের চাচা ইদন শেখ বলল, অলঙ্কার-পত্র বেশি দিবার পারমু না মিয়া। হাতের দুই জোড়া চুড়ি আর কানের দুইডা ঝুমকা।

গলার আর কমরেরডা দিবো কে? সুরত আলী সঙ্গে সঙ্গে বলল, ওইগুলোও দিতে অইবো আপনেগোরে।

পায়েরটারে বাদ দিলা ক্যান মিয়া, অ্যাঁ? আবুল জোরের সঙ্গে বলল, পায়ের একজোড়া মলও দেওন লাগব।

বুড়ো মকবুল নড়েচড়ে বসল। সুরত আর আবুলের দিকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাকাল সে।

বরের মাবা আরব পাঁটারী মৃদু হেসে বলল, এই বাজারে এতেঠগুলান জিনিস দিতে গেলে কি কম টাকার দরকার মিয়া। আরো একটু কম সম কইরা ধরেন। আচ্ছা, পায়েরটা না হয় নাই দিলাম। মাঝখানে পড়ে মধ্যস্থতা করে দিল রশীদ। বাকিগুলান তো দিবেন? হ্যাঁ তাই সই। সুরত আলী বলল, সোনার জিনিস তো আর দিবার লাগছে না রূপার জিনিস দিবেন। তা মন কষাকষির দি দরকার?

মকবুল কিছুই বলল না। একপাশে বসে রইল চুপ করে।

গনু মোল্লাও নীরব। নীরবে শুধু তছবিহ পড়ছেন ঢুলে ঢুলে।

গহনার কথা শেষ হলে পরে মোহরানার কথা উঠল।

ইদন শেখ বলল, সব ব্যাপারে আপনাগোডা মাইনা নিছি। এই ব্যাপারে কিন্তুক আমাগোডা মানতো অইবো।

আহা কয়েন না শুনি। রশীদ ঘাড় ঝাঁকাল।

ইদন বলল, মোহরানাডা পাঁচ টাকাই ধরেন।

পাঁচ টাহা? অ্যাঁ পাঁচ টাহা? কন কি? রীতিমতো ক্ষেপে উঠল সুরত। মাইয়া কি মাগনা পাইছেন নাহি? অ্যাঁ। মাইয়ার কি কোন দাম নাই?

আহ, দাম আছে বইলাই তো পাঁচ টাহা কইবার লাগছি। নইলে কি আর তিন টাহার উপরে উঠতাম। আবার পাঁটারীর কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ল। কণ্ঠস্বরে বিকৃতি এনে সে বলল, সক্কল দিক দিয়াই বাড়াবাড়ি করবার লাগছেন আপনারা। আচ্ছা যান, আরো আঁ আনা বাড়ায়া দিলাম। মোঁ সাড়ে পাঁচ টাহা।

না বিয়াই। তা অয় না, অইবো না। এতেঠক্ষণে কথা বলল বুড়ো মকবুল। এতেঠ কম মোহরানায় মাইয়ারে বিয়া দিবার পারমু না, বলে হঠাৎ কেঁদে উঠল সে, মাইয়া আমার কইলজার টুকরা বেয়াই। কত কষ্ট কইরা মানুষ করছি। দুহাতে চোখের পানি মুছল মকবুল।

বিশ টাহা যদি মোহরানা দেন তাইলে মাইয়া বিয়া দিমু।

মকবুলের চোখের পানি দেখে অপ্রতিভ হয়ে গেল সবাই। মাঝ রাত পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর সোয়া এগার টাকায় মিটমাঁ হল সব। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে মেহমানরা বিদায় নিয়ে গেল। মনে মনে খুশি হল মকবুল। সোয়া এগার টাকা মোহরানায় এর আগে এ বাড়ির কোন মেয়ের বিয়ে হয়নি।

শব্দার্থ ও টীকা

ডিঙিয়ে – পার হয়ে, অতিক্রম করে। **খুচরো** – পরিমাণের দিক দিয়ে ছোঁ, সামান্য। **পাইকারি** – এস সঙ্গে অনেক জিনিস কেনা বা বেচা। **পরগনা** – কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। **দোচালা ঘর** – দুই চাল দিয়ে বানানো ঘর। **খাতির** – সুসম্পর্ক। **হাঁপানি** – শ্বাস কষ্ট জনিত রোগ বিশেষ। **আন্তরিকতার সুর** –সহমর্মিতাসহ। **একসার** – অনেকগুলো বাতি। **গেরস্থ** – গৃহস্ত শব্দের কথ্যরূপ। **প্রতিধ্বনি** – কোথাও আঘাত পেয়ে আবার যে শব্দ হয়। **উদাস** – উন্মনা, এলোমেলো। **হুরপরী** – পরম সুন্দরী। **গতর খাঁটাবার পারে** – অত্যন্ত পরিশ্রম করতে পারে। **মাচাঙ** – বাঁশের তৈরি উঁচু জায়গা যেখানে বাসন কোসন বা গৃহস্থালির জিনিসপত্র রাখা হয়। **ম্লান** – মলিন বা বিষণ্ন। **ভাঁড়** – মাটির তৈরি পাত্র। **ভুসির আগুন** – কাঠের বা গম, চাল, ডাল ইত্যাদির খোসা বা চোকলা দিয়ে জ্বালানো আগুন যা অনেকক্ষণ ধরে তাপ দেয়। **ডাকতর** – ডাক্তার শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **সতেজ** – বলবান। **খুপরি** – ছোঁ ছোঁ ফাঁক-ফোঁকর। **পরক্ষণে** – পর মুহূর্তে। **বিড়বিড় করে** – শব্দ না করে, অনুচ্চ স্বরে। **আশঙ্কা** – ভয়, সংশয়। **ফরাস** – মেঝেতে পেতে বসার জন্য কাপড়। **হাঁক ছাড়ল** – শব্দ করে বা উচ্চ স্বরে ডাকল। **রাঁনছি** – রেধেছি শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **বিকৃতি** – অস্বাভাবিক। **মোহরানা** – দেনমোহর। **অপ্রতিভ** – বিব্রত, কি করতে হবে বুঝতে না পারা।

বস্তুসংক্ষেপ

করিম শেখের নৌকায় করে মন্তু নানা জায়গায় যেতে শুরু করেছে। আজ এসেছে শান্তির হাটে। হাটে নেমে মন্তু আর করিম শেখ মনোয়ার হাজির চায়ের দোকানে চায় খায়। তারপর হাটে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে।

রাতে বাড়ি ফিরে দেখে মকবুলের ঘরের সামনে সবাই জটলা পাকিয়ে আছে। মন্তু সেখানে গেলে সালেহা মন্তুকে একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে বসতে বলে। কিছুক্ষণের মধ্যে মন্তু বুঝতে পারে হীরনের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। বিয়ের প্রস্তাব এসেছে টুনির বাপের বাড়ির গ্রাম থেকে। তাই নিয়ে সবার সঙ্গে মকবুল আলোচনা করছে। হীরনের বিয়ের আলোচনা প্রসঙ্গেই সালেহা হঠাৎ বলে ওঠে মন্তুর বিয়ের কথা। নানা মেয়ের প্রস্তাব আসে কিন্তু কোনটাতেই সকলে সম্মত হয় না। শেষে আসে আম্বিয়ার সঙ্গে তার বিয়ের কথা আমেনাই প্রস্তাবটা দেয়। কিন্তু আম্বিয়ার বংশে হাঁপানি আছে বলে মকবুল আপত্তি করে।

হীরনের বিয়ের আলোচনা শেষ করে ঘরে গিয়ে দেখে মাচাঙের ওপর একরাশ শাপলা ঝুলছে। টুনি আজ বাপের বাড়ি চলে গেছে। যাবার সময় মন্তুর জন্য সে রেখে গেছে স্মৃতিচিহ্ন।

এরই মধ্যে গ্রামে শীত পড়তে শুরু করছে। খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে মন্তু যায় করিম শেখের বাড়ি। সেখান থেকে নৌকা নিয়ে চলে যাবে দূরদূরান্তে। বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় মকবুল সকাল সকাল ফিরে আসতে বলে মন্তুকে। আজ রাতে হীরনের বিয়ের ফর্দ হবে, সে জন্য।

করিম শেখের বাড়ির দেউড়ির সামনেই দেখা হয় আম্বিয়ার সঙ্গে মন্তুর। আম্বিয়া এই শীতের সকালেও পুকুর থেকে গোসল করে এসেছে। আম্বিয়ার দেয়া পিঠা খেতে খেতেই মন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে আম্বিয়াকে বিয়ে করবে।

রাতে হীরনের বিয়ের ফর্দ করতে নবীনগর থেকে মেহমান আসে। সকালেই আম্বিয়াকে বিয়ের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা জানানোর জন্য মকবুলকে একলা কোনভাবেই পেলনা। এদিকে মকবুল আবার টুনিকে নিয়ে আসার জন্য মন্তুকে দায়িত্ব দেয়। মন্তুভাবে, তাহলে টুনি এলে তার মাধ্যমেই আম্বিয়াকে বিয়ের সিদ্ধান্তটা মকবুলকে জানাবে।

খাবার-দাবারের পর অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সোয়া এগার টাকা দেনমোহরে হীরনের বিয়ে ঠিক হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

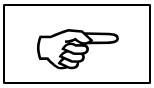

নিচের বাম দিকে দেয়া প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান দিকে উত্তর লিখুন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. মন্তু আর কাশেম নৌকা নিয়ে কোন হাটে গিয়েছিল?	
২. শান্তির হাটে সার্কাস এলে দোকানিরা খুশি হয় কেন?	
৩. মনোয়ার হাজির সঙ্গে করিম শেখের সম্পর্ক কত দিনের?	
৪. শান্তির হাঁ থেকে বাড়ি ফিরে কি দেখে মন্তু?	
৫. সালেহা কে?	
৬. হীরনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে কোথা থেকে?	
৭. 'আমাগো মন্তু মিয়ারেও এই বার একটা বিয়া করাইয়া দ্যান' - কে, কাকে বলেছিল?	
৮. 'ওগো বংশে হাঁপানি রোগ আছে" কাদের বংশে?	
৯. মন্তুর ঘরে টুনি শাপলা ফুল রেখে গিয়েছিল কেন?	
১০. শীতের রাতে গ্রামের লোকেরা কী করে?	
১১. বাড়ির সকলকে আজ মকবুল সকাল সকাল ফিরতে বলে কেন?	
১২. মন্তু নবীনগর যাবে কেন?	
১৩. শীতের সকালেও আম্বিয়া কোথায় গোসল করে?	
১৪. 'আমার বুঝি দিনকাল শেষ হইয়া আইলো মিয়া, আর বাঁচুম না।' কার উক্তি, কেন করেছিল?	
১৫. নবীনগর থেকে কয়জন মেহমান এসেছিল?	

সত্যমিথ্যা নির্ণয় করুন

১. শান্তির হাটে তেমন কোন লোকজন আসে না।
২. সার্কাস এলে শান্তির হাটের ব্যবসায়ীরা মনক্ষুণ্ন হয়।
৩. যাত্রী নিয়ে বাড়ি ফিরতে মন্তুর অনেক রাত হয়ে যায়।
৪. করিম শেখ আর মন্তু নৌকা থেকে নেমে চা খেয়েছিল।
৫. মনোয়ার হাজিকে করিম শেখ পছন্দ করে না।
৬. 'আশা ছিল মনে মনে' - গানটি শুনে করিম শেখ উদাস হয়ে যায়।
৭. যেখানে বাড়ির সম্মান জড়িতে সেখানে মকবুলের বাড়ির কারো বিভেদ থাকে না।
৮. ফাতেমার খালাতো বোনের নাম হুরপরী।
৯. মন্তুর পাঞ্জাবির দাম সোয়া দুটাকা
১০. পিঠা বানাইছি খাইয়া যাইও' - করিম শেখকে বলেছিল আম্বিয়া।

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. আম্বিয়াকে বিয়ে করবে সে। হোক ---------- ।
২. পথের দুপাশের ক্ষেতগুলোতে ---------- আর সরষে লাগানো হয়েছে।
৩. পরক্ষণে ওকে বাধা দিয়ে মন্তু বলল, মরণের কথা চিন্তা করতে নাই। ----------।

৪. ঘরের ভেতর থেকে ---------- হাঁক ছাড়ল, কই, ---------- তেনারে দেহি না ক্যান।
৫. ---------- ঘরের ভিড়টা সবচেয়ে বেশি।
৬. এই শীতে, হ্যাঁ এই শীতেই বিয়ে করে ---------- আনতে চায় মন্তু।
৭. হাঁড়িপাতিলগুলো একপাশে টেনে নিয়ে ---------- ভাত বাড়ছে আমেনা।
৮. পিদিম জ্বালিয়ে অবাক হল মন্তু।---------- ওপর একরাশ ----------।
৯. এক টুকরো ---------- জেগে উঠল মন্তুর ঠোঁটের কোণে।
১০. রসুনের মতো সাদা হলুদে মেশানো ----------। ---------- চোখ।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. করিম শেখের হাঁপানি শুনে মনোয়ার হাজির কণ্ঠে জেগে ওঠে-
ক. বিষাদের সুর খ. আন্তরিকতার সুর
গ. তাচ্ছিল্যের সুর ঘ. বিষাদের সুর

২. সার্কাস এলে কোথায় হোটেল চালু হয়?
ক. মুদি দোকানগুলোয় খ. হাটের শুরুতেই
গ. পাড়ের ভরাঁ জায়গায় ঘ. সার্কাসের দলের কাছাকাছি

৩. 'মাইয়ার কপালে যদি সুখ থাকে তাইলে যেইহানে বিয়া দিবা সেইহানেই সুখে থাকব। কার উক্তি?
ক. আবুলের খ. মকবুলের
গ. আমেনার ঘ. গনু মোল্লার

৪. 'দিনরাত গতর খাঁটাবার পারে। মন্তু মিয়ারে সুখে রাখবো।' - কার উক্তি, কার সম্পর্কে?
ক. আমেনার, আম্বিয়া সম্পর্কে খ. সালেহার, রসুন সম্পর্কে
গ. আবুলের, হুরপরী সম্পর্কে ঘ. মকবুলের, আম্বিয়া সম্পর্কে

৫. টুনির রেখে যাওয়া শাপলাগুলো মন্তু কী করে?
ক. বিছানায় রেখে দেয় খ. মাচাঙের ওপর তুলে রাখে
গ. বাইরে ফেলে দেয় ঘ. ঘরের বাতায় গুঁজে রাখে

৬. হীরনের বিয়ের সব গহনা দিয়েছিল-
ক. মকবুল নিজে খ. ছেলে পক্ষ একা
গ. বাড়ির সবাই মিলে ঘ. দুপক্ষ ভাগভাগি করে

৭. কতটাকা মোহরানায় হীরনের বিয়ে ঠিক হয়?
ক. এক শত টাকা খ. দশ টাকা চার আনা
গ. সোয়া এগার টাকা ঘ. দশ টাকা দশ আনা

ব্যাখ্যা লিখুন

১. পেট তো ঠাণ্ডা গরম কিছু মানে না।
২. আমার বুঝি দিনকাল শেষ হইয়া আইলো মিয়া, আর বাঁচুম না।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নৌকা চালাতে গিয়ে মন্তুর জীবনে যে সকল অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার বর্ণনা দিন।
২. 'বাড়ির মান-সম্মান জড়িয়ে আছে এমন কোন কাজের বেলা কারো সঙ্গে কারো বিরোধ নেই।' - এ উক্তির আলোকে শিকদার বাড়ির বাসিন্দাদের মানসিকতা ব্যাখ্যা করুন।
৩. আম্বিয়াকে ঘিরে মন্তুর মনে বিয়ে সম্পর্কে যে মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা দিন।

৪. হীরনের বিয়ের প্রসঙ্গটির বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মন্তু আর কাশেম নৌকা নিয়ে শান্তির হাটে গিয়েছিল।
২. সার্কাস এলে লোক সমাগম বাড়ে। ফলে দোকানে বেচাকেনা বেড়ে যায়। এ-জন্যে দোকানিরা খুশি হয়।
৩. মনোয়ার হাজির সঙ্গে করিম শেখের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের।
৪. শান্তির হাঁ থেকে বাড়ি ফিরে মকবুলের ঘরের সামনে একটা জটলা দেখতে পায় মন্তু।
৫. সালেহা রশীদের স্ত্রী।
৬. হীরনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে টুনির বাবার বাড়ির গ্রাম নবীনগর থেকে।
৭. সালেহা বলেছিল শিকদার বাড়ির মুরুব্বি মকবুলকে।
৮. আম্বিয়াদের বংশে হাঁপানি রোগ আছে।
৯. টুনি আজ সকালে বাপের বাড়ি চলে গেছে। যাবার সময় তার বিদায়ের চিহ্ন হিসেবে শাপলা ফুলগুলো রেখে গেছে।
১০. শীতের রাতে গ্রামের লোকেরা মাটির ভাঁড়ে ভুসির আগুন জ্বেলে মাথার কাছে রাখে যাতে উত্তাপ পাওয়া যায়। আর মাঝে মাঝে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে খুঁচিয়ে আগুন উস্কে দিয়ে উত্তাপ বাড়িয়ে নেয়।
১১. আজ হীরনের বিয়ের ফর্দ হবে, আর তা ছাড়া বিদেশী মেহমানদের আদর যত্নের জন্যেও বাড়ির সবাইকে আজ সকাল সকাল ফিরে আসতে বলে দেয় মকবুল।
১২. টুনি বাপের বাড়িতে বেড়াতে গেছে। এদিকে হীরনের বিয়ের সব ঠিকঠাক তাই তাকে আনবার জন্য মন্তু নবীনগরে যাবে।
১৩. শীতের সকালেও আম্বিয়া পুকুরে গোসল করে।
১৪. এটি করিম শেখের উক্তি। ইদানীং তার হাঁপানি বেড়ে গেছে, প্রায়ই অসুস্থ থাকছে। এজন্য তার মনে হয়েছে আর বাঁচবে না।
১৫. নবীনগর থেকে মোঁ আঁজন মেহমান এসেছিল- যদিও তাদের আসবার কথা ছিল মাত্র চারজনের।

সত্য মিথ্যা নির্ণয়

১. মিথ্যা ২. মিথ্যা ৩. সত্য ৪. সত্য ৫. মিথ্যা ৬. সত্য ৭. সত্য ৮. মিথ্যা ৯. সত্য ১০. মিথ্যা।

শূন্যস্থান পূরণ

১. হাঁপানি	২. কলাই, মুগ, মটর	৩. আয়ু কইমা যায়
৪. বরের চাচা, বেয়াই কই	৫. রান্না	৬. ঘরে বউ
৭. বাসন বাসন	৮. মাচাঙের, শাপলার	৯. ম্লান হাসি
১০. গায়ের রঙ, টানাঁটানা		

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. ক ৫. খ ৬. খ ৭. গ

ব্যাখ্যা উত্তর

১. পেট তো ঠাণ্ডা গরম কিছু মানে না।

উত্তর : আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান রচিত 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। করিম শেখ মনোয়ার হাজির কাছে তার শারীরিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ-কথা বলেছে।

নন্তু শেখের ছেলে করিম শেখ; পেশায় মাঝি। তার একখানা নৌকা আছে কিন্তু অসুস্থতার কারণে একা তারপক্ষে নৌকা চালানো সম্ভব নয়। সারা বছরই হাঁপানি থাকে। তবে এবার শীতের শুরুতেই তার রোগের প্রকোপ বেড়ে গেছে। ফলে কোন ক্রমেই আর নৌকা নিয়ে বেরুনো সম্ভব হয় না। এমন সময় মন্তু নৌকা চালাতে আগ্রহী হওয়ায় করিম শেখ নৌকাঁটায় খানিক মেরামতের কাজ করিয়ে নেমে পড়ে দূর দূরান্তের যাত্রায়। শান্তির হাটে গিয়ে এ-অবস্থায় করিম শেখের দেখা হয় মনোয়ার হাজির সঙ্গে। হাজির সঙ্গে করিম শেখের অনেক দিনের সুসম্পর্ক। দেখা হতেই হাজি শেখের কুশল জানতে চায়। করিম শেখ তার হাঁপানির প্রকোপের কথা হাজিকে জানালে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে তাকে এভাবে নদীতে নৌকা চালাতে নিষেধ করেন। কিন্তু নৌকা না চালালে পেটের ভাত জুটবে না। পেট তো আর অসুস্থতা, ঠাণ্ডা, গরম, ঝড়- বৃষ্টি এসব কিছুই মানে না। ফলে অসুস্থ শরীরেও করিম শেখকে বের হতে হয় অর্থ উপার্জনে।

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ১ : 'বাড়ির মান-সম্মান জড়িয়ে আছে এমন কোন কাজের বেলা কারো সঙ্গে কারো বিরোধ নেই।' - এ উক্তির আলোকে শিকদার বাড়ির বাসিন্দাদের মানসিকতা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : শিকদার বাড়িতে বুড়ো মকবুলই বয়সের দিক দিয়ে বড়। সেই-ই এখন এ বাড়ির মুরুব্বি। বাড়ির প্রত্যেকের ভালমন্দের ব্যাপারে তার নজর আছে। প্রয়োজনে সে কাউকে কাউকে শাসনও করে। মোঁ আঁ ঘর বাসিন্দার মধ্যে সকলের সঙ্গে সকলের যে সদ্ভাব আছে এমন নয়। না-থাকা বিচিত্রও কিছু নয়। একসঙ্গে থাকলে মনের অমিল হয়, মতেরও অমিল হয়। যেমন সুরত আলীর সঙ্গে রশিদের দীর্ঘদিনের মনোমালিন্য, বউকে যাচ্ছে তাইভাবে যখন তখন পেটায় বলে আবুলকে মকবুল মোটেও দেখতে পারে না; ফকিরের মা সারাক্ষণই গনু মোল্লাকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু বাড়িতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলে সবাই মিলে তারা পরামর্শ করে, বুড়ো মকবুলকে জানায়, তার কথাকে গুরুত্ব দেয়। যেখানে বাড়ির মান-সম্মান জড়িত সেখানে তারা তাদের মধ্যকার তুচ্ছ মান-অভিমান, মন-কষাকষি ভুলে যায়। তখন তারা বাড়ির ঐতিহ্য এবং সম্মানের প্রতিই মনোযোগী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৩ : আম্বিয়াকে ঘিরে মন্তুর মনে বিয়ে সম্পর্কে যে মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা দিন।

উত্তর : হীরনের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বাড়ির সবাই যখন আলোচনা করছিল তখন হঠাৎ করেই রশিদের বৌ সালেহা মন্তুরও একটি বিয়ে দেবার কথা সকলের সামনে বলে। বাড়ির সবাই একমতো হয়, যেহেতু মন্তুর বাপ-মা কেউ নেই সুতরাং তার সংসারী হবার জন্য বিয়েটা জরুরি। উপস্থিত সকলের কাছ থেকে নানা ধরনের পাত্রীর সংবাদ খবর পাওয়া যায়। বিচিত্র তারের রূপ, বিচিত্র তাদের গুণ। আমেনা হঠাৎ আম্বিয়ার সঙ্গে মন্তুর বিয়ের কথা তোলে। কিন্তু মকবুলের আপত্তির কারণে আম্বিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা বেশিদূর এগোয় না। মকবুলের আপত্তির কারণ আম্বিয়ার বংশে হাঁপানি আছে। বিয়ের আলোচনায় মন্তুর চিন্তায় এক ধরনের পরিবর্তন হয়। পরদিন সকাল বেলা মাঝি বাড়ির দিকে যেতে যেতে মন্তুর চোখে চারদিকের পরিবেশ বেশ আনন্দজনক মনে হয়। মাঝি বাড়িতে ঢুকবার মুখে দেখা হয় আম্বিয়ার সঙ্গে। আজ মন্তু আম্বিয়ার দিকে অন্য চোখে দেখে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মন্তুকে যখন আদর করে পিঠা খেতে দেয় আম্বিয়া, কিংবা যখন পাশের ঘরে ভেজা চুলগুলোকে শুকনো কাপড় দিয়ে ঝাড়ে তখন মন্তুর মনের কোণে এক অভূতপূর্ব আনন্দ জাগে। আর তখনই সে সিদ্ধান্ত নেয় আম্বিয়াকে সে বিয়ে করবে।

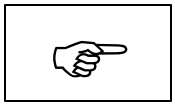

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ৮

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- কুটুম বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মন্তুর আচরণগত পরিবর্তনের বিবরণ দিতে পারবেন;
- টুনিদের বাড়ির পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবেন;
- খেজুরের রস নামানোর জন্য টুনির কর্মকুশলতার পরিচয় দিতে পারবেন।

নবীনগরের ছোঁ খালে এসে নাওয়ের নোঙর ফেলল মন্তু।

খাল পাড়ে ওঠে দাঁড়ালে টুনিদের বাড়ির লম্বা নারকেল আর তালগাছগুলো দেখা যায়। আর সেই তাল-নারকেলের বনের ফাঁকে ওদের দেউড়ি ঘরটাও চোখে পড়ে এখান থেকে।

নৌকা থেকে নামার আগে মুখ হাতটা ভাল করে ধুয়ে নিল মন্তু। পুরনো লুঙ্গিটা পালটে নিয়ে নতুন লুঙ্গিটা পরল, ফতুয়াঁটা খুলে জামাঁটা গায়ে দিল সে। তারপর খদ্দরের চাদরটা কাঁধে ফেলে, পুরনো ছাতাঁটা বগলে নিয়ে ধীরে ধীরে নৌকা থেকে নেমে এল মন্তু।

কিছুদূর এসে পকেট থেকে টুপিটা বের করল।

আসার সময় বুড়ো মকবুল বার বার করে বলে দিয়েছে, কুটুমবাড়িতে গিয়ে যেন মন্তু এমন কিছু না করে যার ফলে বাড়ির বদনাম হতে পারে। টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে চারপাশে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল মন্তু। পথঘাঁটা জানা আছে ওর। এর আগে মকবুলের বিয়ের সময় একবার এসছিল সে। দিন তিনেক থেকে গিয়েছে এখানে। রাস্তায় দুচারজন অপরিচিত লোক ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ওকে।

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুর উড়ে যাচ্ছে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। একটু একটু করে ঠাণ্ডা পড়তে শরু করেছে। এদিকের লোকেরা এর মধ্যে খেজুর গাছ কেটে রস নামাতে শুরু করে দিয়েছে। পথে আসতে তিন চারজন গাছুনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মন্তুর।

ধারালো বাঁটাল দিয়ে গাছ কাঁছে ওরা। তারপর মাটির কলসী ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে আসছে গাছ থেকে।

টুনিদের বাড়ির সামনে এসে যার সঙ্গে মন্তুর প্রথম দেখা হল সে টুনির চাচা মোতালেব শিকদার। সন্ধ্যেবেলা গরু-বাছুরগুলোকে ঠেঙিয়ে গোয়াল ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল সে।

মন্তুকে দেখে হা করে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, মন্তু মিয়া না? কি মনে কইরা? মন্তু এগিয়ে এসে পা ধরে সালাম করল ওর। তারপর বলল, ভাইজান পাঠাইছে, টুনি ভাবীরে নিবার লাইগা।

অ। মুখখানা ঈষৎ ফাঁক করে গরুগুলোকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে আবার গোয়ালঘরের দিকে চলে গেল মোতালেব শিকদার।

একটু পরে আবার ফিরে এল সে। বলল, আয়েন ভিতরে আয়েন। টুপিটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিল মন্তু, তারপর শিকদারের পিছু পিছু ভেতর বাড়িতে এগিয়ে চলল সে।

দেউড়ির পাশে একখানা বাঁশের বেড়া দিয়ে বাইরের লোকদের কাছ থেকে ভেতর বাড়ির পর্দা রক্ষা করা হয়েছে। তারই পাশে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিয়ে অবাক চোখে দেখছে ওরা। ভেতর বাড়ির ওঠোনে এসে দাঁড়াতে মন্তু দেখল, ঘরের দাওয়ায় একটা বাঁশের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে টুনি। সারা মুখে ওর হাসি যেন উপচে পড়ছে। নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

মন্তুকে টুনিদের ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল শিকদার।

রসুই ঘর থেকে টুনির মা বেরিয়ে এলেন বাইরে। মন্তু সালাম করল তাকে।

মা বললেন, কইরে টুনি। মিয়ারে একখানা জলচৌকি আইনা দে, বউক।

চৌকি এনে দিলে দাওয়ায় বসল মন্তু।

টুনির মা সবার কুশল জানতে চাইল। টুনি কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করল না, শুধু মুখ টিপে বারবার হাসতে লাগল সে।

টুনির মা বলল, টুনি তো কদিন ধইরা যাওনের লাগি উথাল পাতাল লাগাইছে।

উঁ যাইবো। যামু না আমি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল টুনি।

মা বলল, দাঁড়ায়া থাইকো না। মিয়ার ওজুর পানি দাও।

মন্তুর জন্যে হাত-মুখ ধোয়ার পানি আনতে চলে গেল টুনি। মা-ও গেল একটু পরে, বলল তরকারিটা নামায়া আই।

চারপাশটা তাকিয়ে দেখছিল মন্তু। এক বছরে বেশ পরিবর্তন হয়েছে বাড়িটার। ওঠোনের কোণে পাশাপাশি দুটি জাম গাছ ছিল। কেটে ফেলা হয়েছে। রান্নাঘরের এ পাশটা নুয়ে পড়েছে এখন। আগে অমনটি ছিল না। আগে গোয়ালঘরটা পুকুরের পূর্ব পাশে ছিল, এখন সেটা উত্তর পাশে সরিয়ে আনা হয়েছে।
টুনি এসে এক ঘটি পানি রাখল ওর সামনে আর এক জোড়া খড়ম। বলল, হাত-মুখ ধুইয়া নাও।
মন্তু মুখ হাত ধুয়ে নিলে ওর দিকে একটা গামছা বাড়িয়ে দিয়ে টুনি বলল, চল ভেতরে চল, বাইরে শীত পড়তাছে।
মন্তু কোন কথা বলল না। শান্ত শিশুর মতো ওকে অনুসরণ করে ভেতরে চলে গেল সে।
পাশাপাশি দুটো ঘর। মাঝখানে একটা দরজা। ও পাশেরটাতে মা-বাবা থাকে আর টুনির ছোঁ ছোঁ দুই ভাইবোন। এ পাশের ঘরটা দেখিয়ে টুনি মৃদু হেসে বলল, এইডা আমার ঘর।
ওর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশটা তাকিয়ে দেখল মন্তু। ছোঁ ঘর মালপত্র ভরা। কয়েকটা বড় বড় মাটির ঘটি এক কোণে রাখা, তার পাশে তিন চারটে বেতের ঝুড়ি। ঝুড়ি ভর্তি লাল আলু রাখা আছে। দক্ষিণ কোণে একটা কাঠের চৌকি। চৌকির উপরে একটা কাঁথা বিছানো। একটা তেল চিটচিটে বালিশ। চৌকির নিচে দুটি ছোঁ ছোঁ টিনের প্যাঁরা। পশ্চিমের বেড়ার সঙ্গে একটা কাঠের তাক বসানো হয়েছে। তাকের উপরে রাখা আছে কয়েকটা ছোঁ ছোঁ মাটির ভাঁড় আর একটা মুড়ির টিন। তার পাশে বেড়ার সঙ্গে একটা ভাঙ্গা আয়না ঝোলান। উত্তর কোণে একটা দড়ির সঙ্গে ঝুলছে টুনির দুখানা শাড়ি, একটা ময়লা কাঁথা। তাছাড়া ঘরের ঠিক মাঝখানে চিলে কাঠের সঙ্গে কতগুলো ছিকে। ছিকের মধ্যে কয়েকটা হাঁড়িপাতিল রাখা। মন্তু মুহূর্তে চোখ বুলিয়ে নিল পুরো ঘরটার ওপর। টুনি চৌকিটা দেখিয়ে বলল, এইখানে বও।
মন্তু বসল।
কিছুক্ষণ ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টুনি বলল, অমন শুকায়া গেছ ক্যান?
মন্তু পরক্ষণে বলল, কই না, শুকাই নাই তো।
টুনি মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
মন্তুর মনে হল এ ক'মাসে টুনি অনেক পাল্টে গেছে।
রাতে টুনির ঘরে ওর শোবার বন্দোবস্ত হল।
ময়লা কাঁথাটার ওপর ওর একখানা শাড়ি বিছিয়ে দিল। বালিশটাকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল। তারপর বলল, আর বইসা থাকো না শুইয়া পড়।
মন্তু বলল, বেহান রাইতে কিন্তুক রওয়ানা দিতে হবে।
ওর কথা শেষ না হতে শব্দ করে হেসে দিল টুনি।
বলল, ইস, কইলেই অইলো। তারপর একটুকাল থেমেই আবার বলল, সে কম কইরা অইলেও তিনদিন আমাগো বাড়ি বেড়ান লাগব। তারপরে যাওনের নাম।
মন্তু বলল, পাগল অইছ? তাহলে ভাইজানে মাইরা ফালাইব আমারে। করিম শেখের নাও নিয়ে আইছি- আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে। টুনি বলল, যাই শুই গিয়া, কথা যা অইবার কাল সকালে অইবো। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেল সে। কুপিটা নিভিয়ে দিয়ে একটু পরেই শুয়ে পড়ল মন্তু। করিম শেখের কথা মনে হতে আম্বিয়ার কথাও মনে পড়ছে তার।
এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথে টুনিকে সব বলবে মন্তু। টুনি নিশ্চয় এ ব্যাপারে সাহায্য করবে ওকে।
কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল মন্তু।
ঘুম ভাঙলো কখন সে ঠিক বলতে পারবে না। কে যেন চাপা স্বরে ওকে ডাকল, এই। সহসা কোন সাড়া দিল না মন্তু।
হঠাৎ ওর হাতখানা শক্ত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল সে। একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি শোনা গেল, উঃ এই।
পরমুহূর্তে হাতখানা ছেড়ে দিল মন্তু। টুনি?
ইস, কথা কয়ো না। মায় হুনব। ওর মুখের ওপরে একখানা হাত রাখল টুনি। তারপর মুখখানা আরো নামিয়ে এনে আস্তে আস্তে করে বলল, চুপ শব্দ কইরো না। শোন, চুপচাপ উইড্যা আইও আমার সঙ্গে।
কিছু বুঝে উঠতে পারল না মন্তু। টুনির মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ও। তারপর ধীরে ধীরে ওঠে বসল সে। একটু পরে টুনির পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে এল মন্তু।

বাইরে এসে দেখল টুনির হাতে একটা মাটির কলস। শীতে দুজনে রীতিমতো কাঁপছিল ওরা।
মন্তু প্রশ্ন করল, কি, কি অইছে?
টুনি ফিক করে হেসে দিয়ে বলল, কিছু অয় নাই, এদিকে আইও। ওর একখানা হাত ধরে অন্ধকারে টেনে নিয়ে চলল তাকে। বার বাড়িতে এসে মন্তু আবার প্রশ্ন করল, কই চললা?

বলল, ঘাবড়ায়ো না মিয়া তোমারে মারুম না। বলে আবার চলতে লাগল সে।
এতেঠক্ষণ এতেঠ অবাক হয়ে গিয়েছিল মন্তু যে শীতের প্রকোপটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে না যেতে প্রচণ্ড শীতে দাঁতে দাঁতে লেগে এল ওর।
একটা লম্বা খেজুর গাছের নিচে এসে দাঁড়াল টুনি। কলসিটা মন্তুর হাতে দিয়ে বলল, এইটা রাখ হাতে তারপর পরনের শাড়িটাকে লুঙ্গির মতো গুটিয়ে নিল সে। মন্তু কাঁপা গলায় শুধালো কি কর?
ওর প্রশ্নের কোন জবাব দিল না টুনি। নির্বিকারভাবে খেজুর গাছটা বেয়ে ওপরে ওঠে গেল সে।
মন্তুর মনে হল ও স্বপ্ন দেখছে।
একটু পরে এক হাতে রসের হাঁড়িটা নিয়ে অন্য হাতে গাছ বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল টুনি। কলসির মধ্যে রসটা ঢেলে হাঁড়িটা রেখে আসবার জন্য আবার ওপরে যাচ্ছিল টুনি। মন্তু বলল, আরে কি কর। গাছ এখন পিছল। পইড়া যাইবা।
পেছন ফিরে তাকিয়ে হাসল টুনি। বলল, ইস কত উঠছি। পাশের ঝোপ থেকে দুটো শিয়াল ছুটে এসে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মন্তুর দিকে হা করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। চোখজোড়া অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে ওদের। মন্তু একটা ধমক দিতে ছুটে পালিয়ে গেল ওরা।
টুনি নেবে এসে বলল, কারে ধমকাও?
মন্তু আস্তে করে বলল, শিয়াল।
আরো অনেকগুলো খেজুর গাছ থেকে রস নামিয়ে কলসি ভর্তি করলো ওরা। শীতের রাতে কুয়াশার বৃষ্টি ঝরছে চারদিকে। মাটি ভিজে গেছে। গাছের পাতাগুলোও ভেজা। আশেপাশে তাকাতে গেলে বেশি দূরে দেখা যায় না। কুয়াশার আবরণে ঢেকে আছে চারদিক। হঠাৎ মন্তুর গায়ে হাত দিয়ে টুনি বলল, শীত লাগতাছে বুঝি?
মন্তু কোন জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, তোমার লাগে না?
টুনি বলল, উঁহু। বলে মাথাঁটা দোলাল সে।
মন্তু বলল, রস দিয়া কি করবা?
টুনি বলল, সিন্নি রাঁন্দুম।
মন্তু কোন কথা বলার আগেই টুনি আবার বলল, তোমার নায়ে চল।
মন্তু বলল, রস দিয়া করবা কি?
টুনি নির্লিপ্ত গলায় বলল, সিন্নি রান্দুম?
মন্তু বলল, পাগল হইছ?
টুনি ফিক করে হেসে দিয়ে বলল, হুঁ। বলে মন্তুর মুখের দিকে তাকাল সে, কই নাওয়ে যাইবা না?
মন্তু কঠিন স্বরে বলল, না?
ওর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল টুনি। ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মুহূর্তে একটা অবাক কাণ্ড করে বসল সে। হাতের কলসিটা উপরে তুলে মাটিতে ছুঁড়ে মারল। মাটিতে পড়ে মাটির কলসি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রস গড়িয়ে পড়ল চারপাশে।
কিছুক্ষণের জন্য দুজনে বোবা হয়ে গেল ওরা।
কারো মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না।
মন্তু নীরবে তাকিয়ে রইল, ভাঙা কলসির টুকরোগুলোর দিকে। টুনি মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে অন্ধকারে পাথরের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুকুর পাড়ে লম্বা তালগাছগুলোর মাথায় দুটো বাদুড় হঠাৎ পাখা ঝাপটিয়ে উঠল।
টুনি আস্তে করে বলল, চল ঘরে যাই, চল।
মন্তু কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করল শুধু।
পরদিন যাওয়া হল না মন্তুর।
টুনির মা বলল কুটুমবাড়ি আইয়ে নিজের ইচ্ছায়, যায় পরের ইচ্ছায়। ইচ্ছা করলেই তো আর যাইতে পারবা না মিয়া। যহন যাইতে দিমু তহন যাইবা। অগত্যা থেকে যাওয়া হল।
সারাদিন একবারও কাছে এল না টুনি। অথচ সারাক্ষণ বাড়িতে ছিল সে। ঘরদোর ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করেছে। ঘাটে গিয়ে বাসনপত্র ধুয়ে এনেছে। রান্নাবান্না করেছে।
তারপর খাওয়ার সময় মা ডেকে বলছে, কইরে টুনি এইদিকে আয়। মন্তু মিয়াকে ভাত বাইড়া দে। তখন শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে থেকেছে সে।
রাতেরবেলা হঠাৎ বেঁকে বসল টুনি। বলল, কাল সক্কাল বেলাই চইলা যামু আমি।
জিনিসপত্র সব গুছাইয়া দাও।

মা বলল, আরো দুইটা দিন থাইকা যা। আবার কবে আইবার পারবি কে জানে।
টুনি বলল, না মন্তু মিয়ার কাম-কাজের ক্ষতি অইয়া যাইতেছে।
মা বলল, না মন্তু মিয়াকে বুঝাইয়া কইছি। হে রাজি আছে।
টুনি তবু বলল, না কাল সক্‌কালেই চইলা যামু।
পাশের ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব শুনলো মন্তু।

শব্দার্থ ও টীকা

নোঙর –শিকল বা কাছির সাথে বাঁধা লাঙলের আকৃতির লোহার ভারী অঙ্কুরবিশেষ। **কুটুম বাড়ি** – আত্মীয় বাড়ি। **ঈষৎ** – সামান্য। **বিস্ময়** – আশ্চর্য, অবাক। **গাছুনি** – খেজুর গাছ কেটে রস বের করে যারা। **বাঁাল** – লোহার তৈরি ধারাল অস্ত্র। **হা করে** – অবাক হয়ে। **ঠেঙাতে ঠেঙাতে** – তাড়াতে তাড়াতে। **দাওয়ায়** – বারান্দায়। **রসুই ঘর** – রান্নাঘর। **জলচৌকি** – কাঠের তৈরি ছোঁ চৌকি। **যাওনের লাগি উথাল পাতাল লাগাইছে** – যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। **নুয়ে পড়েছে** – হেলে পড়েছে, নিচু হয়ে পড়েছে। **ঘটি** – কাঁসা বা সিলভারের তৈরি ছোঁপাত্র। **খড়ম** – কাঠের তৈরি পাদুকা বিশেষ। **টিনের প্যাঁরা** – টিন দিয়ে বানানো ছোঁ বাক্স। **কুপি** – খোলা বাতি। **কাতরোক্তি** – কষ্ট বা যন্ত্রণায় লোকে যে ধরনের শব্দ করে। **বেহান রাইতে** – খুব সকালে। **প্রকোপ** – তীব্রতা, **নির্বিকারভাবে** – বিকারহীনভাবে; কোন কিছুতেই কিছু এসে যায় না এমনভাবে। **পিছল** – পিচ্ছিল। **নির্লিপ্ত** – সমন্বয়হীন, সম্পর্কশুন্য। **নিশ্চল** – যা চলাচল করে না, স্থির। **অজুহাত** – কারণ, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যে কারণ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

বস্তুসংক্ষেপ

হীরনের বিয়ের দিন ঠিক হওয়ায় টুনিকে তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে যাবার জন্য মকবুল মন্তুকে নবীনগর পাঠায়। মন্তু করিম শেখের নৌকা নিয়ে টুনিকে নিতে এসেছে। কুটুম বাড়িতে আসবার সময় মকবুল বারবার করে সাবধান করে দিয়েছে মন্তুকে যেন এমন কোন আচরণ সে না করে যাতে বাড়ির বদনাম হয়। মন্তু মকবুলের এ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করে। সে জন্য নবীনগরের ছোঁ খালে নৌকা নোঙর করেই সে মুখ-হাত ভালো করে ধুয়ে নিয়েছে। আর সে সঙ্গে পুরনো লুঙ্গি বদলে নতুন লুঙ্গি পরে নেয়; গা থেকে ফতুয়া খুলে পরে নেয় জামাঁটা। মাথায় টুপিও দেয় সে একটি।
টুনিদের বাড়িতে এসে মন্তুর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় টুনির চাচা মোতালেব শিকদারের সঙ্গে। বিয়ের সময় এখানে এসে তিন দিন থেকে ছিল তাই তিনি মন্তুকে চিনতে পারেন; যদিও প্রথমটায় খানিকটা সময় লাগে তাঁর। মোতালেব শিকদারই সঙ্গে করে মন্তুকে ভেতর বাড়িতে নিয়ে আসেন। টুনির মা তখন ছিলেন রান্নাঘরে তিনি বেরিয়ে এলে মন্তু তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করে। তিনি সকলের কুশল জানতে চান বটে কিন্তু টুনি কিছুই জানতে চায় না কেবল মুখ টিপে হাসে।
রাতে খাবার-দাবার শেষে মন্তুকে থাকতে দেয়া হয় টুনির ঘরে। আজ রাতে টুনি তার ছোঁ বোনের সঙ্গে থাকবে। মেহমানের জন্য চৌকিতে কাঁথার ওপর টুনির পরনের একটা পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয়। দীর্ঘ নৌকা পথের যাত্রার ক্লান্তিতে খুব সহজেই মন্তু ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মাঝ রাতে টুনির ডাকে তার ঘুম ভেঙে যায়। টুনি মন্তুকে ডেকে নিয়ে নিজেই খেজুর গাছে ওঠে রস নামিয়ে নিয়ে এসে কলসি ভর্তি করে ফেললো। মন্তু বিশ্বাসই করতে পারছিল না টুনির এ ধরনের আচরণ। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ঘটে যাচ্ছিল সব। গাছ থেকে রস নামানো হলে মন্তুকে তার নৌকায় নিয়ে যেতে বলে টুনিকে, কারণ সে নৌকায় বসে রসের সিন্নি রাঁধতে চায়। কিন্তু এতে মন্তু কঠোরভাবেই আপত্তি জানায়। মন্তুর আপত্তিতে টুনির সকল উৎসাহে হঠাৎ করেই ভাঁটা পড়ে। রাগে, দুঃখে টুনি রসের কলসিটা মাটিতে ফেলে ভেঙে ফেলে।
পরদিন টুনি সারাদিন একবারও মন্তুর কাছে আসে না নানা অজুহাতে। কিন্তু রাতেরবেলাতেই তার মাকে সে জানিয়ে দেয় পরদিন সকালেই সে চলে যাবে। অথচ এর আগে টুনিই মন্তুকে নবীনগরে কয়েকদিন থাকবার জন্য বলেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

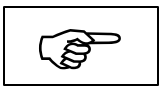

নিচের বাম দিকে দেয়া প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান দিকে উত্তর লিখুন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	**উত্তর লিখুন**
১. নবীনগরে কোথায় এসে মন্তু নৌকায় নোঙর করল?	
২. খালপাড় থেকে ওঠে দাঁড়ালে টুনিদের বাড়ির কোন জিনিসটি প্রথম দেখা যায়?	
৩. নৌকা থেকে নামার আগে মন্তু তার সাজ-সজ্জা বদলে নেয় কেন?	
৪. টুনিদের বাড়িতে প্রথম কার সঙ্গে দেখা হয় মন্তুর?	
৫. মন্তু যখন ভিতর বাড়িতে ঢোকে তখন টুনি কি করছিল?	
৬. টুনিদের বাড়িতে কীভাবে বাইরের লোকদের থেকে ভেতর বাড়ির পর্দা রক্ষা করা হতো?	
৭. 'কদিন ধইরা যাওনের লাগি উথাল পাতাল লাগাইছে?'	
৮. এক বছরে টুনিদের বাড়িতে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?	
৯. কার নৌকা নিয়ে মন্তু টুনিকে নেবার জন্য এসেছিল?	
১০. 'ঘাবড়ায়ো না মিয়া তোমারে মারুম না' - কি, কাকে বলেছিল?	
১১. খেজুরের রস দিয়ে টুনি কী করতে চেয়েছিল?	
১২. রসে ভরা কলসিটা টুনি ভেঙে ফেললো কেন?	
১৩. 'কুটুম বাড়িতে আইয়ে নিজের ইচ্ছায়, যায় পরের ইচ্ছাছ কে, কাকে বলেছিল?	

নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করুন

১. বিস্ময় : ---------- ।
২. হাঁ করে : ---------- ।
৩. নুয়ে পড়া : ---------- ।
৪. বেহান রাইত : ---------- ।
৫. প্রকোপ : ---------- ।
৬. নির্বিকার : ---------- ।
৭. নির্লিপ্ত : ---------- ।

৮. নিশ্চল : ---------- ।
৯. অজুহাত : ---------- ।
১০. বেঁকে বসা : ---------- ।

দ্বিরুক্ত শব্দ

অনেক সময়ই কোন কোন শব্দকে পরপর দুবার উচ্চারণ করে, বিশেষভাব, ব্যাপ্তি জোর দেয়া ইত্যাদি বোঝানো হয়। একই শব্দের পরপর দুবার ব্যবহারকে বলা হয় দ্বিরুক্ত শব্দ। যেমন বারবার, বারেবারে, ঘুমঘুম, জ্বরজ্বর, শীত শীত, টুকরো টুকরো, থেকে থেকে ইত্যাদি। এ-পাঠটিতে যে-সকল দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো নির্বাচন করে নিচে তালিকা তৈরি করুন।

যেমন ঃ
ধীরে ধীরে

----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------

রচনামূলক প্রশ্ন

১. টুনিদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মন্তুর আচরণে ও সাজসজ্জায় যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার বিবরণ দিন।
২. টুনিদের বাড়ির পরিবেশের বর্ণনা দিন।
৩. টুনি কেন খেজুরের রস সংগ্রহ করেছিল? খেজুরের রস সংগ্রহের ব্যাপারে টুনির কর্মকুশলতার পরিচয় দিন।
৪. টুনি কেন নবীনগর থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এল?

উত্তরমালা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নবীনগরের ছোঁ খালে এসে মন্তু নৌকার নোঙর ফেলেছিল।
২. খালপাড় থেকে ওঠে দাঁড়ালে প্রথমেই নজরে পড়ে টুনিদের বাড়ির লম্বা নারকেল আর তালগাছগুলো।
৩. কুটুম বাড়িতে বেড়াতে আসবার সময় বারবার মকবুল মন্তুকে সাবধান করেছে যেন সে সব সময় ভালভাবে থাকে; এমন কোন আচরণ না করে যাতে বাড়ির বদনাম হয়। মন্তু মকবুলের এ-পরামর্শ মনে রেখেছে। ফলে কুটুম বাড়িতে ঢোকার আগেই সে তার সাজসজ্জার পরিবর্তন করে নেয় যাতে করে তাকে ভদ্র দেখায়, মার্জিত দেখায়। এতে করে বাড়ির সম্মান বাড়বে বই কমবে না। তাই মন্তু তার সাজসজ্জা পরিবর্তন করে নেয়।
৪. টুনিদের বাড়ির সামনে মন্তুর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় টুনির চাচা মোতালেব শিকদারের সঙ্গে।
৫. মন্তু যখন মোতালেব শিকদারের সঙ্গে ভেতর বাড়িতে ঢোকে টুনি তখন ঘরের দাওয়ায় একটা বাঁশের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।
৬. দেউড়ির পাশে একখানা বাঁশের বেড়া দিয়ে বাইরের লোকদের কাছ থেকে ভেতর বাড়ির পর্দা রক্ষা করা হয়েছে।
৭. এ-কথা টুনির মা বলেছিল টুনি সম্পর্কে।
৮. এক বছরে টুনিদের বাড়িতে বিশ বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। ওঠোনের এক কোণে দুটো জামগাছ ছিল সেগুলো কেটে ফেলা হয়েছে। রান্নাঘরটা আর মাথা উঁচু করে নেই- বেশ নুয়ে পড়েছে। গোয়ালঘরটা ছিল পুকুরের পূর্ব পাশে এখন সেটা সরিয়ে উত্তর দিকে নিয়ে আসা হয়েছে। এ-সব পরিবর্তন মন্তুর চোখে ধরা পড়ে।
৯. টুনিকে নবীনগর থেকে নিয়ে যাবার জন্য মন্তু করিম শেখের নৌকায় নিয়ে এসেছিল।
১০. এ-কথা টুনি বলেছিল মন্তুকে।
১১. খেজুরের রস দিয়ে টুনি সিন্নি রাঁধতে চেয়েছিল মন্তুর নৌকায় বসে।
১২. যে প্রবল উৎসাহ নিয়ে টুনি রস নামিয়েছিল গাছ থেকে তা যেন মুহূর্তেই ধূলায় মিশে যায়, যখন মন্তু টুনিকে তার নৌকায় নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে টুনি রসের হাঁড়িটা মাটিতে ফেলে ভেঙে ফেলে।
১৩. টুনির মা এই প্রবাদ ধর্মীয় কথাটি মন্তুকে বলেছিল।

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ১ : টুনিদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মন্তুর আচরণে ও সাজসজ্জায় যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার বিবরণ দিন।

উত্তর : টুনিদের বাড়িতে টুনিকে আনতে যাবার সময় মকবুল বারবার করে মন্তুকে বলে দিয়েছিল সে যেন এমন কোন আচরণ না করে যাতে বাড়ির বদনাম হয়। মন্তু মকবুলের এই আদেশ সর্ব ক্ষেত্রেই মেনে চলার চেষ্টা করেছে। নৌকা থেকে নামার আগেই মন্তু ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে নিয়েছে নদীর পানি দিয়ে। তারপর পুরনো লুঙ্গি বদলে নতুন লুঙ্গি পরেছে। গায়ের ফতুয়া খুলে রেখে জামা গায়ে দিয়েছে। তারপর খদ্দরের চাদরটা কাঁধে ফেলে, পুরনো ছাতাঁটা বগলের নিচে নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এসেছে নৌকা থেকে। তারপর বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে মাথায় টুপি পরে নিতেও ভুলে যায় নি।

টুনিদের বাড়ির বাইরেই দেখা হয়েছে টুনির চাচা মোতালেব শিকদারের সঙ্গে। মন্তু তাঁকে দেখা মাত্রই পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে ভুলে যায়নি। ভেতর বাড়িতে গিয়ে টুনির মাকেও সশ্রদ্ধভাবে সালাম করেছে। তাঁর সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে। এমনকি টুনিকে নিয়ে পরদিন সকালেই মন্তুর চলে যাবার কথা থাকলেও কুটুম বাড়ির মুরুব্বির কথাকে সে অগ্রাহ্য করেনি। মন্তুর আচরণের এই পরিবর্তনের কারণ সে কোনভাবেই নিজের এবং মকবুলকে বিশেষ করে বাড়ির সম্মানটাকে সব সময় বড় করে দেখেছে। ফলে কুটুম বাড়িতে যতদূর সম্ভব ভদ্রজনিত আচরণ করার চেষ্টা করেছে মন্তু।

প্রশ্ন ২ : টুনিদের বাড়ির পরিবেশের বর্ণনা দিন।

উত্তর : টুনিদের বাড়ি নবীনগরের ছোঁ খাল থেকে বেশি দূরে নয়; খাল পাড়ে ওঠে দাঁড়ালে বাড়ির লম্বা নারকেল আর তালগাছগুলো দেখা যায়। আর দেখা যায় ওদের দেউড়ি ঘরটা। গাছপালায় ঘেরা টুনিদের বাড়িতে একটা যৌথ পরিবারের চিত্র আমরা দেখতে পাই। বাড়িটা খুব বড় নয় তবে খোলামেলা। বার বাড়ি এবং ভেতর বাড়ি এই দুইভাগে বাড়িটা বিভক্ত। দেউড়ির পাশে একটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ভেতর বাড়ির পর্দা রক্ষা করা হয়েছে। টুনিদের বাড়িতে একটা পুকুর আছে, আর তার উত্তরপাশে গোয়ালঘর। থাকবার জন্য টুনিদের পাশাপাশি দুটো ঘর। তার মাঝখানে একটা দরজা। একদিকের ঘরে টুনির মা-বাবার সঙ্গে ছোঁ দুই ভাইবোন থাকে অন্য দিকের ঘরটাতে থাকে টুনি। টুনির ঘরে শোবার জন্য একটা খাঁ ছাড়াও পুরো ঘরটা নানা রকম জিনিসে ঠাসা। এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায় টুনির বাবার বাড়ির পরিবেশ ঠিক দরিদ্র পরিবেশ নয়। তারা অবস্থাপন্ন নয় কিন্তু কারো মুখাপেক্ষী হয়েও তাদের বাঁচতে হয় না। বাংলাদেশের যে কোন একটি সচ্ছল গৃহস্থ বাড়ির পরিবেশই আমরা দেখতে পাই টুনিদের বাড়িতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ৯

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- মন্তু আর টুনির মধ্যকার মান-অভিমান কী করে সহজ হল তা বলতে পারবেন;
- মন্তু আর টুনির সার্কাস দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সার্কাস দেখে ফেরার সময় মন্তু আর টুনির মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন।

পরদিন ভোরে রওনা হয়ে গেল ওরা।

মন্তু আর টুনি।

ওর বাবা আর দুই চাচা শিকদার খালপাড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল ওদের। সঙ্গে ছোঁ দুই ভাইবোনও এল আর এল ওদের কালো কুকুরটা।

ছইয়ের মধ্যে টুনির জন্যে কাঁথাঁটা বিছিয়ে দিয়েছিল মন্তু। তার ওপর গুটিসুটি হয়ে বসল সে।

খালের পাড়ে যতক্ষণ তার বাবা চাচা আর ভাইবোনদের দেখা গেল ততক্ষণ সে দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টুনি।

তারপর মুখখানা ঘুরিয়ে এনে নীরবে বসে রইল।

খাল পেরিয়ে যখন নৌকা নদীতে এসে পড়ল তখন দুপুর হয়ে আসছে।

টুনি এতেঠক্ষণ একটা কথাও বলে নি। মন্তু সারাক্ষণ কথা বলার জন্য আকুপাকু করছিল। কিন্তু একবারও সুযোগ দিল না টুনি। উজান নদীতে দাঁড় বেয়ে চলতে চলতে এক সময়ে মন্তু বলল, বাইরে আইয়া বহো গায়ে বাতাস লাগবো।
ও নড়েচড়ে বসল কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এল না।
একটু পরে একটা কাপড়ের পুঁটুলি থেকে কিছু চিঁড়া আর একটু করো খেজুরের গুড় বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিল টুনি। বলল, বেলা অইয়া গেছে খাইয়া নাও। বলে আবার চুপ করে গেল সে।
মন্তু বলল, তুমি খাইবা না?
না।
না কেন?
ক্ষিধা নাই।
ঠিক আছে, আমারও ক্ষিধা নাই। বলে আবার দাঁড় বাইতে লাগল মন্তু। নদীর পানিতে দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দ ছাড়া কিছুক্ষণ আর কিছুই শোনা গেল না।
ক্ষণকাল পরে টুনি আবার বলল, খাইবা না।
না।
শেষে শরীর খারাপ করবো।
করুক গা। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল মন্তু।
আর বেশিক্ষণ ছইয়ের ভেতর বসে থাকতে পারল না টুনি। অবশেষে বাইরে বেরিয়ে এল সে, চিঁড়ার বাসনটা তুলে নিয়ে ওর সামনে এসে বসল।
নাও, খাও।
কইলাম তো খামু না।
তাইলে কিন্তু পানির মধ্যে সব ফালাইয়া দিমু আমি। টুনি ভয় দেখাল ওকে।
মন্তু নির্বিকার গলায় বলল, দাও ফালাইয়া।
কিন্তু ফেলল না টুনি। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা শব্দ করে হেসে উঠল সে। হাসির দমকে মাথার ঘোমটাটা খসে পড়ল কাঁধের ওপর।
টুনি বলল, খাও। আমিও খাই। বলে এক মুঠো চিঁড়ে মুখের মধ্যে পুরে দিল সে।
মন্তুর মুখেও এক ঝলক হাসি জেগে উঠল। এতেঠক্ষণে টুনির কোলের ওপরে রাখা বাসন থেকে এক মুঠো চিঁড়ে নিয়ে সেও মুখে পুরল।
টুনি বলল, গুড় নাও। খাজুরি গুড়।
চিঁড়ে খেতে খেতে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সহজ হয়ে এল টুনি।
এক ফাঁকে ওকে জিজ্ঞেস করল, বাড়ি পৌঁছাইতে কতক্ষণ লাগবো?
মন্তু একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল, মাইজ রাতে।
বেশ জোরে দাঁড় বাইছিল মন্তু।
হঠাৎ টুনি বলল, এতেঠ তাড়াতাড়ি করতাছ কেন? আস্তে বাও না।
মন্তু বলল, তাইলে বাড়ি যাইতে তিন দিন লাগবো।
লাগে তো লাগুক না। টুনির কণ্ঠস্বরে চরম নির্লিপ্ততা।
মন্তু কোন জবাব দিল না।
আঁজলা ভরে নদীর পানি পান করল ওরা। তারপর ছইয়ের বাইরে বসে টুনি দুহাতে নদীর পানি নিয়ে খেলা করতে লাগল। দুপাশে অসংখ্য গ্রাম। একটার পর একটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। মাঝে মাঝে রবি-শস্যের ক্ষেত, নারকেল আর ঘন সুপারির বন।
জেলেদের পাড়া।
ছোঁ ছোঁ ডিঙি নৌকায় চড়ে মাঝ নদীতে এসে জাল ফেলেছে ওরা।
একখানা হাত পানির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে টুনি বলল, তুমি এইবার জিরাও। আমি দাঁড় টানি।
মন্তু হেসে বলল, পাগল নাকি?
টুনি বলল, ক্যান?
মন্তু বলল, অত সহজ না, দাঁড় বাইতে ক্ষেমতোটার দরকার আছে।
টুনি আবার চুপ করে গেল।

বিকেলের দিকে শান্তির হাটের কাছাকাছি এসে পৌঁছাল ওরা। নদী এখন দম ধরেছে। পানিতে আর সেই স্রোত নেই। একটা থমথমে ভাব। একটু পরে জোয়ার আসবে। তখন আর নৌকা নিয়ে এগোন যাবে না, কূলে এনে বেঁধে রাখতে হবে। তারপর জোয়ার নেমে গিয়ে ভাঁটা পড়লে তখন আবার নৌকা ছাড়বে মন্তু।

দূর থেকে শান্তির হাঁ দেখা যাচ্ছে। অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে সেখানে।

ওদিকে তাকিয়ে টুনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ওইহানে কি?

মন্তু বলল, ওইটা শান্তির হাঁ।

টুনি পানি থেকে হাতটা তুলে নিয়ে অপূর্ব ভঙ্গি করে বলল, ওইহানে চুড়ি পাওন যায়? আমারে কিন্না দিবা?

মন্তুর ইচ্ছে, জোয়ার আসার আগে শান্তির হাটে গিয়ে নৌকা ভিড়াবে। তাই সংক্ষেপে বলল, হুঁ দিমু।

শান্তির হাটে পৌঁছে, একটা নিরাপদ স্থান দেখে নৌকা বাঁধল মন্তু।

নদীর পাড়ে খালি জায়গাঁটায় তাঁবু পড়ছে একটা। বিচিত্র তার রঙ।

বাইরে ব্যান্ড পার্টি বাজছে খুব জোরে জোরে। চারপাশে লোকজনের ভিড়। হাটের কাছে আসার পর থেকে ছইয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে টুনি।

সেখান থেকে মুখ বের করে হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, ওইহানে কি?

মন্তু বলল, সার্কাস পার্টি। সার্কাস পার্টি আইছে।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে টুনি আবার বলল, সেইটা আবার কি।

মন্তু বলল, নানারকম খেলা দেহায় ওরা। মানুষের খেলা, বাঘের খেলা। আর কত কি! বাঘের নাম শুনে ভয় পেয়ে গেল টুনি। কিন্তু পরক্ষণেই বলল, আমারে দেহাইবা?

মন্তুর কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাটের মধ্যে মেয়ে মানুষ নিয়া যাওয়াঁটা সমীচীন মনে হল না ওর। তাই বলল, না, তোমার যাইয়া কাজ নাই। তুমি বহ, আমি আইতাছি। ওর চলে যাওয়ার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছইয়ের বাইরে এল টুনি। বলল, ওমা, আমি একলা থাকবার পারমু না এহানে। তুমি যাইও না।

মুহূর্তে নিরাশ হয়ে গেল মন্তু। ও নিজে এর আগে কোনদিন সার্কাস দেখেনি। ভেবেছিল এই সুযোগে একবার দেখে নেবে। কিন্তু টুনির কথায় ভেঙে পড়ল সে। সার্কাসের তাঁবুর দিকে চোখ পড়তেই দেখল শুধু পুরুষ নয়, অসংখ্য মেয়েছেলেও দলে দলে এসে ঢুকছে তাঁবুর মধ্যে।

মন্তু কি যেন ভাবল। ভেবে বলল, আহ, দেরি কইরো না, আহ।

ওর পিছু পিছু নিচে নেমে এল টুনি। মাথার ঘোমটাটা সে এক হাত লম্বা করে দিয়েছে। আর সেই ঘোমটার ভেতর দিয়ে বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে সে।

তাঁবুর সামনে বড় বড় দুটো হ্যাজাক জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। এক পাশে এক দল লোক ব্যান্ড বাজাচ্ছে।

তাঁবুর দরজার উপরে একটা মাচায় চড়ে দুটি মেয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে। সারা গায়ে মুখে নানারকমের রঙ মেখেছে ওরা। টুনি অবাক হয়ে বলল, ওমা সরম করে না।

মন্তু বলল, সরম করবে ক্যান, ওরা ম্যাইয়া লোক না, পুরুষ মানুষ মাইয়্যা সাজছে।

অ। হা করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল টুনি।

দরজায় দাঁড়ান লোকটার কাছ থেকে তিন আনা দামের দুখানা টিকেট কাঁল মন্তু। ভেতরে ঢুকে দেখে ছেলে বুড়ো মেয়েতে তিল ধারণের জায়গা নেই। তাঁবুর একটা কোণে অল্প একটু জায়গা নিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে পড়ল ওরা।

কিছুক্ষণের মধ্যে সার্কাস শুরু হয়ে গেল।

প্রথমে একটা মেয়ে দুটো লম্বা বাঁশের মাথায় বাঁধা একখানা দড়ির ওপর দিয়ে নির্বিকারভাবে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে হেঁটে চলে গেল।

দর্শকেরা হাতে তালি দিয়ে উঠল জোরে।

তারপর আসল বিকটাকার লোক। হাতের মুঠোর ওপরে তিনটে মানুষকে তুলে নিয়ে চরকির মতো ঘোরাতে লাগল সে।

সবাই একসঙ্গে বাহবা দিয়ে উঠল।

এরপারে খুব জোরে ব্যান্ড বাজাল কিছুক্ষণ।

তার পরেই এল বাঘ। এসেই একটা হুঙ্কার ছাড়ল সে।

টুনির দুচোখে অপরিসীম বিস্ময়। ঘোমটার ফাঁকে একবার চারপাশের দর্শকের দিকে তাকাল সে। তাকাল মন্তুর দিকে। তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নিল বাঘের ওপর।

সার্কাস শেষ হলে, দুজনের চমক ভাঙল।

ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। ঘাটে আবার পথে মনোয়ার হাজির চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে আসতে হয়। মন্তুকে দেখে হাজি দোকান থেকে চিৎকার করে উঠল, আরে মন্তু মিয়া কই যাও, শুন শুন।
মন্তু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল, পারল না।
আরে মিয়া কাজের কথা আছে শুইনা যাও। দুহাতে ওকে কাছে ডাকল মনোয়ার হাজি।
টুনি পেছনে দাঁড়িয়েছিল। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে দোকানের দিকে এগিয়ে গেল মন্তু। কাউন্টারে আরো অনেকগুলো লোক কথা বলছিল।
হঠাৎ মনোয়ার হাজি শব্দ করে হেসে ওঠে বলল, বাহরে বাহ বিবিজানেরে সঙ্গে নিয়া সার্কাস দেখবার আইছ বুঝি?
এই শীতেও ঘেমে ওঠেছে মন্তু। টুনির দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল, ও ভীষণ বিব্রত বোধ করছে।
ক্ষণকাল পরে মন্তু বলল, আরেকদিন আইসা আপনাগো বাড়ি মেহমান হমু। আইজকা যাই।
ওর আমন্ত্রণ রক্ষা না করার জন্যে কিছুক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করল মনোয়ার হাজি। অবশেষে বলল, আরেকদিন কিন্তুক আইবা মিয়া। বলতে বলতে টুনির দিকে তাকাল হাজি।
জোয়ার পড়ে যাওয়ায়, ভাঁটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। যেখানে নৌকাঁটা বেঁধে রেখে গিয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে ওটা। মাঝখানের জায়গাঁটা পানি আর কাদায় ভীষণ পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে। ওর ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে অতি সাবধানে আঙ্গুলের নখগুলো দিয়ে মাটি চেপে রাখতে হয়। নইলে যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিচে নামতে গিয়ে অন্ধকারে মন্তুর ফতুয়াঁটার একটি কোণ শক্ত করে ধরে রেখেছে টুনি। একটু অসতর্ক হতে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল সে। মন্তু ধরে ফেলল। মাথার আঁচলটা কাঁধের ওপরে গড়িয়ে পড়ল, একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করল টুনি। কাঁধের ওপর থেকে ওর মুখখানা সরিয়ে দিতে গিয়ে মন্তু সহসা অনুভব করল, টুনির দুচোখ দিয়ে পানি ঝরছে। নিঃশব্দে কাঁদছে টুনি।
ভাটি গাঙে নাও ভাসিয়ে দিয়ে নীরবে বসে রইল মন্তু। মনটা আজ ভীষণ ভেঙে পড়েছে ওর। সারা দেহে আশ্চর্য এক অবসাদ। সেদিন রাতে রসের কলসিটা ভেঙে ফেলল টুনি, তখনও এতেঠ খারাপ লাগে নি ওর। আজ কেমন ব্যথা অনুভব করছে সে। বুকের নিচটায়। কলজের মধ্যে।
নৌকার ছইয়ের ভেতরে চুপচাপ বসে রয়েছে টুনি। একটা কথা বলছে না সে, একটু হাসছে না।
হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরল মন্তু।

বন্ধুরে আশা ছিল মনে মনে .....

নদীর স্রোত নৌকোর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়ছে। যেন বহুদিনের এই স্নেহের টানকে চিরন্তন করে ধরে রাখার জন্যে প্রাণহীন কাঠের টুকরোগুলোকে গভীর আবেগে বারবার জড়িয়ে ধরতে চাইছে ওরা। টুনি এখনো নীরব।

শব্দার্থ ও টীকা

ছই – নৌকার ওপরে দেয়া অর্ধগোলাকার চাল বিশেষ। **পুঁটুলি** – বোঁচকা। **মাইজরাত** – মধ্যরাতে শব্দটির আঞ্চলিক রূপ। **জিরাও** – বিশ্রাম নাও। **ক্ষেমতোটা** – ক্ষমতোটা বা শক্তি। **দম ধরেছে** – নিশ্চল বা স্রোতহীন হয়ে পড়েছে। **সমীচীন** – উচিত। **নিরাশ** – আশাহীন। **বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে** – আশ্চর্য ও মুগ্ধতা মেশানো দৃষ্টিতে। **হ্যাজাক** – উজ্জ্বল আলোর বাতি। **সরম** – লজ্জা। **বিকটাকার** – অদ্ভুত আকার বিশিষ্ট। **অবসাদ** – ক্লান্তি, দুর্বলতা। **চিরন্তন** – চিরকালের বা চির দিনের।

বস্তুসংক্ষেপ

পরদিন ভোরে মন্তু আর টুনি রওনা দিল; খালপাড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল টুনির বাবা, চাচা আর তার ছোঁ দুই ভাইবোন। নৌকায় বসে যতদূর পর্যন্ত ওদেরকে দেখা গেল, পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল টুনি। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল নীরবে। আগের দিনের অভিমানের কারণে টুনি কোন কথা বলল না মন্তুর সঙ্গে। যদিও কথা বলার জন্য মন্তু আঁকুপাঁকু করছিল।
দুপুর হয়ে এলে টুনি মন্তুকে চিড়া খেয়ে নিতে বলে। কিন্তু মন্তু টুনিকে সাফ জানিয়ে দেয় সে না খেলে মন্তুর পক্ষেও খাওয়া সম্ভব নয়। এভাবে পারস্পরিক টানা পোড়েনের এক পর্যায়ে টুনি শব্দ করে হেসে ওঠে। যেন দুজনের মধ্যে অভিমানের যে মেঘ জমা হয়েছিল টুনির হাসির দমকে সে মেঘ কেটে গিয়ে দুজনের মধ্যকার আন্তরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে এলো।
শান্তির হাটে এসে নৌকা থামাল মন্তু। নদী এখন দম ধরে আছে। কিছুক্ষণ পর জোয়ার আসবে। জোয়ারের স্রোতে নৌকা চালানো যাবে না- অপেক্ষা করতে হবে ভাটি পর্যন্ত। তাই শান্তির হাটে নৌকা রেখে তারা সার্কাস দেখতে গেল। যদিও

টুনিকে সঙ্গে নিয়ে সার্কাস দেখতে মন্তুর কেমন লজ্জা লাগছিল। মন্তুর এই লজ্জা শতগুণ বেড়ে যায় সার্কাস দেখে ফেরার সময় মনোয়ার হাজি টুনিকে যখন মন্তুর স্ত্রী বলে মনে করে। মনোয়ার হাজি তাদের দুজনকেই চা খেয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানায়। মন্তু আরেকদিন হাজির মেহমান হবে এ কথা জানিয়ে কোন রকমে পালিয়ে বাঁচে যেন।

ঘাটে ফিরে এসে দেখে যেখানে নৌকা বেঁধে রেখে গিয়েছিল ভাঁটার পানি তার অনেক নিচে নেমে গেছে। ফলে কাদার মধ্যে সতর্কতার সঙ্গে মন্তুর ফতুয়া ধরে ধরে টুনি এগোতে থাকে নৌকার দিকে। হঠাৎ পা ফসকে পড়ে যেতে যেতে টুনি মন্তুকে জাপটে ধরে নিজেকে সামলে নেয়। আর মন্তু বুঝতে পারে টুনি নিঃশব্দে কাঁদছে। উদাস হয়ে যায় মন্তুর মন। নৌকা ছেড়ে দিয়ে নিজের ভেতরের কষ্টটাকে চাপ দেবার জন্য গলা ছেড়ে গান ধরে সে। নৌকা এগিয়ে চলে বাড়ির পথে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের বাম দিকে দেয়া প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান দিকে উত্তর লিখুন

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. মন্তু আর টুনি বাড়িতে আসবার জন্যে কখন রওনা দিয়েছিল?	
২. টুনিকে এগিয়ে দিতে খালপাড় পর্যন্ত কারা এসেছিল?	
৩. 'বেলা অইয়া গেছে খাইয়া নাও' - কে কাকে বলেছিল?	
৪. 'তাইলে কিন্তু পানির মধ্যে সব ফালাইয়া দিমু আমি। টুনি একথা বলে মন্তুকে ভয় দেখায় কেন? কি ফেলে দিতে চায় সে?	
৫. টুনি কেন মন্তুকে আস্তে নৌকা চালাতে বলেছিল?	
৬. শান্তির হাটে তারা নৌকা বেঁধেছিল কেন?	
৭. সার্কাসে ঢোকার জন্য মন্তু কত দামের টিকিট কিনেছিল?	
৮. 'আরেক দিন কিন্তু আইবা মিয়া'। - কে,কাকে বলেছিল?	
৯. ভাঁটার টানে মন্তুর নৌকা কোথায় চলে গিয়েছিল?	
১০. "বন্ধুরে আশা ছিল মনে মনে" গানটি কে গেয়েছিল?	

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. --------- এর মধ্যে টুনির জন্য --------- বিছিয়ে দিল মন্তু।
২. টুনি এতেঠক্ষণ --------- বলেনি। মন্তু সারাক্ষণ কথা বলার জন্য --------- করছিল।
৩. একটা কাপড়ের --------- থেকে কিছু চিড়া আর এক টুকরো --------- বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিল টুনি।
৪. --------- মাথার ঘোমটাটা খসে পড়ল ---------।
৫. মন্তুর মুখেও --------- হাসি জেগে উঠল।
৬. তারপর ছইয়ের বাইরে বসে টুনি দুহাতে --------- খেলা করতে লাগল।
৭. তুমি এইবার ---------। আমি --------- টানি।
৮. আর সেই ঘোমটার ভেতর দিয়ে --------- চারপাশে তাকিয়ে দেখছে সে।
৯. নদীর স্রোত নৌকোর গায়ে ছলাৎ শব্দে --------- ।
১০. যেন বহু দিনের এই স্নেহের টানকে --------- করে ধরে রাখার জন্যে --------- কাঠের টুকরোগুলোকে --------- বারবার জড়িয়ে ধরতে চাইছে ওরা।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। টুনিকে বিদায় জানানোর জন্যে খালপারে অন্যদের সঙ্গে এসেছিল-
ক. একটি কালো ছাগল
খ. টুনির পোষা বেড়াল
গ. একটা মেটে কুকুর
ঘ. ওদের কাল কুকুরটা

২। কখন টুনি মন্তুকে খাবার জন্য চিড়া গুড় দিয়েছিল?
ক. নৌকায় ওঠেই
খ. খানিকটা বেলা হলে
গ. দুপুর গড়িয়ে গেলে
ঘ. বিকেলবেলা

৩। মন্তুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টুনি কী করল?
ক. চিড়াগুলো পানিতে ফেলে দিল
খ. মন্তুর মুখে চিড়া তুলে দিল
গ. হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল
ঘ. হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে ফেলল

৪. নৌকা কখন বাড়িতে পৌঁছাবে বলে মন্তু টুনিকে জানিয়েছিল?
ক. পরদিন সকালে
খ. মাঝ রাতে
গ. সন্ধ্যার আগে
ঘ. সন্ধ্যার পরপর

৫. জোয়ারের সময় নৌকা চালানো যায় না কেন?
ক. নদীতে বড় বড় ঢেউ থাকে
খ. উজানে নৌকা নিয়ে যাওয়া যায় না
গ. ছোঁ নৌকা বলে ডুবে যায়
ঘ. অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

৬. মনোয়ার হাজির আমন্ত্রণের জবাবে মন্তু তাকে কী বলে?
ক. আরেক দিন আইসা আপনাগো বাড়ি মেহমান হমু
খ. আজ কাজ আছে, আরেক দিন আসমু
গ. আজ রাত হয়ে গিয়েছে দিনের বেলায় আসমু
ঘ. আপনার বাসায় যাইবার পারমু না

৭. শান্তির হাঁ থেকে কি কিনে দেবার জন্য আব্দার করেছিল টুনি?
ক. চুড়ি
খ. শাড়ি
গ. গহনা
ঘ. আলতা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মন্তু আর টুনির মান অভিমান কী করে সহজ হল তার বর্ণনা দিন।
২. মন্তু আর টুনি সার্কাসে কী কী দেখেছিল তার বর্ণনা দিন।
৩. সার্কাস দেখে ফেরার সময় টুনি কেঁদেছিল কেন? টুনি আর মন্তুর সে মুহূর্তের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিন।

উত্তরামালা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বাড়িতে আসবার জন্যে মন্তু আর টুনি খুব ভোরে রওনা দিয়েছিল।
২. টুনিকে এগিয়ে দেবার জন্য তার বাবা ও চাচা এসেছিল খালপাড় পর্যন্ত। আর তাদের সঙ্গে এসেছিল টুনির ছোঁ দুটো ভাইবোন।
৩. টুনি বলেছিল মন্তুকে।
৪. বারবার সাধাসাধির পরও যখন মন্তু খেতে চাইছিল না তখন টুনি একথা বলে মন্তুকে ভয় দেখায়। টুনি বাড়ি থেকে পথে খাবার জন্যে যে চিড়া ও গুড় এনেছিল সেগুলো ফেলে দিতে চায়।
৫. মন্তু বেশ জোরে বৈঠা চালাচ্ছিল যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছানো যায়। কিন্তু টুনি চায় তাদের এই নৌকার বহমান সময় আরো দীর্ঘ হোক। এজন্য সে মন্তুকে আস্তে নৌকা চালাতে বলেছিল।
৬. শান্তির হাটে পৌঁছেই নদীর দম ধরে থাকা অবস্থা দেখে মন্তু বুঝল কিছুক্ষণ পরই নদীতে জোয়ার আসবে। জোয়ারের সময় উজান ঠেলে কোনভাবেই এগোনো সম্ভব হবে না। তাই শান্তির হাটে মন্তু নৌকা বেঁধে সেখানেই ভাঁটার জন্য অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ ভেবেছিল। তা ছাড়া হাটে সার্কাস চলছিল সেটাও একবার মন্তু দেখে যেতে চাইছিল।

৭. একেকটি টিকেট তিন আনা করে- তারই দুখানা কিনেছিল মন্তু।
৮. মনোয়ার হাজি বলেছিল মন্তুকে।
৯. মন্তু নৌকা যেখানে বেঁধে রেখে গিয়েছিল ভাঁটার টানে সেখান থেকে অনেক দূর সরে গিয়েছিল।
১০. নৌকা ছেড়ে দিয়ে মন্তু এ গান গেয়েছিল।

শূন্যস্থান পূরণ

১. ছই, কাঁথাটা
২. একটা কথাও, আঁকুপাঁকু
৩. পুঁটুলি, খেজুরের গুড়
৪. হাসির দমকে, কাঁধের ওপর
৫. এক ঝলক
৬. নদীর পানি নিয়ে
৭. জিরাও, দাঁড়
৮. বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে
৯. আছড়ে পড়ছে
১০. চিরন্তন, প্রাণহীন, গভীর আবেগে

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ঘ ২. খ ৩. গ ৪. খ ৫. খ ৬. ক ৭. ক

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন : মন্তু আর টুনির মান অভিমান কী করে সহজ হল তার বর্ণনা দিন।

উত্তর : মন্তু টুনিকে নিতে আসায় টুনি খুব খুশি হয়েছিল। সে সুখে কিছু বলে নি বটে তবে তার চাপা হাসি তার খুশিকে প্রকাশ করছিল। টুনি মন্তুকে অন্তত তিন দিন তাদের বাড়িতে থাকতে হবে বলে জানিয়েছিল।

রাতেরবেলায় মন্তুকে ডেকে তুলে নিয়ে টুনি খেজুর গাছ থেকে রস নামিয়ে এনেছিল। ভেবেছিল তার এই নির্ভয়, নিরুদ্বেগ জীবনকে স্মরণীয় করে রাখবে মন্তুর নৌকায় গিয়ে রসের সিন্নি রান্না করে। কিন্তু মন্তু এতে তীব্র আপত্তি করায় টুনির সকল আনন্দের পরিকল্পনাই নিমিষে নিঃশেষ হয়ে যায়। টুনি রসের হাঁড়িটা মাটিতে ভেঙে ফেলে বাড়িতে ফিরে আসে।

পরদিন টুনিদের বাড়িতে মন্তু থাকল বটে কিন্তু টুনি একবারও মন্তুর সামনে এল না। কী এক দুর্জয় অভিমানে সে যেন অনড় হয়ে রইল। এ অবস্থাতেই মা-বাবার অনুরোধ উপেক্ষা করে টুনির ইচ্ছাতেই তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চলল মকবুল। কিন্তু নৌকাতে কোন কথাই মন্তুর সঙ্গে সে বলল না যদিও কথা বলার জন্যে মন্তু আঁকুপাঁকু করছিল।

একটু বেলা হলে মন্তুর খাবার জন্যে একটা পুঁটুলি থেকে চিড়া আর গুড় বের করে দেয় টুনি। মন্তু টুনিকেও খেতে বলে কিন্তু টুনি বলে যে তার ক্ষিদে নেই। মন্তু বুঝতে পারে এটা টুনির অভিমানের কথা। তাই সেও সাফ জানিয়ে দেয় টুনি না খেলে তার পক্ষেও খাওয়া সম্ভব নয়। অনেক সাধাসাধির পরও যখন মন্তু খেতে অস্বীকৃতি জানায় তখন সব খাবার পানিতে ফেলে দেবে বলে টুনি মন্তুকে ভয় দেখায়। এতেও যখন মন্তুর কোন ভাবান্তর হয় না তখন মন্তুর চোখের দিকে সস্থির সৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎই শব্দ করে হেসে ওঠে। এই হাসির মাধ্যমেই যেন দূর হয়ে যায় টুনির সকল অভিমান। মন্তুও যেন স্বাভাবিক হতে পারে। তাদের আনন্দপূর্ণ সম্পর্ক আবার সহজ হয়ে ওঠে।

৩। প্রশ্ন : সার্কাস দেখে ফেরার সময় টুনি কেঁদেছিল কেন? মন্তু আর টুনির সে মুহূর্তের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিন।

উত্তর : সার্কাস দেখে ফেরার সময় টুনির মনে নানা ধরনের ভাবের সঞ্চার হয়েছিল যা তাকে কাঁদতে বাধ্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে মকবুলের সঙ্গে টুনির দাম্পত্য সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না। কারণ দুটো অসম বয়স্ক নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্কে মনের ও মানসিকতার পার্থক্যের কারণেই সে সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারে না। ফলে প্রায় কৈশোর উত্তীর্ণ টুনি মন্তুকে তার সকল কর্মকাণ্ডের সহযাত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। তারা একসঙ্গে বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে শাপলা তুলতে যায়, অন্যের পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরে আনে। বাড়ির কোন কাজে টুনি মন্তুকেই সবচেই আপনজনভাবে মা-বাবাহীন মন্তুও টুনিকে সবচেয়ে কাছের মানুষ ভাবে। এ-জন্যে মন্তু টুনিকে আনতে গেলে বাড়ির অন্য সবার চেয়ে টুনিই খুশি হয় বেশি। কারণ এখানে সে ক'দিন সকল প্রকার দ্বিধা, ভয় বা সঙ্কোচের বাইরে মন্তুকে পাবে। তাকে নিজের মতো করে খাওয়াবে, নিয়ে যাবে এখানে

ওখানে। কিন্তু মন্তুর কঠোর আচরণে টুনির সে স্বপ্ন পূরণ হয় না। ফলে এক ধরনের অভিমান, অপূর্ণতাবোধ টুনির মনকে ভারী করে রেখেছিল।
সার্কাস দেখে ফেরার সময় টুনির কাছে বারবার মনে হতে থাকে সে আবার ফিরে যাচ্ছে এমন একটা জায়গায় যেখানে তার নিজস্ব বলে কিছু নেই। যে মন্তু তার এতেঠ আপনজন তাকেও আর এভাবে নির্ভয়ে, নির্দ্বন্দ্বে, দ্বিধাহীনভাবে পাবে না। দুটো দিন যে একটু মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিয়েছিল, স্বাধীনতার আনন্দে তার মনটা যে ভরে ছিল তার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে বেবে টুনি আকুল হয়ে ওঠেছিল। কান্না তার কোন বারনই আজ আর মানলো না।

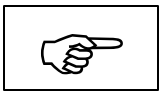

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ১০

উদ্দেশ্য
এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বাড়ি পৌঁছাতে মন্তু আর টুনির এতটা দেরি হল কেন তা বলতে পারবেন।

খালের মুখের কাছে নৌকা থামাতে হল।
ভাঁটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। পাতা পানিতে নৌকা নিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে না। এখানে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না আবার জোয়ার আসে। জোয়ারের স্রোতে নৌকা নিয়ে ভেতরে চলে যাবে মন্তু। কিন্তু সে এখনো অনেক দেরি। ভোর রাতের আগে জোয়ার আসবে না।।
নৌকা থামাতে দেখে টুনি এতেঠক্ষণে কথা বলল, কি, নাও থামাইলা ক্যান?
হঠাৎ নিজের অজান্তে একটা কথা বলে বসল মন্তু। বলল, বাড়ি যামু না। এইহানে থাকুম আমরা।
ক্যান? ক্যান? টুনির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।
শুনে শব্দ করে হেসে উঠল মন্তু। ওর হাঁসিটা কাঁটা বাঁশের বাঁশির মতো শোনাল। নৌকা থেকে নোঙরটা নিয়ে নিচে নেমে গেল মন্তু। ভাল করে মাটিতে পাতল ওটা। নইলে জোয়ারের প্রথম ধাক্কায় মাঝ নদীতে যাওয়ার ভয় আছে। তারপর পা জোড়া ধুয়ে নিয়ে নৌকায় উঠতে উঠতে টুনির প্রশ্নের উত্তর দিল মন্তু।
জোয়ার না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে ওদের।
এইহানে? বলতে গিয়ে চারপাশে তাকাল টুনি।
আশেপাশে কোন জনবসতি নেই। দক্ষিণে যতদূর তাকানো যায় অথই পানির ঢেউ। নদী এখানে বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে সাগরের দিকে। কয়েকটি জেলে নৌকা মাঝ নদীতে টিমটিম বাতি জ্বালিয়ে জলে পাহারা দিচ্ছে।
মাঝে মাঝে একে অন্যকে জোর গলায় ডাকছে ওরা। নিশীর বাপ জাইগা আছনি, ও নিশীর বাপরে কুই কুই।
পশ্চিমে চর পড়েছে। বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়ে কোন লোকালয় নেই। শুধু বালু আর বালু। তার ওপরে আরো এগিয়ে গেলে সীমাহীন বুনো ঘাসের বন। দিনের বেলায় অসংখ্য গরু বাছুর নিয়ে রাখাল ছেলেরা আসে এখানে, রাতে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে থাকে সমস্ত প্রান্তর। পূবে, ফেলে আসা নদী এঁকে-বেঁকে চলে গেছে শান্তির হাটের দিকে।
উত্তরে খাল। খালের পারে অসংখ্য বুনো ফুলের বন। একটু ভালো করে তাকালে ওপারে তৈরী লম্বা সাঁকোঁটা নজরে আসে এখান থেকে। চারপাশে এক পলক তাকিয়ে চুপ করে গেল টুনি।
ও মাঝি। মাঝি- ও কু-ই। জেলে নৌকো থেকে কে যেন ডাকল, কোন হানের নাও, অ্যাঁ?
গলায় চড়িয়ে মন্তু জবাব দিল, পরীর দিঘি।
জবাব শুনে চুপ করে গেল জেলেটা।
এতেঠক্ষণ নৌকো বেয়ে আসছিল বলে শীতের মাত্রাঁটা বুঝে উঠতে পারে নি মন্তু। তাড়াতাড়ি ছইয়ের মধ্যে এসে ঢুকল সে। টুনি নড়েচড়ে এক পাশে সরে গেল।
ছইয়ের সঙ্গে ঝোলান হুকো আর কল্কেটা নামিয়ে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এক ছিলিম তামাক ধরিয়ে নিল মন্তু তারপর আবার বাইরে বেরিয়ে এসে গলুইয়ের উপর আরাম করে বসে তামাক টানতে লাগল।

দক্ষিণ থেকে কনকনে বাতাস বইছে জোরে।
আকাশে মেঘ।
মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদ মাঝে মাঝে উকি দিয়ে আবার লুকাচ্ছে তাড়াতাড়ি।
টুনি ডাকল, ওইহানে বইসা ক্যান, ভেতরে আহ।
মন্তু কোন জবাব দিল না। আপন মনে হুঁকো টানতে লাগল সে।
টুনি আবার ডাকল, আহ না, বাইরে ঠাণ্ডা লাগবো।
মন্তু নীরব।
আইবা না? টুনির কণ্ঠে অভিমান।
বাইরে বেরিয়ে এসে ওর হাত থেকে হুঁকোঁটা নিল টুনি। চল, ভেতরে গিয়া শুইবা। এবার আর কোন বাধা দিল না। নিঃশব্দে ছইয়ের ভেতর গিয়া শুয়ে পড়ল সে। ওর গায়ের উপর কাঁথাঁটা টেনে দিয়ে মাথার কাছে চুপচাপ বসে রইল টুনি।
বাইরে কনকনে বাতাস শূন্য প্রান্তরের উপর দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে দূর থেকে দূরে। সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে বসে রইল।
ভোরে গ্রামে এসে পৌঁছাল ওরা।
মন্তু আর টুনি।
পরীর দিঘির পাড়ে তিনটে নতুন কবর।
দূর থেকে দেখে বুক কেঁপে উঠল তার। নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, কে মরল?
ঘোমটার নিচে থেকে টুনিও চোখ বড় বড় করে দেখছিল কবরগুলো। পথে আসতে মাঝি-বাড়ির কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা হতে সব শুনলো মন্তু। প্রথম কবরটা এ গাঁয়ের তোরাব আলীর। আশির উপরে বয়স হয়েছিল ওর। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে চলাফেরা করতে পারত না। মরে বেঁচেছে বেচারা। নইলে আরো কষ্ট সহ্য করতে হত।
দ্বিতীয় কবরটা আসকর ফকিরের। পেটে পিলে হয়েছিল। প্রায়ই রক্তবমি করত। বুড়োরা বলত, শত্রুপক্ষ কেউ নিশ্চয় তাবিজ করেছে, নইলে অমন হবে কেন।
তার পাশের কবরটা হালিমার। আবুলের বউ হালিমা। গতকাল দুপুরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ চিতল মাছের মতো তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে হালিমা।
মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল মন্তুর।
হালিমার মৃত্যুর সংবাদে কাঁদতে শুরু করেছে টুনি। ঘোমটার নিচে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। ইতস্তত: করে মন্তু বলল, কান্দ ক্যান, কাইন্দা কি অইবে।
বাড়ি ফিরে এলে বুড়ো মকবুল গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করল একদিন নয়, দুদিন নয়, চার চারটে দিন।
দুশ্চিন্তায় বারবার ঘর-বার করেছে সে। আইতে এতেঠ দেরি অইলো ক্যান? অ্যাঁ।
মন্তু খুলে বলল সব। কুটুম বাড়িতে গিয়ে কুটুম যদি আসতে না দেয় তাহলে কি করতে পারে সে? তাছাড়া নদীতে যে জোয়ার ভাঁটা আসে সেটাও কারো ইচ্ছেমতো চলে না। তাই আসতে দেরি হয়ে গেছে ওদের। মকবুল শুনলো সব, শুনে শান্ত হলো। তারপর কোদালটা হাতে তুলে নিয়ে বাড়ি উপরের ক্ষেতটার দিকে চলে গেল, সে। যাবার পথে আমেনা আর ফাতেমাকে ডেকে গেল মকবুল। মাটি কুপিয়ে সমান করে মরিচের চারা লাগাতে হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাতা পানি – সামান্য পানি, পায়ের পাতা ডোবে এতেঠটুকু পরিমাণ পানি। **জনবসতি** – লোকজনের বসবাস। **লোকালয়** – বাড়ি ঘর। **বিস্তীর্ণ** – দীর্ঘ। **নিস্তব্ধ নিঝুম** – কোন প্রকার সাড়াশব্দহীন। **প্রান্তর** – বড় মাঠ। **একছিলিম** – এক টিপ। **অপলক** – পলকহীনভাবে। **পিলে** – এক ধরনের রোগ, টিউমার। **গভীর অসন্তোষ** – খুব মনঃক্ষুণ্ন, প্রবল বিরক্তি।

বস্তুসংক্ষেপ

নদীপথ শেষ করে গ্রামে ঢোকার মুখে যে খাল সেখানে এসে মন্তু দেখে যে জোয়ারের পানি নেমে গিয়ে খালে কাদা জমে আছে। যতটুকু পানি আছে তার সাহায্যে নৌকা টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে আবার জোয়ার আসা পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। আর সে জোয়ারও শেষ রাতের আগে আসবে না।

জোয়ারের অপেক্ষায় যেখানে নৌকা বাঁধল মন্তু তার আশেপাশে লোকজনের বসবাস নেই। দক্ষিণে তাকালে চোখে পড়ে নদীর পানি। পশ্চিমে চর পড়েছে কিন্তু সেখানে কেবল বালি আর বালি। পুবের দিকে তাকালে দেখা যায় তাদের ফেলে আসা শান্তির হাটের পথ। আর উত্তরের দিকে খাল। ঐ খাল দিয়েই তাদেরকে গ্রামে ঢুকতে হবে।

ভাল করে নোঙর ফেলে মন্তু এক ছিলিম তামাক ধরিয়ে গলুইয়ে বসে টানতে থাকে। তামাক খাওয়া শেষ হলে বাইরের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য টুনির অনুরোধে সে নৌকার ছইয়ের নিচে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ওর গায়ে কাঁথাটা টেনে নিয়ে মাথার কাছে চুপচাপ বসে রইল টুনি। আর বাইরে তখন শূন্য প্রান্তরের ওপর দিয়ে হু-হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

ভোরের দিকে গ্রামে পৌঁছুল টুনি আর মন্তু। গ্রামে ঢুকেই পরীর দিঘির পারে তিনটে নতুন কবর দেখল তারা। তার মধ্যে একটা আবুলের বৌ হালিমার। গতকাল দুপুরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ করেই তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে সে। হালিমার মৃত্যু সংবাদ শুনে টুনি কাঁদল।

বাড়ি ফিরে পড়ল মকবুলের অসন্তোষের মুখে। দুদিনের জায়গায় নবীনগর থেকে ফিরতে মন্তুর চারদিন লেগেছে এজন্য মকবুল বিরক্ত। পরে অবশ্য নদীর জোয়ার-ভাঁটা আর আত্মীয় বাড়ির অনুরোধের কথা শুনে মকবুল শান্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের বাম দিকে দেয়া প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান দিকে উত্তর লিখুন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. মন্তু খালপাড়ে নৌকা নোঙর করে কেন?	
২. মন্তু যেখানে নোঙর করেছিল তার পূর্ব দিকে কী ছিল?	
৩. খালের পারে কী ছিল?	
৪. মন্তু এতেক্ষণ শীতের প্রকোপ বুঝতে পারেনি কেন?	
৫. মন্তুর হুঁকোটা কোথায় ছিল?	
৬. কতটা তামাক ধরিয়েছিল মন্তু?	
৭. কোন দিক থেকে কনকনে শীতের বাতাস বইছিল?	
৮. মন্তু ছইয়ের মধ্যে শুয়ে পড়লে টুনি কী করল?	
৯. কখন মন্তু আর টুনি গ্রামে এসে পৌঁছেছিল?	
১০. পরীর দিঘির পাড়ের নতুন কবরগুলো কাদের?	

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মন্তু শক্ত করে নোঙর বেঁধেছিল কেন?
   ক. খালের মুখে স্রোত ছিল বলে
   খ. জোয়ারের ধাক্কায় নৌকা মাঝ নদীতে চলে যেতে পারে
   গ. ভাঁটার টানে নৌকা তীরে এসে ঠেকবে বলে

ঘ. চোর ডাকাতের ভয়ে

২. কখন জোয়ার আসবে বলে মন্তু ভেবেছিল?
ক. সন্ধ্যারাতে খ. মাঝ রাতে
গ. ভোররাতে ঘ. পরদিন সকালে

৩. খালের আশেপাশে কী ছিল না?
ক. জনবসতি খ. খাবার পানি
গ. লোকসমাগম ঘ. অন্য নৌকা

৪. খালের পশ্চিম পারে কী ছিল?
ক. চর খ. বুনো ফুলের গাছ
গ. কাশবন ঘ. বিস্তীর্ণ লোকালয়

৫. রাখাল ছেলেরা দিনের বেলায় কোথায় গরু চরাতে আসে?
ক. খালের উত্তর পাশের মাঠে খ. খালের পশ্চিম দিকের বুনো ঘাসের বনে
গ. খালের পশ্চিমের মাঠে ঘ. খালের পাড় ঘেঁষে গজিয়ে ওঠা ঘাস বনে

৬. কোথায় বসে মন্তু তামাক টানছিল?
ক. ছইয়ের মধ্যে বসে খ. ছইয়ের গায়ে হেলান দিয়ে
গ. গলুইয়ের ওপর বসে ঘ. ছইয়ের উপর বসে

৭. নবীনগর থেকে ফিরতে মন্তুর কয় দিন সময় লেগেছিল?
ক. একদিন খ. দুই দিন
গ. তিন দিন ঘ. চার দিন

৮. 'ওইহানে বইসা ক্যান, ভেতরে আহ'। - কে, কাকে বলেছিল?
ক. টুনি বলেছিল, মকবুল কে খ. মকবুল বলেছিল, টুনিকে
গ. মন্তু বলেছিল, টুনিকে ঘ. টুনি বলেছিল, মন্তুকে

৯. কার মৃত্যুর খবরে টুনি কেঁদেছিল?
ক. হালিমার খ. তোরাব আলীর
গ. আসকর ফকিরের ঘ. আবুলের

১০. মন্তুর নবীনগর থেকে ফিরতে দেরি হয়েছিল কেন?
ক. টুনিদের বাড়ির লোকজন তাকে আসতে দেয়নি
খ. মন্তু ইচ্ছে করে দেরি করেছিল
গ. নদীর জোয়ার ভাঁটার কারণে পথে দেরি হয়েছে
ঘ. ক ও গ দুটোই

ব্যাখ্যা লিখুন

১. গতকাল দুপুরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ চিতল মাছের মতো তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে হালিমা।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাড়ি পৌঁছাতে মন্তু আর টুনির এতেঠটা বিলম্ব কেন হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করুন।
২. খালপাড়ে যেখানে মন্তু নৌকা বেঁধেছিল তার চারপাশের পরিবেশের বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ভাঁটার টানে খালের পানি নিচে নেমে গেছে তাই পাতা পানিতে নৌকা টেনে নেয়া সম্ভব নয় বলে মন্তু খালপাড়ে নৌকা নোঙর করেছিল।
২. পূর্ব দিকে ছিল শান্তির হাটে যাবার নদীপথ।

৩. খালের পাড়ে ছিল অসংখ্য বুনো ফুলের বন।
৪. এতক্ষণ মন্তু নৌকা বেয়ে আসছিল বলে শীতের প্রকোপ বুঝতে পারে নি।
৫. মন্তুর হুঁকোঁটা নৌকার ছইয়ের সঙ্গে ঝোলান ছিল।
৬. মন্তু এক ছিলিম তামাক ধরিয়েছিল।
৭. দক্ষিণ দিক থেকে কনকনে শীতের বাতাস বইছিল।
৮. মন্তু ছইয়ের মধ্যে শুয়ে পড়লে টুনি তার মাথার কাছে বসে দূরের শূন্য প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রইল।
৯. ভোরে ভোরে গ্রামে এসে পৌঁছেছিল মন্তু আর টুনি।
১০. গ্রামে ঢুকে মন্তু আর টুনি পরীর দিঘির পাড়ে তিনটে নতুন কবর দেখে। তার মধ্যে প্রথমটা তোরাব আলীর। দ্বিতীয়টি আসকর ফকিরের আর তৃতীয়টি আবুলের বৌ হালিমার।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. খ, ২. গ ৩. ক ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. ঘ ৮. ঘ ৯. ক ১০. ঘ

ব্যাখ্যা উত্তর

১. গতকাল দুপুরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ চিতল মাছের মতো তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে হালিমা।

জহির রায়হানের অনবদ্য উপন্যাস 'হাজার বছর ধরে' হতে এ অংশটুকু গৃহীত। এখানে লেখক আবুলের বৌ হালিমার মৃত্যুকালীন যন্ত্রণাকে একটি অসাধারণ উপমার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন।

মকবুলের বাড়ির আঁঘর বাসিন্দার মধ্যে আবুলই হচ্ছে মকবুলের সবচেয়ে অপছন্দের লোক। কারণ সে কথায় কথায় বৌ পেটায়। মারতে মারতে এর আগে সে দুটো বউকে খুন করে ফেলেছে। হালিমা তার তৃতীয় স্ত্রী। তার আগের বউ আয়েশাকেও সে এমনভাবে মেরেছিল যে রক্তবমি করতে করতে মারা গেছে। হালিমাকেও সে কারণে অকারণে প্রতিদিনই নির্যাতন করে। বাড়ির সবাই তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন লাভ হয় না। বউকে মেরে আবুল যেন একটা পৈশাচিক আনন্দ পায়। হালিমাকেও তেমনি মারধোর করতে করতে হয়তো শরীরের ভেতরে কোন অদৃশ্য ক্ষত সে তৈরি করে দিয়েছিল। ফলে সবার চোখের সমানে, দিনের বেলায় বিনা চিকিৎসায় হালিমা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মারা গেছে। হালিমা জীবনকে ভালবাসতো, ফলে পৃথিবীর প্রতি আস্থা হারিয়ে সে বার চারেক আত্মহত্যা করতে গিয়েও ফিরে এসেছিল। সে বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু আবুলের মতো মানুষরূপী পশু তাকে বাঁচতে দিল না।

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ১ : বাড়ি পৌঁছাতে মন্তু আর টুনির এতেঠটা বিলম্ব কেন হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : মন্তু নবীনগর গিয়ে পৌঁছেছিল সন্ধ্যা বেলা। রাতে খাবার সময় সে বাড়ির সবাইকে বলেছিল পরদিন ভোরেই সে টুনিকে সঙ্গে করে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু টুনি তাকে জানায় অন্তত তিন দিন তাকে বেড়াতে হবে নবীনগরে। টুনির মা-ও মন্তুকে দুএক দিন থেকে যেতে বলেন। তিনি বলেন, কুটুম বাড়ি লোকে আসে নিজের ইচ্ছায় যায় পরের ইচ্ছায়। অবশ্য টুনির কারণেই মন্তু একদিন পর রওনা দিতে পারে, টুনিই মন্তুর ওপর অভিমান করে নবীনগরে আর থাকে না। কিন্তু নদীপথে তাদের বারবার নৌকা থামাতে হয়। প্রথমবার মন্তুকে নৌকা থামাতে হয় শান্তির হাটে। নদীতে জোয়ার আসবে একটু পর, উজান ঠেলে নৌকা চালান যাবে না বলে মন্তু শান্তির হাটে নোঙর করে। সেখানে টুনিকে নিয়ে সে সার্কাস দেখতে যায়। তারপর জোয়ার শেষ হয়ে ভাঁটা শুরু হলে আবার মন্তু নৌকা ছাড়ে। কিন্তু নদী ছেড়ে গ্রামে ঢোকার খালের মুখে সে আবার আঁকা পড়ে। ভাঁটার টানে খালের পানি একেবারে নিচে নেমে গেছে। ফলে ঐখানে তাদের অপেক্ষা করতে হয় ভোর রাত পর্যন্ত। কারণ ভোররাতে জোয়ার এলে তবে সে গ্রামে ঢুকতে পারবে। এসকল নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে মন্তুর নবীনগর থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ১১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- হিরনের বিয়ের সময়কার আনন্দঘন পরিবেশের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- বিয়েকে কেন্দ্র করে গ্রামে যে সব লৌকিক আচার অনুষ্ঠান হয় তার পরিচয় দিতে পারবেন।

দেখতে না দেখতে হীরনের বিয়ের দিনটা ঘনিয়ে এল।
একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাই আয়োজনের কোন কার্পণ্য করে নি বুড়ো মকবুল। সাড়ে আঁ টাকা দাম দিয়ে একটা ছাগল কিনেছে সে। হাঁ থেকে চিকন চাল কিনে এনেছে আর আধ সের ঘি।
মিয়া বাড়ি থেকে কয়েকটা চিনেমাটির পেয়ালা আর বরতন ধার নিয়ে এল আমেনা। বরপক্ষের লোক মাটির বাসনে খেতে দিলে ফিরে গিয়ে হয়তো বদনাম করবে ওরা, তাই।
বুড়ো মকবুলের শরীরটা ভাল নেই। চারদিকে ছুটাছুটি করবে সে- শক্তি পাচ্ছে না সে। তাই বাড়ির অন্য সবার ওপরে বিভিন্ন কাজের ভার দিয়েছে। সুরত আলী, রশীদ, আবুল, মন্তু সবাই ব্যস্ত। বুড়ো শুধু দাওয়ায় একখানা পিঁড়ির উপর বসে তদারক করছে সব। খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ভূঁইয়া বাড়ির গড়ের পাশে বড় মেহেদি গাছ থেকে মেহেদি তুলতে গেছে সালেহা আর ফকিরের মা।
আমেনা আর ফাতেমা, ঘরদোরগুলো লেপে মুছে ঠিক করে নিচ্ছে।
পুরো ওঠোনটাকে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করে তুলছে ওরা।
টুনি পুকুর ঘাটে বাসনপত্রগুলো মাজছে।
যার বিয়ে, সেই হীরন রসুই ঘরের দাওয়ায় চুপটি করে বসে রয়েছে আর অবাক হয়ে বারবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে সবার।
দুপুর রাতে পাড়াপড়শীরা অনেকে এল। কাচ্চাবাচ্চা ছেলেমেয়েদের দল। দুখানা বড় বড় চাঁটাই বিছিয়ে নিয়ে, ওঠোনে বসল ওরা। তারপর সবাই একসঙ্গে করে গান ধরল—

মেহেদি তোমরা লাগ কোন কাজে।
আমরা লাগী দুলহা কইন্যারে সাজে।

ঢেঁকির উপরে তখন আম্বিয়াও গান ধরেছে। বিয়ের ধান ভানতে এসেছে সে। সন্ধ্যা থেকে ঢেঁকির ওপরে ওঠেছে ও আর টুনি। তখন থেকে এক মুহূর্তের বিরাম নেই। ওঠোনে মেয়েরা গান গাইছিল। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার জন্যে টুনি আর আম্বিয়া দুজনে গলা ছেড়ে গান ধরল।

ভাঁটুইরে না দিয়ো কলা
ভাঁটুইর হইবে লম্বা গলা।
সর্ব লইক্ষণ কাম চিক্কন পঞ্চ রঙের ভুঁইরে।

সহসা শব্দ করে হেসে উঠল বুড়ো মকবুল। ওর মনটা খুশিতে ভরে ওঠেছে আজ। জোরে জোরে হুঁকো টানছে আর চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে।
হীরনকে মাঝখানে বসিয়ে ওর হাতে মেহেদি দিচ্ছে সবাই। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে চুপ করে আছে মেয়েটা।
সুরতের ছেলেমেয়ে, কুদ্দুস, পুটি, বিস্তি ওরা হাতে মেহেদি দেবার জন্যে কাঁদাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ওদের ধমকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল সালেহা।
মকবুল বলল, আহা তাড়াও ক্যান বউ। একটুখানি মেহেদি ওগোও দাও না।
হঠাৎ ফকিরের মা নাচতে শুরু করল। আঁচল দুলিয়ে, ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল সে।

কই গেলা সুরতের বিবি আমার কথা শোন।
আবের পাক্ষা হাতে করি আউলাইয়া বাতাস কর।
ফুলের পাখা হাতে নিয়া জোরে বাতাস কর।

ওর নাচ দেখে ছেলে বুড়ো সবাই শব্দ করে হেসে উঠলো একসঙ্গে।
ধান ভানা বন্ধ করে টুনি আর আম্বিয়াও বাইরে বেরিয়ে এল।
আম্বিয়াকে আসতে দেখে নাচ থামিয়ে তার দিকে দৌড়ে এল ফকিরের মা, হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল দলের মাঝখানে। তারপর ওকে লক্ষ করে ফকিরের মা গান ধরল।
দৌড়ে গিয়ে মন্তুর ঘরের মধ্যে ঢুকে দুয়ারে খিল দিল আম্বিয়া। সালেহা হেসে বলল, কিরে আম্বিয়া, এতেঠ ঘর থাকতে শেষে আমাগো মন্তু মিয়ার ঘরে ঢুইকা খিল দিলি।
মন্তু তখন ওঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওকে দেখে গ্রামের রসুর নানী তার ফোকলা দাঁত বের করে একগাল হেসে বলল, কি মিয়া ডুইবা ডুইবা পানি খাও। ঘরে গিয়া দেহ কইন্যা তোমার ঘরে গিয়া খিল দিছে।
মন্তু কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ টুনির কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সবাই।
তীব্র গলায় সে বলল, কি অইতাছে অ্যাঁ? কি অইতাছে। কাম কাজ ফালাইয়া কি শুরু করছ তোমরা। অ্যাঁ?
সহসা সবাই চুপ করে গেল। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। টুনি ততক্ষণে রসুই ঘরের দিকে চলে গেছে।
মন্তু নির্বাক।
দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে আম্বিয়া। তার চোখমুখ পাকা লঙ্কার মতো লাল। চিবুক আর গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে ওর।
কিছুক্ষণের জন্যে সবাই যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। একটু আগেকার সেই আনন্দ উচ্ছল পরিবেশটা আর এখন নেই।
ফকিরের মা বিড় বিড় করে বলল, এমন কি কইরছি যে রাগ দেহান লাগছে। বিয়া বাড়ির মধ্যেই হৈ-চৈ না কইরা কি কান্দাকাটি করমু? সালেহা বলল, আমরা না অয় মন্তু মিয়া আর আম্বিয়ারে নিয়া একটু খানি ঠাট্টা মস্করা কইরতাছিলাম, তাতে টুনি বিবির এতেঠ জ্বলন লাগে ক্যান। ওর কথা শেষ না হতে ঝড়ের বেগে রসুই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল টুনি।
কি কইলা অ্যাঁ, কি কইলা অ্যাঁ? চুলগুলো বাতাসে উড়ছে ওর। চোখজোড়া জ্বলছে। সালেহা সঙ্গে সঙ্গে বলল, যা কইবার তা কইছি, তোমার এতেঠ পোড়া লাগে ক্যান। বলে মুখ ভ্যাংচাল সে।
পরক্ষণে একটা অবাক কাণ্ড করে বসল টুনি। সালেহার চুলের গোছাঁটা ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে মাটিতে ফেলে দিল সে। তারপর চোখেমুখে কয়েকটা এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মেরে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল টুনি। ঘটনার আকস্মিকতা কেটে যেতে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সালেহা। মনে হল এ মুহূর্তে ওর মা মারা গেছে। কান্না শুনে এঘর ওঘর থেকে বেরিয়ে এলো অনেকে।
মকবুল দাওয়া থেকে চিৎকার করে উঠল, কিরে কি অইলো অ্যাঁ। কি অইলো।
রশীদ, সুরত সবাই ছুটে এল সেখানে।
রশীদ বললে, কি কান্দবি না কইবি কিছু, কি অইছে? সালেহা কোন জবাব দিল না।
ফকিরের মা বুঝিয়ে বলল সব।
সালেহার কোন দোষ নেই। আম্বিয়া আর মন্তুকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল ওরা। টুনি বেরিয়ে এসে হঠাৎ সালেহাকে মেরেছে।
মাইরছে। মাইরছে ক্যান? রশীদ ক্ষেপে উঠল।
ওকে রাগতে দেখে আরো জোরে কান্না জুড়ে দিল সালেহা।
বুড়ো মকবুল বিব্রত বোধ করল। ইতস্তত করে বলল, মন্তু আর আম্বিয়া কই গেছে? মন্তুকে ঘরের দাওয়াতে বসে থাকতে দেখা গেল। কিন্তু আম্বিয়াকে পাওয়া গেল না সেখানে। এই গন্ডগোলের মধ্যে নীরবে এখান থেকে সরে পড়েছে সে।
ফকিরের মা বলল, ওগো কোন দোষ নাই।
কি ভেবে বুড়ো মকবুল একেবারে শান্ত হয়ে গেল। আস্তে করে বলল, তোমরা হৈ-চৈ কইরো না। বিয়ার সময় এইসব ভাল না। যা অইছে তার বিচার আমি করমু। খাঁচি বিচার করমু আমি। বলে দাওয়ার দিকে চলে গেল সে। তারপর হুঁকোঁটা হাতে তুলে নিয়ে আবার বলল, কই তোমরা চুপ কইরা রইলা ক্যান, গীত গাও, হ্যাঁ গীত গাও। ছেলে-বুড়োরা আবার হৈচৈ করে উঠল।
ফকিরের মা আবার গান ধরল।
এক বাঁটা পান এনে ওদের সামনে নামিয়ে রেখে গেল আমেনা। বলল, খাও। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরনো আবেশটা ফিরে এল আবার। ফকিরের মা নাচতে শুরু করল।
বিয়ের জন্যে কিনে আনা ছাগলটা ঘরের পেছনে বেঁবে করে ডাকছে। চোখের কোণজোড়া পানিতে ভিজে ওঠেছে ওর।
ভোর রাত পর্যন্ত কেউ ঘুমাল না।
তারপর একজন দুজন করে যে যার ঘরে চলে যেতে লাগল। মন্তু সবে তার ঝাঁপিটা বন্ধ করে দেবে এমন সময় বাইরে থেকে ধাক্কা দিল টুনি। ও কিছু বলার আগে ভেতরে এসে ঢুকল সে। পান খেয়ে ঠোঁটজোড়া লাল করে এসেছে। মুখে একটা প্রসন্ন হাসি, হাতে মেহেদি। সঙ্গে মাটির বাটিতে করে আরো কিছু মেহেদি এনেছে সে।
বাটিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে টুনি আস্তে করে বলল, দেহি তোমার হাত দেহি।
মন্তু বলল, ক্যান?
টুনি বলল, তোমারে মেহেদি দিমু।
মন্তু বলল, না।

টুনি বলল, না ক্যান, বলে ওর হাতটা টেনে নিল সে। মাটিতে বসে ধীরে ধীরে ওর হাতে মেহেদি পরিয়ে দিতে লাগল টুনি। মন্তু কোন বাধা দিল না। নীরবে বসে শুধু তাকে লক্ষ করে মৃদু হাসল। কিছুক্ষণ পরে টুনি আবার বলল, আমার একটা কথা রাইখবা?
কি?
একডা বিয়া কর।
হুঁ।
দুজনে আবার চুপ করে গেল ওরা।
ওর দুহাতের তালুতে সুন্দর করে মেহেদি পরিয়ে দিতে দিতে টুনি আবার বলল, আরেকডা কথা রাইখবা?
কি?
আমার পছন্দ ছাড়া বিয়া কইরবা না।
হুঁ। একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো মন্তু। টুনি পরক্ষণে ওর হাতটা কোলের ওপরে টেনে নিয়ে ছোঁ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কথা দিলা? বলে অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকাল টুনি। মন্তু কি বলবে ভেবে পেল না। বার কয়েক ঢোক গিলল সে।
তারপর হঠাৎ করে বলল, শাপলা তুলতে যাইবা?
মৃদু হেসে মাথা নাড়াল টুনি। না।
তাইলে চল, মাছ ধরি গিয়া।
টুনি আরো জোরে মাথা নাড়াল, না।
না ক্যান? মন্তুর কণ্ঠে ধমকের সুর।
টুনি হেসে বলল, লোকে দেইখা ফেলাইলে কেলেঙ্কারি বাধাইবো। বলে ওঠে দাঁড়াল সে। মন্তুকে কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়ে পরক্ষণে সেখান থেকে চলে গেল টুনি।

শব্দার্থ ও টীকা

ঘনিয়ে এল – কাছাকাছি এসে পড়ল। **কার্পণ্য** – কৃপণতা। **পেয়ালা** – বাটি। **বরতন** – থালা। **গড়** – বড় মাঠ। **আব** – পানি। **খিল দিল** – কপাঁ বন্ধ করল। **পাকা লঙ্কা** – লাল মরিচ। **চিবুক** – কপোল। **ঠাট্টা মস্করা** – হাসি ঠাট্টা। **হ্যাঁচকাঁটানে** – সজোরে টান দেয়া। **ঘটনার আকস্মিকতা** – হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার ঘোর। **পরক্ষণে** – পর মুহূর্তে। **কেলেঙ্কারি বাধাইবো** – সকলে বদনাম করবে।

বস্তুসংক্ষেপ

হীরনের বিয়ের দিন ঘনিয়ে এল। এ বিয়েকে কেন্দ্র করে বুড়ো মকবুলের বাড়িতে একটা সাজসাজ রব পড়ে গেছে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে মকবুল কোন কৃপণতা করেনি। সাড়ে আট টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনেছে; হাঁ থেকে এনেছে চিকন চাল আর ঘি। মিয়া বাড়ি থেকে চিনেমাটির পেয়ালা বরতন ধার করে এনেছে। আয়োজনের কোন কমতি রাখেনি মকবুল।
বিয়ে উপলক্ষে মেহেদি লাগান হলো কন্যার হাতে। রাতেরবেলায় পাড়াপড়শিরা এসে সবাই মিলে গীত গাইল। আম্বিয়া আর টুনি মিলে বিয়ের ধান ভানল। তারাও ধান ভানতে গলা ছেড়ে গান গাইল। মেহেদির আসরে হঠাৎই বৃদ্ধা ফকিরের মাকে নাচতে দেখে সবাই খুব আনন্দিত হলো, প্রাণ খুলে হাসল। এমন সময় সেখানে আম্বিয়া আসায় তাকেও ফকিরের মা আসরের মাঝখানে টেনে নিয়ে নাচতে লাগলো। লজ্জা পেয়ে আম্বিয়া ফকিরের মার কাছ থেকে ছুটে গিয়ে মন্তুর ঘরে ঢুকে খিল আঁকে দিল। এ নিয়ে হাসি মস্করা করার সময় টুনি সেখানে এল। এদের হাসি মস্করা করতে দেখে টুনি তাদেরকে কাজ করতে বলে। সে নিজে চলে যায় রসুই ঘরে হঠাৎ সালেহা টুনির এই আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করলে টুনি রসুই ঘর থেকে ছুটে এসে সালেহার চুল ধরে হ্যাঁচকা টানে মাটিতে ফেলে দিয়ে কিল ঘুষি মেরে সেখান থেকে চলে যায়। টুনির এই অদ্ভুত আচরণে বাড়ির সবাই অবাক হয়ে যায়। হঠাৎ আনন্দঘন পরিবেশটা ভারী হয়ে যায়। মকবুল টুনির এই আচরণের যথাযথ শাস্তির বিধান করবে এই আশ্বাস দিলে আবার সবাই আনন্দে মেতে ওঠে। প্রায় সারা রাতই সবাই নানা রকম আনন্দে মেতে রইল।

ভোরের দিকে মন্তু যখন ঘুমুতে যাচ্ছিল এমন সময় টুনি আসে তার কাছে। মন্তুর হাতে মেহেদি পরিয়ে দেয়। তাকে একটা বিয়ে করতে অনুরোধ করে। সঙ্গে একথাও বলে যেন মন্তু টুনির পছন্দে বিয়ে করে। মন্তু টুনির কথায় সায় দেয়। টুনিকে শাপলা তুলতে যেতে বলে, মাছ ধরতে যেতে বলে কিন্তু টুনি কোথাও যেতে রাজি হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের বাম দিকে দেয়া প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান দিকে উত্তর লিখুন

সনাক্তকরণ

১. একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাই আয়োজনের কোন	পরিবেশটা আর এখন নেই।
২. সাড়ে আঁ টাকা দাম দিয়ে	মেহেদি তুলতে গেছে সালেহা আর ফকিরের মা।
৩. মিয়া বাড়ি থেকে কয়েকটা চিনেমাটির	ঘরে ঢুইকা খিল দিলি।
৪. ভূঁইয়া বাড়ির গড়ের পাশে বড় মেহেদি গাছ থেকে	একটা ছাগল কিনেছে সে।
৫. পুরো ওঠোনটাকে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার	কার্পণ্য করেনি বুড়ো মকবুল।
৬. এতেঠ ঘর থাকতে শেষে আমাগো মন্তু মিয়ার	পেয়ালা আর বর্তন ধার নিয়ে এল আমেনা।
৭. একটু আগেকার সেই আনন্দ উচ্ছল	চিৎকার করে কেঁদে উঠল সালেহা।
৮. সালেহার চুলের গোছাঁটা ধরে হ্যাঁচকা টানে	হাসি-ঠাট্টা করছিল ওরা।
৯. ঘটনার আকস্মিকতা কেটে যেতে	ঝকঝকে তকতকে করে তুলছে ওরা।
১০. আম্বিয়া আর মন্তুকে নিয়ে	ওকে মাটিতে ফেলে দিল সে।

সত্য/মিথ্যা নির্ণয়

১. মকবুল হাঁ থেকে চিকন চাল আর আধা সের ঘি কিনেছিল।
২. বুড়ো মকবুলের শরীর ভাল ছিল না বলে সে অন্যদের কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল।
৩. আমেনা আর ফাতেমা ঘরদোর লেপে ঠিক করছিল।
৪. টুনি আর আম্বিয়া মিলে বিয়ের ধান ভেনেছিল।
৫. হীরনের বিয়ে হচ্ছে তবুও সে নানা রকম কাজ করছিল।
৬. ফকিরের মাকে সবাই নাচতে অনুরোধ করেছিল।
৭. আম্বিয়া রশীদের ঘরে গিয়ে খিল দিয়েছিল।
৮. সালেহার চুলের গোছা ধরে টুনি তাকে মাটিতে ফেলে দেয়।
৯. টুনি সালেহাকে মারার ফলে মকবুল বেশ বিব্রত হয়।
১০. মন্তুর হাতে টুনি মেহেদি পরিয়ে দিয়েছিল।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। 'একডা বিয়া কর'- কে, কাকে বলেছিল?

ক. টুনি, রশীদকে খ. টুনি মকবুলকে
গ. টুনি, মন্তুকে ঘ. সালেহা, আবুলকে

২। 'আমার পছন্দ ছাড়া বিয়া কইরবা না' - টুনির এ অনুরোধ কার প্রতি?
ক. মকবুলের প্রতি খ. আবুলের প্রতি
গ. রশীদের প্রতি ঘ. মন্তুর প্রতি

৩। টুনি কেন মন্তুর সঙ্গে শাপলা তুলতে যেতে রাজি হল না?
ক. তার শরীর ভাল ছিল না বলে খ. সারাদিন পরিশ্রম বলে
গ. লোকে দেখলে কেলেঙ্কারি হবে বলে ঘ. বাড়ির সবাই জেগে ছিল বলে

৪. টুনি সালেহাকে মারধোর করলে সবচেয়ে রেগে যায়-
ক. মকবুল খ. আম্বিয়া
গ. রশীদ ঘ. মন্তু

৫. মন্তুকে দেখে ফোকলা দাঁত বের করে কি বলেছিল?
ক. কি, মিয়া কবে অইল এই সব খ. কি অইতাতে কাজ কাম ফালাইয়া
গ. কি মিয়া ডুইবা ডুইবা পানি খাও ঘ. কি মিয়া কইন্যা কবে আইল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন	উত্তর লিখুন
১. টুনি সালেহাকে মারধোর করল কেন?	
২. 'কিরে কি অইলো অ্যাঁ। কি অইলো।' বলে মকবুল ছুটে আসে কেন?	
৩. 'ঘরে গিয়া দেহ কইন্যা তোমার ঘরে গিয়া খিল দিছে? কে কাকে বলে?	
৪. টুনিকে মন্তু কি কথা দিয়েছিল?	
৫. অনেক রাত অবধি বাড়ির সবাই জেগে থাকলো কেন?	
৬. হীরন তার বিয়ের শোরগোলের মধ্যে কি করছিল?	
৭. 'যা অইছে তার বিচার আমি করমু' - মকবুল কিসের বিচার করবে?	
৮. ধান ভানা রেখে টুনি আর আম্বিয়া বেরিয়ে এল কেন?	

রচনামূলক প্রশ্ন

১। হীরনের বিয়েকে কেন্দ্র করে মকবুলের বাড়িতে যে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা দিন।
২। গ্রামবাংলায় বিয়েকে কেন্দ্র করে যে সকল লৌকিক অনুষ্ঠান হয় তার পরিচয় দিন।

উত্তরমালা

সনাক্তকরণ

১. কার্পণ্য করেনি বুড়ো মকবুল।
২. একটা ছাগল কিনেছে সে।
৩. পেয়ালা আর বরতন ধার নিয়ে এল আমেনা।
৪. মেহেদি তুলতে গেছে সালেহা আর ফকিরের মা।
৫. ঝকঝকে তকতকে করে তুলেছে ওরা।
৬. ঘরে ঢুইকা খিল দিলি।

৭. পরিবেশটা আর এখন নেই।
৮. ওকে মাটিতে ফেলে দিল সে।
৯. চিৎকার করে কেঁদে উঠল সালেহা।
১০. হাসি-ঠাট্টা করছিল ওরা।

সত্য/মিথ্যা নির্ণয়

১. সত্য ২. সত্য ৩. সত্য ৪. সত্য ৫. মিথ্যা ৬. মিথ্যা ৭. মিথ্যা ৮. সত্য ৯. সত্য ১০. সত্য

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. গ ২. ঘ ৩. গ ৪. গ ৫. গ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মন্তুর সঙ্গে জড়িয়ে টুনিকে নিয়ে একটা কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত করেছিল সালেহা। টুনির কাছে তা অসম্মানজনক মনে হয়। এতে টুনির মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এবং টুনি সালেহাকে মারধোর করে।
২. সালেহার আর্ত চিৎকার শুনে দাওয়া থেকে মকবুল ছুটে আসে।
৩. গ্রামের রসুর নানী ফোকলা দাঁত বের করে মন্তুকে একথা বলেছিল।
৪. টুনিকে মন্তু কথা দিয়েছিল যে টুনির পছন্দ ছাড়া সে বিয়ে করবে না।
৫. হীরনের বিয়েকে কেন্দ্র করে বাড়ির সবার মধ্যেই এক ধরনের আনন্দ উল্লাস কাজ করছিল বলে কেউই সেদিন ঘুমাতে যায়নি অনেক রাত পর্যন্ত।
৬. বিয়ে বাড়ির সোরগোলের মধ্যেও হীরন রসুই ঘরে যাওয়ায় চুপ করে বসেছিল আর অবাক হয়ে বারবার সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল।
৭. টুনি সালেহাকে মারধোর করেছে এ ঘটনার বিচার সে করবে।
৮. সবাই ওঠোনে আনন্দ ফুর্তি করছিল, গান গাইছিল কেউবা নাচছিল, হীরনের হাতে মেহেদি পরানো হচ্ছিল এতেঠসব আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে চায়নি বলে আম্বিয়া আর টুনি ধান ভানা রেখে বেরিয়ে এল।

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ১. হীরনের বিয়েকে কেন্দ্র করে মকবুলের বাড়িতে যে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা দিন।

উত্তর : মকবুল এমন এক সামাজিক অবস্থানের মানুষ হিসেবে উপন্যাসে আমাদের সামনে উপস্থিত যাদের জীবনে আনন্দ এবং উল্লাসের সুযোগ খুব কমই ঘটে। তাদের প্রতিদিনের জীবনে দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতই সত্য হিসেবে থাকে, আনন্দ নয়, উৎসব নয়। ফলে হীরনের বিয়েকে কেন্দ্র করে কেবল মকবুলের পরিবারে বা বাড়িতেই নয় আশেপাশের দুএক বাড়িতেও একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে যেন। তা ছাড়া মকবুলের একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে আয়োজনে কোন কার্পণ্য করেনি সে। বাজার থেকে সাড়ে আঁ টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনেছে, সরু চাল আর আধা সের ঘিও কিনেছে বিয়ের দিন মেহমানদের আপ্যায়নের জন্যে। মেহমানদের সম্মানের কথা বিবেচনা করে মিয়া বাড়ি থেকে কয়েকটি চিনামাটির পেয়ালা আর বরতন ধার করে এনেছে। মাটির বাসনে মেহমানদের খাবার দেয়া সমীচীন নয় বলে মকবুল মনে করেছে। ঘরদোর লেপা-মোছা করেছে, বাড়ির ব্যবহার্য বাসন-কোসনগুলো মেজেঘষে ঝকঝকে তকতকে করে তোলা হয়েছে।

বিয়ে উপলক্ষে পাশের বাড়ি থেকে আম্বিয়া এসেছে বিয়ের ধান ভানতে। কন্যাকে যেদিন মেহেদি পরানো হল সেদিন সবাই নেচে, হেসে সারা বাড়ি আনন্দময় করে তোলে। এমন কি ফকিরের মা বুড়িও নাচতে শুরু করে দেয় স্থান-কালপাত্র ভুলে। অন্যদিকে আশেপাশের মহিলারা এসে গোল হয়ে বসে একটানা মিহি সুরে গীত গাইছে। হৈ-চৈ ঠাট্টা তামাসার মধ্যে দিয়ে মাতিয়ে রেখেছে সারা বাড়ি। মকবুলের জীবনে এমন আনন্দের ঘটনা খুব কমই এসেছে। এমন কি বাড়ির সবার জীবনেই হয়তো এমন আনন্দের ঘটনা খুব কম ঘটেছে। তাই সারা রাত জেগে বাড়ির সবাই এ আনন্দ উৎসবে যোগ দেয়।

প্রশ্ন ২ : গ্রামবাংলায় বিয়েকে কেন্দ্র করে যে সকল লৌকিক অনুষ্ঠান হয় তার পরিচয় দিন।

উত্তর : গ্রামবাংলার বিয়ে উপলক্ষে নানা রকম লৌকিক আনুষ্ঠানিকতা দেখা যায়। তবে একেক অঞ্চলে একেক রকম আনুষ্ঠানিকতার চল রয়েছে। এখানে আমরা যে সকল আনুষ্ঠানিকতার উল্লেখ পাচ্ছি সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হল।

বিয়ে উপলক্ষে একটা উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এবং খাবার পরিবেশনের জন্যও ব্যবহৃত হয় উন্নত বাসন কোসন। বাড়ি ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় লেপে মুছে। পাড়া পড়শীরা ওঠোনে বসে একসুরে গান করে। নানা বিষয় নিয়ে হয়ে থাকে সেসব গান। যেমন কন্যার হাতে মেহেদি পরানোর সময় সকলে সুর করে গায়-

মেহেদি তোমরা লাগ কেনে কাজে।
আমরা লাগী দুলহা কইন্যারে সাজে। ইত্যাদি।

বিয়ের হলুদ কোঁটা হয় ঢেঁকিতে আবার বিয়ের ধানও ভানা হয় ঢেঁকিতে। বিয়ের ধান ভানতে ভানতে মেয়েরা সুর করে গান করে। কন্যার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও হাতে মেহেদি পরে। বুড়োবুড়ি আনন্দে নৃত্য করে। মোঁ কথা এ-সব লৌকিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার মানুষ তাদের নিরানন্দ এবং একঘেয়ে জীবনের মধ্যে আনন্দের ছোঁয়া খুঁজে পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তু সংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ১২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- হীরনের বিয়ের পর মকবুলের এবং তার বাড়ির পরিবেশ কিভাবে বদলে গিয়েছিল তা বলতে পারবেন।
- ওলা ওঠা নিয়ে মকবুলের বাড়িতে সৃষ্ট আতঙ্কের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- তোরাবের অদ্ভুত আচরণের বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিয়ের পরে ক'টা দিন বাড়িটা একেবারে জনশূন্য মনে হল। ছেলে-বুড়ো প্রায় সবাই চলে গেছে হীরনের সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ি। শুধু যায়নি মকবুল আর মন্তু।

মকবুল যায়নি তার অসুখ বলে। প্রায় বিকেলে জ্বর আসছে ওর। সকালে একেবারে ভাল।

মন্তুরও শরীরটা ভাল নেই। বিয়ের দিন, রাতে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগিয়েছে সে। বুড়ো মকবুল বলেছে, থাক তোর গিয়ে কাজ নেই। তুই পরে যাইস। তাই থেকে গেছে সে।

বাড়ির মেয়েছেলেরা ক'দিন ধরে ঘুমুচ্ছে খুব। বিয়ের সময়ে দুচোখের পাতা এক করতে পারে নি কেউ, তাই।

মকবুল সাবধান করে দিয়েছে ওদের, অমন করে ঘুমায়ো না তোমরা, চোর আইসা সর্বনাশ কইরা দিবো।

আর আইলেই-বা কি নিবো। আছেই-বা কি। আমেনা শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছে। ওর মনটা ভাল নেই।

একমাত্র মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে শান্তি পাচ্ছে না সে। বড় একা একা লাগছে। কে জানে স্বামীর বাড়ি গিয়ে কত কষ্টই না সহ্য করছে হীরন।

আজ সকাল থেকে মরাকান্না জুড়েছে ফকিরের মা। মৃত ছেলেটার কথা মনে পড়েছে ওর। বেঁচে থাকলে হয়তো সে এখন বিয়ের বয়সী হতো।

জ্বর নিয়েও বুড়ো মকবুল পুকুর পাড়ে বসে মরিচের গাছগুলোতে পানি দিচ্ছে। ফাতেমা দুবার এসে ডেকে গেছে ওকে, আপনের কি অইছে। এই রকম কাজ কইরলে তো দুই দিনে মরবেন আপনে।

কথাঁটা কানে নেয় নি মকবুল। একমনে পানি ঢালছে সে।

মন্তুকে পাঠিয়েছে গাঁয়ের কোবরেজ মশায়ের কাছে। লক্ষণ বলে ঔষধ নিয়ে আসার জন্য।

ওঠোনে টুনিকে ডেকে তার হাতে ওষুধগুলো দিয়ে দিল মন্তু। বলল, কবিরাজ মশায় কইছে, এইগুলান ঠিকমতো খাইতে।

টুনি ওষুধগুলো হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, কি অইবো ওষুধ খাইয়া, বুড়া মরুক। বলেই চারপাশে তাকাল টুনি, কেউ শুনল নাকি দেখল। মন্তু কোন জবাব দিল না ওর কথায়। বেড়ার সঙ্গে ঝুলানো হুঁকো আর কল্কেটা নিয়ে রসুই ঘরের দিকে চলে গেল সে। একটু পরে এক বাটি তেঁতুল মরিচ মেখে এনে মন্তুর সামনে বসল টুনি।

অল্প একটু তেঁতুল মুখে পুরে দিয়ে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে তার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে টুনি শুধাল, খাইবা?

বাটিটার দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে মন্তু বলল, না। তারপর একমনে হুকো টানতে লাগল সে।

টুনি বলল, কবিরাজ কি কইছে?

একরাশ ধুঁয়া ছেড়ে মন্তু জবাব দদল, কইছে, কিছু না, ভাল অইয়া যাইবো।

ভাল অইয়া যাইবো? চোখজোড়া কপালে তুলল টুনি।
নেড়ি কুকুরটা টুনিকে কিছু খেতে দেখে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। হঠাৎ দাওয়া থেকে পিঁড়ি তুলে ওর গায়ে ছুঁড়ে মারল টুনি।
সারাদিন কেবল পিছে পিছে ঘুরে, কোনহানে গিয়া একটু শান্তি নাই।
পিঁড়ির আঘাতে ঘেউ ঘেউ করে সেখান থেকে পালিয়ে গেল কুকুরটা।
চৈত্র মাসের রোদে মাটঠা খা খা করছে।
যেদিকে তাকান যায় শুধু শুকনো মাটি। পাথরের চেয়েও শক্ত। আর অসংখ্য ফাঁল। মাটি উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে ফেটে যায়। দাঁড়কাকগুলো তৃষ্ণায় সারাক্ষণ কা-কা করে উড়ে বেড়ায় এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। বাড়ির আনাচে কানাচে।
নদী-নালাগুলোতে পানি থাকে না। মানুষ গরু ইচ্ছেমতো পায়ে হেঁটে এপার-ওপার চলে যায়। পুকুরগুলোতে পানিও অনেক কমে আসে।
গরমে ঘরে থাকে না কেউ। গাছের নিচে চাঁটাই বিছিয়ে শুয়ে বসে দিন কাঁটায়। বাতাসে একটি পাতাও নড়ে না। সারাক্ষণ সবাই শুধু হা-হুতাশ করে। এমনি সময়ে হীরনকে দেখবার জন্যে ওর শ্বশুরবাড়িতে গেছে বুড়ো মকবুল। যাবার সময় একটা ন্যাকড়ার মধ্যে এককুড়ি মুরগীর ডিম সঙ্গে নিয়ে গেছে সে। শূন্য হাতে বেয়াই বাড়ি গেলে হয়তো ওরা লজ্জা দিতে পারে তাই। পথে বামুন বাড়ির হাঁ থেকে চার আনার বাতাসাও কিনেছে সে। বাড়ির বাচ্চাদের হাতে দেবে।
ভর সন্ধ্যায় মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে এলো মকবুল। বার বাড়ি থেকে ওর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল সুরত! সুরত! ও মন্তু, কেউ কি নাই নাকি রে।
মন্তু গেছে মিয়া বাড়ি। গাছ কাঁটার চুক্তি নিয়েছে সে।
সুরতও সেখানে।
আবুল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি ভাই সাব, কি অইছে?
টুনি আর আমেনাও বেরিয়ে এল বাইরে।
মকবুল বলল, সুরত, রশীদ ওরা কই?
আমেনা বলল, সুরত কাজে গেছে, রশীদ গেছে হাটে, সালেহার লাইগা সাবু আনতে।
ওর জ্বর হইছে ভীষণ।
জ্বর নাহি, আহা কখন আইলো? গায়ের ফতুয়াঁটা খুলতে খুলতে মকবুল বলল, বাপু তোমরা সক্কলে একটু সাবধানে থাইকো! ও বিন্তির মা, বঁইচির মা শোনো, তোমরা একটু সাবধানে থাইকো।
গেরামে ওলা বিবি আইছে।
ইয়া আল্লা মাপ কইরা দাও! আতঙ্কে সবাই শিউরে উঠল।
গনু মোল্লা ওজু করছিল, সেখান থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করল, কোন্হানে আইছে ওলা বিবি? শোন্ বাড়িতে আইছে?
মকবুল বলল মাঝি-বাড়ি।
মাঝি-বাড়ি? একসঙ্গে বলে উঠল সবাই। কয়জন পড়ছে?
তিনজন।
তিনজন কে কে সে কথা বলতে পারবে না মকবুল, পথে আসার সময় ও বাড়ির আম্বিয়ার কাছ থেকে শুনে হুইসারে এসেছে সে। বাড়ির সবাইকে আরেক প্রস্ত সাবধান করে দিল বুড়ো মকবুল, তোমরা সক্কলে একডু সাবধানে থাইকো বাপু। একডু দোয়া দরুদ পইড়ো। বলে খড়মটা তুলে নিয়ে ঘাটের দিকে চলে গেল সে।
ফকিরের মা বুড়ি এতেঠক্ষণ নীরবে শুনছিল সব, এবার বিড়বিড় করে বলল বড় খারাপ দিন কাল আইছে বাপু। যেই বাড়ীডার দিকে একবার নজর পড়ে সেই বাড়িডার এক্কেবারে শেষ কইরা ছাড়ে ওলা বিবি। বড় খারাপ দিন-কাল আইছে। বলে নিজের মৃত ছেলেটার জন্য কাঁদতে শুরু করল সে।
টুনি দাঁত মুখ শক্ত করে তেড়ে এল ওর দিকে, বুড়ি যহন তহন কান্দিছ না কইলাম। শিগ্গির থাম।
ধমক খেয়ে ফকিরের মা চুপ করে গেল। সেই বিয়ের সময় সালেহাকে মারার পর থেকে টুনিকে ভীষণ ভয় করে বুড়ি।
ইতোমধ্যে মন্তু আর সুরত ফিরে এসেছে।
কাঁধের ওপর থেকে কুড়ালটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে না রাখতে টুনি একপাশে টেনে নিয়ে গেল ওকে।
মাঝি বাড়ি যাও নাই তো?
মন্তু ঘাড় নাড়ল, না ক্যান কি অইছে?
টুনি বলল, ওলা বিবি আইছে ওইহানে। বলতে গিয়ে মুখখানা শুকিয়ে গেল ওর।
মন্তুর দুচোখে বিস্ময়। বলল কার কাছ থাইকা শুনছ?

ও কথার কোন জবাব না দিয়ে টুনি আবার বলর, শোন, ওই বাড়ির দিকে গেলে কিন্তুক আমার মাথা খাও। যাইও না কিন্তু?
মন্তু সায় দিয়ে মাথা নাড়ল কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারল না সে। আজ সকালে মিয়া-বাড়ি যাওয়ার পথে একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করে গেছে মন্তু। নৌকাঁটাকে ভালভাবে মেরামতো করার বিষয় অনেকক্ষণ আলাপ করে ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন তো এমন কিছু শুনে নি সে।
আম্বিয়ার সঙ্গেও দেখা দিয়েছিল, সেও কিছু বলে নি।
ওঠোনের এক কোণে দাড়িয়ে সাত পাঁচ ভাবল মন্তু। বুড়ো মকবুলকে তামাক সাজিয়ে দেয়ার জন্যে সেই ঘরে গেছে টুনি। এই সুযোগে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ল সে।
দীঘির পাড়ে মন্তু শেখের ভাইঝি জামাই তোরাবের সঙ্গে দেখা হল। পরনে লুঙ্গি আর কুর্তা। হাতে লাঠি। বগলে একজোড়া পুরনো জুতোটা। মন্তুকে দেখে প্রসন্ন হাসির সঙ্গে তোরাব প্রশ্ন করল, কি মিয়া খবর সব ভাল তো? মন্তু নীরবে ঘাড় নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কই যাও শ্বশুর বাড়ি বুঝি?
হুঁ, তোরাব শ্বশুর বাড়িতেই যাচ্ছে। কাজকর্মের ফাঁকে অনেক দিন আসতে পারে নি, খোঁজ-খবর নিতে পারে নি। তাই সুযোগ পেয়ে একবার সকলকে দেখে যেতে এসেছে সে।
পকেট থেকে দুটি বিড়ি বের রে একটা মন্তুকে দিয়ে আরেকটা নিজে ধরাল সে। বিড়ি খেতে ইচ্ছা করছিল না ওর। তবু নিতে হল। সগন শেখের পুকুর পাড়ে এসে থামল তোরাব। জুতোজোড়া বগল থেকে নামিয়ে হাত-পা ধোয়ার জন্যে ঘাটে নেমে গেল সে।
বলল, একটুখানি দাঁড়ান মিয়া। অজু কইরা নি।
হাত-পা ধুয়ে জুতোজোড়া পরে আবার ওপরে ওঠে এল তোরাব।
পকেট থেকে চিরুনি বের করে নিয়ে বলল, মাঝি-বাড়ির খবর জানেন নাহি সক্কলে ভাল আছে তো?
মন্তু বলল, ভাল তো আছিল, কিন্তুক একটু আগে শুনছি, ওলা লাগছে।
ওলা? তোরাব যেন আঁতকে উঠল। পায়ের গতিটা কমিয়ে এনে সে শুধাল, কার কার লাগছে?
মন্তু বলল, কি জানি ঠিক কইবার পারলাম না।
হুঁ। হঠাৎ থেমে গেল তোরাব। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল, তারপর পায়ের জুতোজোড়া খুলে আবার বগলে নিতে নিতে বলল, এই দুঃখের দিনে গিয়া ওনাগোরে কষ্ট দেয়নের কোন মানি অয় না মিয়া, যাই, ফিইরা যাই। যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। আস্তে করে বলল, আমি যে আইছলাম এই কথাডা কেউরে কইয়েন না মিয়া। বলে মন্তুর উত্তরের অপেক্ষা না করে যে পথে এসেছিল সে পথে দ্রুতপায়ে আবার ফিরে চলল তোরাব। হাতের বিড়িটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মন্তু।

শব্দার্থ ও টীকা

জনশূন্য – লোকজন নেই এমন। **দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি** – ঘুমতে পারেনি। **মরাকান্না** – রাড়িতে কেউ মারা গেলে লোকেরা যেমন কাঁদে তেমন কান্না। **ফাঁল** –চির, ছিদ্র। **মাথা খাও** – শপথ বিশেষ, মাথার দিব্যি। **সাত-পাঁচ** – বিবিধ, নানা রকম। **কুর্তা** – ছেলেদের ছোঁ জামা। **প্রসন্ন** – সন্তুষ্ট, নির্মল।

বস্তুসংক্ষেপ

হীরনের বিয়ের পর বাড়িটা একেবারে যেন ফাঁকা হয়ে গেল। বাড়ির অধিকাংশই হীরনের সঙ্গে চলে গিয়েছে। কেবল মন্তু আর মকবুল যেতে পারেনি অসুস্থতার কারণে। অন্যদিকে বাড়ির মেয়েছেলেরা শুধু পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে- ক'দিন তারা বিয়ের আনন্দে একটুও ঘুমাতে পারেনি।
এদিকে চৈত্র মাস এসে গেল। নদী নালা, পুকুরের পানি শুকিয়ে গেল। পানির অভাবে খেতের জমিগুলো ফেটে চৌচির হয়ে গেল। রোদের উত্তাপের কারণে ঘরের বাইরে আসা যায় না। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, বাতাস নেই। এমনি একদিন মকবুল বাড়ি থেকে এক কুড়ি মুরগির ডিম আর বাজার থেকে চার আনার বাতাসা কিনে নিয়ে নতুন বেয়াই বাড়িতে বেড়াতে গেল। ভর সন্ধ্যে বেলা বাড়িতে ফিরে এলো একটা আতঙ্কের খবর সঙ্গে নিয়ে। ওলা উঠা আক্রমণ করেছে।
ওলা ওঠার সংবাদে মকবুলের বাড়িতে সবার মধ্যেই একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। টুনি বারবার মাথার দিব্যি দিয়ে মন্তুকে নিষেধ করে মাঝি বাড়িতে না যাবার জন্য। তবুও মন্তু খোঁজ নেবার জন্য বাড়ির বাইরে এলে দেখা হয় নন্তু শেখের ভাইঝি জামাই তোরাবের সঙ্গে। মন্তুর কাছে সে মাঝি-বাড়ির খোঁজখবর নেয়। এক পর্যায়ে মন্তু মাঝি-বাড়িতে ওলা ওঠার খবরটা

তোরাবকে দেয়। খবরটা শুনে তোরাব পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর মারাত্মক ভয়ে যে-পথে সে এসেছিল সে পথেই পড়ি কি মরি করে ছুটে পালায়। পলায়নরত তোরাবের দিকে মন্তু অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের বাম দিকের দেয়া প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান দিকের খালি জায়গায় উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হীরনের বিয়ের পর বাড়িটা জনশূন্য মনে হয় কেন?
২. বাড়ির মেয়েছেলেরা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে কেন?
৩. মকবুল আর মন্তু হীরনের শ্বশুর বাড়ি যায়নি কেন?
৪. 'অমন করে ঘুমায়ো না তোমরা, চোর আইসা সর্বনাশ কইরা দিবো।' কে, কাকে বলেছিল?.
৫. মন্তু মকবুলের জন্য কোথা থেকে ওষুধ এনে দিয়েছে?
৬. টুনি মকবুলের মৃত্যু কামনা করে কেন?
৭. মকবুল নতুন বেয়াই বাড়িতে কি কি নিয়ে গিয়েছিল?
৮. বেয়াই বাড়ি থেকে ফিরে মকবুল কী সংবাদ দেয়?
৯. ফকিরের মা বুড়ি ইদানীং টুনিকে ভয় পায় কেন?
১০. মাঝি-বাড়িতে না যাবার জন্য মন্তুকে টুনি মাথার দিব্যি দেয় কেন?
১১. তোরাব অনেক দিন শ্বশুর বাড়িতে আসতে পারেনি কেন?
১২. 'আমি যে আইছিলাম এই কথাডা কেউরে কইয়েন না'. - কে, কাকে এ অনুরোধ করেছিল?

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মকবুলের কখন জ্বর আসে?
ক. সকালে
খ. সকালে-বিকেলে দুবেলা জ্বর থাকে
গ. বিকেলে
ঘ. বিকেলে জ্বর আসে সকালে থাকে না

২. 'আর আইলেই বা কি নিবো। আছেই বা কি? উক্তিটি কার?
ক. আমেনার
খ. ফাতেমার
গ. টুনির
ঘ. মন্তুর

৩. ফকিরের মা সকাল থেকে মরাকান্না জুড়েছে কেন?
ক. তার ছেলে বাড়ি নেই বলে
খ. হীরনের বিয়ে হয়ে গেছে বলে
গ. টুনির রাগের ভয়ে
ঘ. মৃত ছেলেকে মনে করে

৪. জ্বর নিয়েও বুড়ো মকবুল কী কাজ করছিল?
ক. ধানের গাছে নিড়ানি দিচ্ছিল
খ. মাড়াই করছিল
গ. মরিচের গাছগুলোতে পানি দিচ্ছিল
ঘ. মাছ ধরার জাল বুনছিল

৫. চৈত্র মাসের পানি শূন্য মাঠের মাটি কেমন?
ক. নরম তুলার মতো
খ. পাথরের চেয়েও শক্ত
গ. আঠালো, কিন্তু নরম
ঘ. নরম কিন্তু আঠালো নয়

৬. চৈত্র মাসে নদীর ক্ষেত্রে কোন উত্তরটি অযথার্থ?
ক. শুকিয়ে যায়
খ. পানি ভরাঁ হয়ে ওঠে
গ. মানুষ পায়ে হেঁটে পার হয়
ঘ. গরু এপার-ওপার যায়

৭. বেয়াই বাড়ির জন্য বাতাসা মকবুল কোত্থেকে কিনেছিল?
ক. নবীনগর থেকে খ. বামুন বাড়ির হাঁ থেকে
গ. শান্তির হাঁ থেকে ঘ. পরীর দিঘির পাড় থেকে

৮. রশীদ সালেহার জন্য হাঁ থেকে কী আনতে গিয়েছিল?
ক. সাবু খ. চুড়ি
গ. আলতা ঘ. ফিতা

৯. 'কয়জন পড়েছে - এ কথার অর্থ কী?
ক. কয়জন পানিতে পড়েছে খ. কয়জন গাছ থেকে পড়েছে
গ. কয়জন রোগে আক্রান্ত ঘ. কয়জন মারা গেছে

১০. ওলা ওঠার সংবাদে তোরাব পালিয়ে গেল কেন?
ক. শ্বশুর বাড়িতে সবাই মারা গেছে বলে খ. মাঝি তার কাছে অর্থ চাইবে বলে
গ. ওলা ওঠায় সেও আক্রান্ত হতে পারে এই ভয়ে
ঘ. তার হাতে বেড়ানোর সময় ছিল না বলে

ভাষার কাজ

উদাহরণ

সাতপাঁচ (নানা রকম) সাত পাঁচ ভেবে শেষে আমি ওদের সঙ্গে না যাওয়াই স্থির করলাম।

সমাস নির্ণয়

উদাহরণ

ছেলে-বুড়ো = ছেলে ও বুড়ো = দ্বন্দ্ব সমাস
মরাকান্না =
কবিরাজ =
নদী-নালা =
মাঝি-বাড়ি =
মাথা খাওয়া =
সাত পাঁচ =
প্রসন্ন হাসি =

রচনামূলক প্রশ্ন

১. হীরনের বিয়ের পর মকবুলের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল? তা লিখুন।
২. হীরনের বিয়ের পর মকবুলের বাড়ির পরিবর্তিত পরিবেশের বর্ণনা দিন।
৩. ওলা ওঠার সংবাদে মকবুলের বাড়ির সবার মধ্যে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হল তার পরিচয় দিন।
৪. মন্তু শেখের ভাইঝি জামাই তোরাবের বেশভূষা ও আচরণের পরিচয় দিন। সে শ্বশুর বাড়িতে না গিয়ে আবার ফিরে গেল কেন?

উত্তরমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হীরনের বিয়ের পর বাড়ির সবাই হীরনের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে। আর বাড়ির যে-সব মেয়েরা যায়নি তারাও পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। ফলে সমস্ত বাড়িটা জনশূন্য হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়।
২. বিয়ের দিনগুলোতে বাড়ির মেয়েরা নানা রকম কাজের চাপে ঘুমানোর সুযোগ পায়নি। তাই বিয়ে শেষ হবার পর তারা কেবল পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে।
৩. মকবুল আর মন্তু অসুস্থ বলে তারা হীরনের শ্বশুর বাড়ি যায়নি।
৪. মকবুল বলেছিল বাড়ির সবাইকে।

৫. মকবুলের ক'দিন থেকেই জ্বর হচ্ছে। বিকেলের দিকে জ্বর হয় আর সকালে একদম থাকে না। মন্তু কবিরাজের কাছ থেকে রোগের লক্ষণ বলে ওষুধ নিয়ে এসেছিল।
৬. টুনি প্রকৃতপক্ষে মকবুলকে স্বামী হিসেবে শ্রদ্ধা করে না। এমন কি ভালোও বাসে না। তার কাছে সব সময় মনে হয় তার জীবনের সকল আনন্দ কেড়ে নিয়েছে বুড়ো মকবুল তাকে বিয়ে করে। তাই প্রতিহিংসা বশত সে মকবুলের মৃত্যু কামনা করে।
৭. নতুন বেয়াই বাড়িতে যাবার জন্য মকবুল বাড়ি থেকে এককুড়ি মুরগির ডিম নিয়েছিল। আর যাবার সময় বাড়ির বাচ্চাদের হাতে দেবে বলে বামুন বাড়ির হাঁ থেকে বাতাসা কিনে নিয়েছিল।
৮. ভর সন্ধ্যে বেলা বেয়াই বাড়ি থেকে ফিরে মকবুল বাড়ির সাবইকে জানায় যে মাঝি-বাড়িতে ওলা বিবি এসেছে।
৯. হীরনের বিয়ের আগে টুনি সালেহাকে বেশ মারধোর করেছিল। সেদিন টুনির সেই উগ্রমূর্তি ফকিরের মা দেখেছিল। ঐ ঘটনার পর থেকে ফকিরের মা টুনিকে ভয় পায়।
১০. মাঝি-বাড়িতে ওলা রোগ হয়েছে। রোগটা খুব ছোঁয়াচে। তাই মন্তুকে মাঝি-বাড়িতে না যাবার জন্য টুনি মাথার দিব্যি দেয়।
১১. কাজকর্মের চাপে তোরাব অনেক দিন শ্বশুর বাড়ি আসতে পারেনি।
১২. মন্তুকে অনুরোধ করেছিল ওলা রোগের ভয়ে পলায়নরত তোরাব।

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ঘ ২. ক ৩. ঘ ৪. গ ৫. খ ৬. খ ৭. খ ৮. ক ৯. গ ১০. গ

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ১ : হীরনের বিয়ের পর মকবুলের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল? তা লিখুন।

উত্তর : হীরনের বিয়ের কয়দিন মকবুল বেশ আনন্দে ছিল। এ বাড়িতে সবচে বেশি টাকা পনে তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে। তা ছাড়া একমাত্র মেয়ে বলে আয়োজনের কোন কমতি করেনি মকবুল তার বিয়েতে। কিন্তু বিয়ের আগে থেকেই মকবুল একটু একটু করে অসুস্থ হতে থাকে, বিয়ের পর সে অসুস্থতা অনেকগুণ বেড়ে যায়। একমাত্র মেয়ে বাড়ি থেকে চলে যাবার পর মকবুল যেন সবকিছু সম্পর্কেই কেমন উদাসীন হয়ে পড়ে। ফলে অসুস্থ শরীর নিয়েই সে রোদের মধ্যে মরিচের চারায় পানি দেয়। ফাতেমা এসে তাকে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তার বারণ সে মানে না। প্রকৃতপক্ষে হীরনের বিয়ের পর মকবুলের পিতৃ হৃদয়ের মমতোটা তাকে এধরনের বৈরাগ্যের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ২ : হীরনের বিয়ের পর মকবুলের বাড়ির পরিবর্তিত পরিবেশের বর্ণনা দিন।

উত্তর : হীরনের বিয়েকে কেন্দ্র করে মকবুলের বাড়ির ছেলে-বুড়ো সবার মধ্যেই এক ধরনের আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। গ্রামীণ মানুষের পরিবর্তনহীন জীবনে এ এক স্মরণীয় স্মৃতি। বিয়ের পর হীরনের সঙ্গে বাড়ির ছেলেরা সবাই গেছে তার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে।

আর বাড়িতেও যারা ছিল তারা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে, ক্লান্তি কাটিয়ে নেবার জন্যে। ফলে সমস্ত বাড়িটাকেই মনে হচ্ছে জনশূন্য। বুড়ো মকবুলের মনে মেয়ের জন্য করুণা জেগে ওঠেছে। সবচে বেশি চিন্তিত আমেনা। তার একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় তার যেন সকল কাজই এলো মেলো হয়ে যাচ্ছে। ফকিরের মা বুড়ি তার মৃত ছেলের জন্য শোক করে কাঁদছে; আর ভাবছে বেঁচে থাকলে তার ছেলেও এতেঠদিনে বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠত। মোঁকথা হীরনের বিয়ে মকবুলের বাড়ির সার্বিক পরিবেশে একটা ছাপ ফেলেছিল।

প্রশ্ন ৩ : নন্তু শেখের ভাইঝি জামাই তোরাবের বেশভূষা ও আচরণের পরিচয় দিন। সে শ্বশুর বাড়িতে না গিয়ে আবার ফিরে গেল কেন?

উত্তর : নন্তু শেখের ভাইঝি জামাই তোরাব। সে শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছে দীর্ঘদিন পর। তোরাবের পরনে ছিল একটা লুঙ্গি আর কোর্তা। হাতে একটা লাঠি আর বগলে জুতা। মন্তুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে পকেট থেকে দুটো বিড়ি বের করে একটা মন্তুকে দিল আর একটা নিজে ধরিয়ে টানতে লাগল আয়েশ করে। পুকুর ঘাটে এসে হাত পা ধুয়ে বগল থেকে জুতা জোড়া নামিয়ে পায়ে দিল। হাত পা ধোয়ার সুবাদে সে একেবারে অজুও করে নিল। তারপর পকেট থেকে চিরুনি বের করে

একেবারে ফুলবাবু হয়ে ওঠার চেষ্টা করল। এমন সময় সে মন্তুর কাছ থেকে যখন শুনল মাঝি-বাড়িতে ওলা ওঠেছে। তোরাব মুহূর্তে পায়ের জুতা খুলে বগলে নিয়ে নিল। তারপর দ্রুত পায়ে যে পথে এসেছিল সে পথে ফিরে গেল।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তু সংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ১৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- ওলা রোগে সমস্ত গ্রাম কিভাবে শঙ্কিত হয়ে ওঠেছিল তা বলতে পারবেন;
- নন্তু শেখের মানসিকতার পরিচয় দিতে পারবেন;
- ওলা বিবিকে নিয়ে প্রচলিত একটি লৌকিক উপাখ্যান বিবৃত করতে পারবেন।

মাঝি-বাড়ি থেকে একটা করুণ বিলাপের সুর ভেসে এলো সেই মুহূর্তে। একজন বুঝি মারা গেল। কলজেটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল মন্তুর। মাঝির বাড়ির দেউড়িটা পেরিয়ে ভেতরে আসতে সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। নন্তু শেখ মারা গেল হাঁপানি জর্জর করিম শেখ মৃত বাবার দেহের পাশে বসে কাঁদছে। আম্বিয়া কাঁদছে তার বিছানায় শুয়ে। ওলা বিবি তাকেও ভর করছে। তাই বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি পাচ্ছে না মেয়েটা। সেখান থেকে কাঁদছে সে।

দাওয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে রইল মন্তু।

মাঝি-বাড়ির ছমির শেখ ওকে দেখে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল। এই কি মুছিবত আইলো মিয়া, আমরা বুঝি এইবার শেষ অইয়া যামু। ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল মন্তু। তারপর ওর কাছ থেকে বাকি খোঁজ-খবর নিলো সে। ছোঁ ভাই জমির শেখ কবিরাজ আনতে গেছে দুক্রোশ দূরে রতনপুরের হাটে। এখনো ফিরে আসে নি, ভোরের আগে যে আসবে তারও কোন সম্ভাবনা নাই। এই একটু আগে ছমির শেখ, পরিবারের ছেলেমেয়ে সবাইকে তার মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বুড়োরা মরে গেলেও ছেলেমেয়েগুলো যাতে বাঁচে। নইলে বাপ-দাদার ভিটার ওপর বাতি দিবার কেউ থাকবে না। ছমির শেখের দুগণ্ড বেয়ে পানি ঝরছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজের চোখজোড়াও ভিজে এল ওর। আম্বিয়ার ঘরের দিকে তাকাতে দেখল, বিছানায় শুয়ে বিলাপ করছে মেয়েটা।

পরদিন ভোরে একটা খন্তা আর কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মন্তু।

পরীর দিঘির পাড়ে জায়গাঁটা আগেই দেখিয়ে গেছে জছমির শেখ। কথা ছিল একটা কবর খোঁড়ার। এখন দুটা খুঁড়তে হবে। একটা নন্তু শেখের জন্যে আরেকটা জমির শেখের জন্যে। রাতে কবিরাজ আনতে যাওয়ার সময় ভেদবমি শুরু হয় ওর। বাড়িতে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরে মারা গেছে ও।

আগে মরার জন্যে কবর খোঁড়ার কাজটা নন্তু শেখ করতো। গত ত্রিশ বছর ধরে এ গাঁয়ে যত লোক মরেছে সবার জন্যে কবর খুঁড়েছে সে। কোদাল হাতে কবর খোঁড়ার সময় প্রায়ই একটা গান গাইতো নন্তু শেখ। আজ ওর কবরের ছক কাঁটতে গিয়ে সে গানটার কথা মনে পড়ে গেল মন্তুর।

এই দুনিয়া দুই দিনের মুসাফিরখানা ও ভাইরে।
মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে হইবো কবরে।

মাটি খুঁড়তো আর টেনে টেনে গান গাইতো নন্তু শেখ। বলত, কত মানুষেরে কবর দিলাম, কত কবর খুঁইড়লাম এই জীবনে। তার হিসাব কি আর আছে মিয়া। এমনও দিন গ্যাছে যহন, একদিন সাত আঁটা কইরা মাটি দিছি।

গোরস্থানে কার কোনটা কবর, কাকে কোনদিন এবং কোথায় কবর দিয়েছে, সব কিছু মুখে মুখে বলে দিতে পারতো নন্তু। আর যখন কবর খুঁড়তে গিয়ে মানুষের অস্থি কিংবা মাথার খুলি পেতো সে, তখন সাবইকে দেখিয়ে বিজ্ঞের মতো বলত, চিনবার পার এরে? না না তোমরা চিনবা কেমন কইরা। আমি চিনি, এইডা কলিমুল্লা মাঝির মাইয়ার খুলি। এইহানেই তো কবর দিছিলাম ওরে। আহা মাইয়া আছিল বটে একটি। যেনো টিয়া পাখির ছাও। যে একবার দেইখছে সেই আর ভুলবার পারে নাই। বলে খুলিটার দিকে খুব ভাল করে তাকাত নন্তু শেখ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে দেখত ওটা, আহা কি

মাইয়া কি অইয়া গেছে। সোনার চাঁদ সুরত এখন চিনবারই পারা যায় না। অতি দুঃখের সঙ্গে নন্তু আবার বলত, গলায় ফাঁস দিয়া মইরছিল অভাগী। জামাইর সঙ্গে বনিবনা অইতো না, তাই। খুলিটা এ পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নন্তু বলে যেতো, সেই বহুত দিনের কথা মিয়া, তহন তোমরা সব মায়ের পেটে আছিলা। সেই নন্তু শেখের মৃতদেহটা কবরে নামাতে গিয়ে চোখজোড়া পানিতে ঝাপসা হয়ে এলো মন্তুর। মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে অইবো কবরে। সারাদিন আর বাড়ি ফিরলো না মন্তু। দীঘির পাড়ে কাটিয়ে দিল সে। ওর মায়ের কবরটা দেখল। এককালে বেশ উঁচু ছিল ওটা। অনেক দূর থেকে চোখে পড়তো, এখন মাটির নিচে খাঁদ হয়ে গেছে এক হাঁটু। অনেকগুলো ছোঁ ছোঁ গর্ত নেমে গেছে ভেতরের দিকে, সেখানে মায়ের দুএকখানা হাঁড় হয়ত আজও খুঁজে পাওয়া যাবে। মায়ের জন্যে আজ হঠাৎ ভীষণ কান্না পেল ওর। মনে হল ও বড় একা। এ দুনিয়াতে ওর কেউ নেই।

শুকনো পাতার শব্দে পেছনে ফিরে তাকাল মন্তু। টুনি দাঁড়িয়ে পেছনে। সারাদিন ওর দেখা না পেয়ে অনেক খোঁজের পর এখানে এসেছে সে। মন্তুকে ওর মায়ের কবরের পাশে বসে থাকতে দেখে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল টুনি।

তারপর ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে আস্তে করে বলল, ঘরে যাইবা চল। কোন কথা না বলে নীরবে ওঠে দাঁড়াল মন্তু। কিন্তু তক্ষুণি বাড়ি ফিরল না সে।

বলল, তুমি যাও আমি আহি।

টুনি উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, কই যাইবা?

মন্তু বলল, যাও না আইতাছি। বলে টুনিকে সঙ্গে নিয়ে পরীর দিঘির পাড় থেকে নেমে এল সে।

ও যখন বাড়ি ফিরে এল তখন বেশ রাত হয়েছে। বার বাড়ি থেকে মন্তু শুনতে পেল গনু মোল্লা ওরা বসে বসে কি যেন আলাপ করছে।

গনু মোল্লা বলছে, সব অইছে খোদার কুদরত বাপু। নইলে এই দিনে তো কোনদিনই ওলা বিবিরে আইতে দেহি নাই।

মকবুল বলল, ওলা বিবির আর আজকাইল দিনকাল কিছু নাই। যহন তহন আহে।

আমেনা বলল, এক পা খোঁড়া বিবির। তবু যেন কেমন কইরা এতেঠ বাড়ি বাড়ি যায়, আল্লাহ মালুম।

ওর কথা শেষ না হতেই টুনি জিজ্ঞেস করল, কেমন কইরা ওর এক পা খোঁড়া অইল বুয়া?

তখন টুনিকে বুঝাতে লেগে গেল আমেনা।

ওলা বিবি, বসন্ত বিবি আর যক্ষ্মা বিবি ওরা ছিল তিন বোন এক প্রাণ। যেখানে যেত একসঙ্গে যেত ওরা। কাউকে ফেলে কেউ বেরুত না বাইরে।

একদিন যখন খুব সুন্দর করে সেজেগুজে ওরা রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল তখন হঠাৎ হজরত আলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের। রঙ্গীন শাড়ি পরে বেরুলে কি হবে, ওদের চিনতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না হযরত আলীর। তিনি বুঝতে পারলেন এরা একজন কলেরা, একজন বসন্ত আর একজন যক্ষ্মা বিবি। মানুষের সর্বনাশ করে বেড়ায় এরা। আর তহনি এক কান্ড কইরা বইসলেন তিনি। খপ কইরা মা ওলা বিবির একখানা হাত ধইরা দিলেন জোরে এক আছাড়। আছাড় খাইয়া একখানা পা ভাইঙ্গা গেল ওলা বিবির। আহা সব খোদার কুদরত। মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, একখানা পা দিয়া দুনিয়াডারে জ্বালাইয়া খাইতাছে বেটি। দুই পা থাইকলে তো দুনিয়াডারে একদিনে শেষ কইরা ফালাইত।

হঠাৎ মন্তুর দিকে চোখ পড়তে বুড়ো মকবুল মুহূর্তে রেগে গেল। কিরে নবাবের বেটা তোরে একশবার কই, নাই, মাঝি-বাড়ি যাইস না, গেলি ক্যান অ্যাঁ?

গনু মোল্লা বলল, অক্কেল পছন্দ নাই তোর।

সুরত আলী বলল, বাড়ির কারো যদি এহন কিছু অয় তাইলে কুড়াইল মাইরা কল্লা ফালাইয়া দিমু তোর।

ফকিরের মা বুড়ি এতেঠক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে বলল, বাপু গেলেই কি অইবো আর না গেলেই কি অইবো। যার মউত আল্লায় যেই দিন লেইখা রাইখাছে সেই দিন অইবো। কেউ আঁকাইবার পারব না।

ঠিক কইছেন চাচি, আপনে ঠিক কইছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওকে সমর্থন জানাল টুনি।

ওর কথা শেষ হতেই হঠাৎ ফাতেমা জানাল, গত রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছে সে। দেখেছে একটা খোঁড়া কুকুর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।

বড় ভালা দেখছ বউ। বড় ভালা দেখছ। ফকিরের মা পরক্ষণে বলল, ওই খোঁড়া কুত্তা, খোঁড়া মোগর আর গরুর সুরত ধইরাই তো আহে ওলা বিবি। এক গেরাম থাইকা অন্য গেরামে যায়। বলে সমর্থনের জন্যে সবার দিকে এক নজর তাকাল সে।

মকবুল জানাল, শুধু তাই নয় মাঝে মাঝে খোঁড়া কাক, শিয়াল কিম্বা খোঁড়া মানুষের রূপ নিয়েও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াত করেন ওলা বিবি।

হ্যাঁ মিয়ারা। বুড়ো মকবুল সবাইকে সাবধান করে দিল। খোঁড়া কিছুরে বাড়ির ধারে-কাছে আইতে দিয়ো না তোমরা। অচেনা কোন খোঁড়া মানুষও না। দেখলেই ওইগুলারে তাড়ায়ে খাল পার কইরা দিও।
সকলে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। হ্যাঁ তাই করবে।
রাতে ঘুম হল না মন্তুর।
সারাক্ষণ বিছানায় ছটফট করল সে।
পরীবানুর পুঁথির কথা মনে পড়ল মন্তুর। সুরত আলী মাঝে মাঝে সুর করে পড়ে ওটা।
কুলাটিয়া গ্রামের এক গৃহস্তের বউ পরীবানু। স্বামীর সঙ্গে মিলমিশ হত না। অষ্টপ্রহর ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকত। ঘর ছেড়ে পুকুর পারে গিয়ে নীরবে বসে থাকত সে। আর সেখান থেকে দেখত একটি রাখাল ছেলেকে। দূরে একটা বট গাছের নিচে বসে একমনে বাঁশি বাজাত সে। এমনি চোখের দেখায় প্রেম হয়ে গেল তারপর।
তারপর একদিন সময় বুঝিয়া। দুইজনে পালায়া গেল চোখে ধুলা দিয়া।
মন্তুরও তাই মনে হল। টুনিকে নিয়ে যদি একদিন পালিয়ে যায় সে। দূরে, বহুদূরে, দূরের কোন গ্রামে কিম্বা শহরে। না শান্তির হাটে যদি ওকে নিয়ে যায় সে তা হলে মনোয়ার হাজি নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত করে দেবে সেখানে টুনিকে নিয়ে সংসার পাতবে মন্তু। যে-কোন দোকানে হাজিকে দিয়ে একটা চাকুরী জুটিয়ে নেবে সে, এমনি আরো অনেক চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো মন্তু।
সকালে ঘুম থেকে ওঠে বাইরে বেরুতেই আমেনা জিজ্ঞেস করল, নন্তু শেখের বাড়ির কোন খবর জান?
না।
ওমা জান না? নন্তু শেখের ছেলে করিম শেখ পড়েছে আজ।
মন্তু কোন কথা বলল না।
আমেনা বলে চলল, কবিরাজে কিছু কইরবার পারল না। তাই ও গনু মোল্লারে ডাইকা নিছে। একটু ঝাড়ফুঁক দিয়া যদি কিছু অয়।
মন্তুকে চুপ করে থাকতে দেখে আমেনাও চুপ করে গেল।
অবশেষে আরও আঁ দশটি প্রাণ হরণ করে তবে গ্রাম থেকে বিদায় নিলেন ওলা বিবি। গ্রামের সবাই মসজিদে সিন্নি পাঠালো। মিলাদ পড়ালো বাড়ি বাড়ি।

শব্দার্থ ও টীকা

বিলাপ – আক্ষেপপূর্ণ কথা, লোক প্রকাশ। **জর্জর** – জীর্ণ, অত্যন্ত রুগ্ন। **দুক্রোশ** – চার মাইলের কিছু বেশি; এক ক্রোশ = ৮০০০ হাতের সমান অর্থাৎ দুই মাইলের কিছু বেশি। **বাপ-দাদার ভিটার ওপর বাতি দিবার কেউ থাকবে না** – বংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে আর কেউ বেঁচে থাকবে না। **ভেদবমি** – বিরামহীন বমি।
অস্থি – হাড়। বনিবনা – সদ্ভাব, মনের মিল। **বার বাড়ি** – বাড়ির বাইরের দিকের অংশ। **আল্লা মালুম** – আল্লাহ জানেন। **খপ কইরা** – হঠাৎ করে। **গ্রামান্তরে** – অন্য গ্রামের, একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। **অষ্ট প্রহর** – আঁ প্রহর। দিনরাত সারাক্ষণ।

বস্তুসংক্ষেপ

ওলা বিবির আক্রমণে সমস্ত গ্রাম আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কে যে কখন মারা যাবে তার কোন ঠিক নেই। মাঝি বাড়ির নন্তু শেখ মারা গেল। নন্তু শেখ এ-গ্রামে ও আশেপাশের গ্রামে বেশ পরিচিত ছিল। যেখানে কেউ মারা গেছে সেখানেই নন্তু শেখ হাজির। কবর খোঁড়া তার নেশা। কবর খুঁড়তে গিয়ে কোদালের আগায় ওঠে আসা হাড় বা মাথার খুলি দেখিয়ে বর্ণনা করতো মৃত ব্যক্তিদের চেহারা, চরিত্র সম্পর্কে। গত ত্রিশ বছর ধরে যে এগাঁয়ের সকলের কবর দিয়েছে তার লাশটা কবরে নামাতে গিয়ে মন্তুর চোখটা বেদনায় ঝাপসা হয়ে গেল।
ওলা বিবি সম্পর্কে গ্রামের লোকদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে তার একটা পা খোঁড়া। সে মানুষের বা কুকুর, বেড়ালের, চেহারা নিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি বা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যায়। সে জন্য মকবুল বাড়ির সবাইকে সতর্ক করে দিল যাতে তারা পা খোঁড়া কাউকে বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে না দেয়। ওলা বিবির পা কি করে খোঁড়া হল টুনিকে সে ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বলে আমেনা।

সেদিন রাতে মন্তুর ভাল ঘুম হলো না। বারবার পরীবানুর পুঁথির কথা মনে পড়ল। আর ভাবলো টুনিকে নিয়ে যদি ঐ পুঁথির রাখাল ছেলের মতো দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে পারতো। এমনি চিন্তা করতে করতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে ওঠেই আমেনার কাছ থেকে শুনতে পায় মাঝি বাড়ির করিম শেখও কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। কবিরাজ আশা নেই জানিয়ে দেবার পর গনু মোল্লাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যদি ঝাড়ফুঁকে কিছু একটা হয়।

অবশেষে আরো দশ দশটি প্রাণ হরণ করে তবে ওলা বিবি বিদায় হল গ্রাম থেকে। গ্রামের সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, মসজিদে সিন্নি পাঠালো। মিলাদ দিল প্রত্যেক বাড়িতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের বাম দিকের দেয়া প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান দিকের খালি জায়গায় উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মাঝি বাড়িতে ওলা রোগে প্রথম কে মারা যায়?
২. নন্তু শেখের শখ কি ছিল?
৩. জমির শেখ কোথায় কবিরাজ আনতে গিয়েছিল?
৪. মাঝি বাড়ির ছেলেমেয়েগুলোকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল কেন?
৫. আম্বিয়া কেন বিছানায় শুয়েই পিতার শোকে বিলাপ করছিল?
৬. কবর খুঁড়তে নন্তু শেখ কী গান গাইত?
৭. কলিমুল্লা মাঝির মেয়ে কেন এবং কীভাবে মারা গিয়েছিল?
৮. মন্তুর মায়ের কবর কোথায়?
৯. ওলা বিবির একটা পা খোঁড়া কেন?
১০. স্বপ্নে একটা খোঁড়া কুকুরকে কে গ্রামের দিকে আসতে দেখেছে?
১১. 'খোড়া কিছুরে বাড়ির ধারে কাছে আইতে দিয়ো না' - মকবুল কেন বাড়ির সবাইকে এই নিষেধ করে?
১২. সকালে মন্তুকে আমেনা কি খবর দেয়?
১৩. গ্রাম থেকে ওলা চলে যাওয়ায় সবাই বাড়িতে মিলাদ দেয় কেন?

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মাঝি বাড়ির কে মন্তুকে দেখে আর্তনাদ করে ওঠেছিল?
   ক. আম্বিয়া খ. ছমির শেখ
   গ. জমির শেখ ঘ. করিম শেখ
২. নন্তু শেখ কোথায় তাকে কবর দেবার জন্য বলেছিল?
   ক. বাড়ির ওঠোনে খ. বাড়ির বাইরের মাঠে
   গ. পরীর দিঘির পাড়ে ঘ. গ্রামের গোরস্তানে
৩. ভেদবমি শুরু হওয়ায় রাতেই মাঝি বাড়ির কে মারা গিয়েছিল?
   ক. করিম শেখ খ. জমির শেখ
   গ. ছমির শেখ ঘ. নন্তু শেখ
৪. কত বছর ধরে নন্তু শেখ গ্রামের সবার কবর দিয়েছে?
   ক. দশ বছর খ. বিশ বছর
   গ. ত্রিশ বছর ঘ. চল্লিশ বছর
৫. সারাদিন পর টুনি মন্তুকে কোথায় খুঁজে পায়?
   ক. মাঝি বাড়িতে খ. পরীর দিঘির ঘাটে
   গ. নিজের ঘরের মধ্যে ঘ. মায়ের কবরের পাশে
৬. ওলা বিবি কিসের রূপ ধরে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যায়?
   ক. খোঁড়া কাক খ. খোঁড়া মানুষ

গ. খোঁড়া কুকুর ঘ. ওপরের সবগুলো

৭. টুনিকে নিয়ে মন্তু কোথায় চলে যাবে বলে ভেবেছিল?
ক. দূরের কোন শহরে খ. নবীনগরের কোন গ্রামে
গ. শান্তির হাটে ঘ. বামন বাড়ির হাটে

ব্যাখ্যা লিখুন

১. মনে হল ও বড় একা। এ দুনিয়াতে ওর কেউ নেই।
২. এই দুনিয়া দুই দিনের মুসাফির খানা ও ভাইরে।
মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে হইবো কবরে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ওলা ওঠা রোগে সমস্ত গ্রাম কিভাবে শঙ্কিত হয়ে ওঠেছিল তার বর্ণনা দিন।
২. নন্তু শেখের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।
৩. ওলা বিবি সম্পর্কে প্রচলিত লৌকিক উপাখ্যানটির পরিচয় দিন।
৪. মন্তু কেন টুনিকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল তার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মাঝি বাড়িতে ওলা রোগে প্রথম মারা গিয়েছিল নন্তু শেখ।
২. গ্রামে যত মানুষ মারা যেত প্রত্যেকের কবর খুঁড়ে তাকে কবর দেয়া ছিল নন্তু শেখের শখ। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে সে এ কাজ করেছে।
৩. জমির শেখ দুক্রোশ দূরের রতনপুরের হাটে কবিরাজ আনতে গিয়েছিল।
৪. মাঝি-বাড়িতে ওলা বিবি যেভাবে জেঁকে বসেছিল তাতে সবাই শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের এ শঙ্কার কারণে বাড়ির ছেলে মেয়েগুলোকে অন্যগ্রামে তাদের মামাবাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। কারণ এরাই এ পরিবারের ভবিষ্যৎ। তাদেরকে রক্ষা করার জন্যই এই ব্যবস্থা নিয়েছিল ছমির শেখ।
৫. আম্বিয়া নিজেও ওলা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল; তার বিছানা থেকে উঠবারও শক্তি ছিল না। তাই সে বিছানায় শুয়ে শুয়েই মৃত বাবার জন্য শোক করছিল।
৬. কবর খুঁড়তে খুঁড়তে নন্তু শেখ সব সময় একটি গানই সুর করে গাইত। গানটি হচ্ছে :
এই দুনিয়া দুই দিনের মুসাফিরখানা ও ভাইরে।
মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে হইবো কবরে।
৭. কলিমুল্লা মাঝির মেয়ে ছিল অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হল না। তাই একদিন সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা যায়।
৮. পরীর দিঘির পাড়েই ছিল মন্তুর মায়ের কবর।
৯. ওলা বিবিকে হযরত আলী এক হাত ধরে জোরে মাটিতে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। তারপর থেকেই ওলা বিবির একটা পা খোঁড়া।
১০. ফাতেমা স্বপ্নে একটা খোঁড়া কুকুরকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গ্রামের দিকে আসতে দেখেছিল।
১১. ওলা বিবির একটা পা খোঁড়া। তাই সে খোঁড়া কুকুর, খোঁড়া বিড়াল, খোঁড়া মানুষ এমনকি কখনো কখনো খোঁড়া কাকের রূপ ধরেও এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যায়। এ কারণে মকবুল নিজেদের বাড়িকে রোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য সবাইকে এ নির্দেশ দিয়েছিল।
১২. ঘুম থেকে উঠলেই আমেনা মন্তুকে বলে যে মাঝি বাড়ির করিম শেখকেও ওলা বিবি আক্রমণ করেছে।
১৩. ওলা বিবি চলে যাওয়ায় সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তাই আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানানোর জন্যে বাড়িতে বাড়িতে মিলাদ দেয়।

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

১. খ ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ঘ ৬. ঘ ৭. গ

ব্যাখ্যা উত্তর

প্রশ্ন ১ : মনে হল ও বড় একা। এ দুনিয়াতে ওর কেউ নেই।

উত্তর : আলোচ্য অংশটুকু বাংলাদেশের উপন্যাসের অন্যতম পথিকৃত কথাশিল্পী শহীদ জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে লেখক মন্তুর নিঃসঙ্গ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

মন্তু এসংসারে বড় একা। তার মা-বাবা মারা গেছে বহু আগে। জীবনের সূচনা থেকেই সে নিজেকে আবিষ্কার করেছে নিঃসঙ্গ, ছিন্নছাড়া একজন মানুষ হিসেবে। তার ভালমন্দ, আনন্দ-বেদনা কোন কিছুরই ভাগ সে অন্যকে দিতে পারে না। পিতা মাতার স্নেহ কিংবা ভাই-বোনের মমতোটা কোন কিছুই তাকে তেমনভাবে কোনদিন আনন্দিত করে নি। আজ নন্তু শেখের কবর দিয়ে ফেরার সময় পরীর দিঘির পারে তার মায়ের কবরটাও মন্তুর চোখে পড়ল। এক সময় কবরটা বেশ উঁচু ছিল কিন্তু কালের গ্রাসে কবরটা এখন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বসেছে। এখনো হয়তো তার মায়ের দুএকখানা হাড় খুঁড়ে পাওয়া যাবে ঐ কবরে। মায়ের কথা মনে পড়তেই শোকে, বেদনায়, তার মনটা ভারী হয়ে এলো। সে তার মায়ের কবরের পাশে বসে রইল নীরবে। নিঃসঙ্গ, একাকী জীবনে মন্তু যেন তার মায়ের কবরটিকেই সবচেয়ে আপন বলে ভাবতে চাইল। আর সে ভাবনার সূত্রেই তার মনে নতুন করে এ সত্য জেগে উঠলো যে, এই বিশাল পৃথিবীতে সে বড় একা, নিঃসঙ্গ।

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন : ১. ওলা ওঠা রোগে সমস্ত গ্রাম কিভাবে শঙ্কিত হয়ে ওঠেছিল তার বর্ণনা দিন।

উত্তর : ওলা ওঠা রোগে সমস্ত গ্রামটিই যেন শঙ্কিত হয়ে ওঠেছিল। মাঝি বাড়ি এবং মকবুলের শিকদার বাড়ি পাশাপাশি অবস্থিত হলেও একমাত্র মন্তুই ওলা রোগে আক্রান্ত মাঝি বাড়িতে যাবার মতো সাহস দেখায়। আবার মাঝি বাড়িতে যাবার কারণে বুড়ো মকবুল মন্তুকে বকাঝকাও করে। মাঝি বাড়ির ছমির শেখ তাদের বাড়ির ছোঁ ছোঁ ছেলে-মেয়েগুলোকে তাদের মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। যেন বুড়োরা মারা গেলেও বাপ-দাদার ভিটায় বাতি দেবার জন্য ঐ সব ছেলে-মেয়ে বেঁচে থাকে। সতর্ক মকবুল বাড়ির সবাইকে বাড়িতে কোন খোঁড়া প্রাণী বা মানুষ ঢুকতে না দেবার জন্য বাড়ির সবাইকে সতর্ক থাকতে বলে। প্রকৃতপক্ষে মকবুলের এ আচরণ একটি অনির্দেশ্য আতঙ্কেরই ফল। যেদিন থেকে গ্রামে ওলা বিবি এসেছে সেদিন থেকেই গ্রামের মানুষের স্বাভাবিক সব কাজকর্ম বন্ধ, তাদের আলাপ-আলোচনায় ঘুরেফিরে কেবলই ওঠে আসে ওলা বিবি কাকে আক্রমণ করলো কে মারা গেল এ সব কথাবার্তা। গ্রামের মানুষের এসব আচরণের মধ্য দিয়েই তাদের আতঙ্কিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

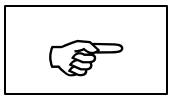

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ১৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বৃষ্টি হবার পর কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন আসে তা বলতে পারবেন।
- মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ে নিয়ে বাড়ির সবার মধ্যেকার উৎসাহের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মকবুল কেন আম্বিয়াকে বিয়ে করতে চাইল তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

ওলা বিবি গেলেন। আর দিন কয়েক পরে বৃষ্টি এলো জোরে। আকাশ কালো করে নেমে এলো অবিরাম বর্ষণ।
সারা রাত মেঘ গর্জন করল। বাতাস বইলো আর প্রচণ্ড বেগে ঝড় হল।
আগের দিন বিকেলে আকাশে মেঘ দেখে বুড়ো মকবুল তার পুরনো লাঙ্গলটা ঠিক করে নিয়েছে। গরু নেই। ওর। রওশন ব্যাপারির কাছ থেকে একজোড়া গরু ঠিকে নিবে। যে কদিন হাল চলবে সে কটা দিনের জন্যে নগদ টাকা দিতে হবে। তাছাড়া গরুর ঘাস-বিচালির পয়সাঁটাও জুটাতে হবে তাকে।
ভোর না হতেই সবাই বেরিয়ে পড়ল মাঠে।
আবুল, মন্তু, সুরত আলী, রশীদ, বুড়ো মকবুল আর গ্রামের সবাই।
পুরুষেরা কেউ বাড়ি নাই।
পুরো মাঠ জুড়ে হাল পড়েছে। পাথরের মতো শক্ত মাটি বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে নরম হয়ে গেছে।
হট হট হট, হুঁ উ উ।
বড় মিয়ার জমিতে লাঙল নামিয়েছে মন্তু আর সুরত।
এককালে এ জমিটা সুরত আলীর ছিল। সরেস জমি। প্রায় মণ সাতেক ধান ফলত তখন। ধানের ভারে গাছগুলো সব নুয়ে পড়ে থাকত মাটিতে।
নিজ হাতে ক্ষেতে লাঙল দিত সুরত। মই দিত। ধান ফেলত খুব সাবধানে। গাছ উঠলে, বসে বসে আগাছাগুলো পরিষ্কার করত।
ছাই আর গোবর ছড়িয়ে দিয়ে যেতো প্রতিটি অঙ্কুরের গোড়ায়। তারপর খাজনার টাকা জোঁটাতে না পেরে ওটা বড় মিয়ার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে সে।
আহা জমিডার কি অবস্থা কইরাছে দেখছস? লাঙল ঠেলতে ঠেলতে সুরত আলী বলল, জমির লাইগা ওগো আধ পয়সার দরদ নাই। দরদ নাই দেইখাই তো জমিনও ফাঁকি দিবার লাগছে।
মন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, গেল বছর মোটে দেড় মণ ধান পাইছে।
কোথায় সাত মণ আর কোথায় দেড় মণ।
বুকটা ব্যথায় টন টন করে উঠল সুরত আলীর। রুগ্ন গরু দুইটাকে হট, হট করে জোরে তাড়া দিয়ে বলল, জমির খেদমতো করণ লাগে। বুঝলা মন্তু মিয়া, জমির খেদমতো করণ লাগে। যত খেদমতো কইরবা তত ধান দিব তোমারে।
শেষের কথাগুলো স্পষ্ট করে শোনা যায় না। আপন মনে বিড়বির করে সুরত। হঠাৎ কোনখানে যদি কতগুলো টাকা পেয়ে যেত তাহলে জমিটাকে আবার কিনে নিত সে। তখন সাত মণের জায়গায় আঁ মণ ধান বের করত সে এ জমি থেকে।
আকাশে এখনও অনেক মেঘ, দক্ষিণের বাতাসে উত্তরে ভেসে যাচ্ছে ওরা। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতে পারে নিচে। সুরত তখনো বলে চলছে আপন মনে। খোদার ইচ্ছা অইলো, জমিনগুলান আমার থাইকা কাইড়া নিলো। খোদার ইচ্ছা অইলো জমিনগুলান বড় মিয়ারে দিয়া দিল। জমির লাইগা যার একটুও মায়াদয়া নাই তারেই দিল খোদা দুনিয়ার সকল জমি। এইডা কেমনতর ইনছাফ অইলো মন্তু মিয়া? ইনছাফ ইনছাফ করো মিয়া। এইডা কেমনতর ইনছাফ অইলো মন্তু মিয়া? হিরর। হট। হট। গরুগুলোর লেজ ধরে জোরে তাড়া দিল সুরত আলী।
অদূরে তার জমিতে ধান ফেলছে। মিশকালো দেহ বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে ঘাম ঝরছে ওর। হাঁটার সময় মনে হচ্ছে মুখ থুবড়ে ক্ষেতের মধ্যে পড়ে যাবে সে। ওটাও বড় মিয়ার ক্ষেত। বর্গা নিয়ে চাষ করছে রশীদ। ওর পাশের ক্ষেতে মই জুড়েছে বুড়ো মকবুল। কাজ করার সময় আশেপাশের দুনিয়াকে একেবারে ভুলে যায় সে। কোথায় কি ঘটছে লক্ষ করে না। ধান ফেলা শেষ হলে, রশীদ ডাকলো অ-ভাইজান।
মকবুল মুখ না তুলেই জবাব দিল, কি কও না।

ধান তো ফালাইয়া দিলাম আল্লার নাম নিয়া।
দাও, দাও ফালায়া দাও। এহন যত তাড়াতাড়ি ফালাইবা তত লাভ।
আর লাভের কথা কইও না। গরুজোড়ার সঙ্গে মই জুড়তে জুড়তে রশীদ জবাব দিল। ধান বেশি অইলেই-বা কি বড় মিয়াকে অর্ধেক দিয়া দেওন লাগব।
ওই দিয়া থুইয়া যা থাকে তাই লাভ। মকবুল সান্ত্বনা দিল ওকে।
সুরত আলী তখনও আপন মনে বলে চলেছে, পরের জমিতে কোন আরাম নাই মন্তু মিয়া, পরের জমি, আরে গরুগুলোর আবার কি অইলো। হট, হট, হুঁ উ উ।
মন্তু ততক্ষণে গান ধরেছে।
হঠাৎ গান থামিয়ে গরুজোড়ার লেজ ধরে সজোরে টান দিল মন্তু।
ইতি, ইতি, ইতি, চল।
সুরত বলল, গান থামাইলি ক্যান মন্তু। গাইয়া যা গাইয়া যা।
মন্তু বলল, না ভাইজান গলাডা হুকাইয়া গেছে, গান বাইরয় না।
হু, হু, দুনিয়াডাই হুকাইয়া গেছে মন্তু মিয়া। তোর গলা হুকায় নাই।
জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সুরত আলী। আমাগো জমানায় আহা, কত গান গাইছি, কত ফুর্তি কইরাছি। আর অহন দুনিয়াডাই আরেক রকম হইয়া গেছে মন্তু মিয়া। গাজী কালুর দুনিয়া আর নাই। সোনাভানের দুনিয়া পুইড়া ছাই অইয়া গেছে। বলে কর্কশ গলায় সে নিজে একখানা গান ধরলো।

যা ছিল সব হারাইলাম হায় পোড়া কপাল দোষে।
ও খোদা,
আমার কপাল এমন তুমি কইরলা কোন দোষে।

গান গাইতে গাইতে খুক খুক করে অনেকক্ষণ কাশল সুরত। বাঁ হাত দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিলো। থাম থাম আরে থামরে নবাবের বেটা। থাম। গরুগুলোকে থামিয়ে তামাক খাওয়ার জন্যে আলের ধারে এসে বসল সে। বলল, মন্তু মিয়া আহ তামুক খাইয়া লও। তামাকের গন্ধ পেয়ে মকবুল আর রশীদ ওরাও ক্ষেত ছেড়ে ওঠে এল। জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বুড়ো মকবুলের দিকে হুঁকোঁটা বাড়িয়ে দিল সুরত। প্রথমে এক নিঃশ্বাসে কিছুক্ষণ হুঁকো টানলো মকবুল। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, মন্তু মিয়া তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আইজ। সইন্ধ্যা বেলা বাড়ি থাইকো।
রশীদ আর সুরত একবার হুঁকোর দিকে তাকাল কিছু বলল না।
ওদের নজর এখন হুঁকোর দিকে।
সন্ধ্যে বেলা বুড়ো মকবুলের কাছ থেকে কথাঁটা শুনল মন্তু। ওর বিয়ের কথা।
মকবুল ঠিক করেছে এবার সত্যি সত্যি একটা বিয়ে করিয়ে দিবে মন্তুকে। চাচা-চাচি এতেঠদিন বেঁচে থাকলে নিশ্চয় বিয়ে দিয়ে দিতেন।
চাচা নেই। মকবুল বেঁচে আছে। বাড়ির মুরব্বি সে। এ ব্যাপারে তার একটা দায়িত্ব রয়েছে।
পাত্রী ঠিক করে নিয়েছে মকবুল। মাঝি-বাড়ির আম্বিয়া।
নন্তু শেখ আর তার ছেলে করিম শেখ কলেরায় মারা যাবার পর আম্বিয়া একা। বসত বাড়িটা, বাড়ির ওপরের ছোঁ ক্ষেতটা আর সে নৌকাঁটার এখন মালিক সে।
ওকে বিয়ে করলে মন্তু অনেকগুলো সম্পত্তি পেয়ে যাবে একসঙ্গে।
রশীদ তার ঘরের চালায় খড় দিয়ে ফুটোগুলো মেরামতো করছিল।
তাকে ডাকল মকবুল। তোমরা এইটার একটা ফয়সালা কইরা ফালাও মিয়া। ওই মাইয়া বেশিদিন থাকবো না। বহু লোকের চোখ পইড়াছে।
ওপর থেকে রশীদ বলল, মাইয়ার হাঁপানি, শেষে বাড়ির সক্কলের হাঁপানি অইবো।
মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বলল, আরে একবার বিয়া কইরা সম্পত্তিগুলান হাত কইরা নিক। পরে দেহা যাইবো, যদি হাঁপানি হয় তো তালাক দিয়া দিব। মন্তু সহসা কিছু বলল না। সে জানে বিয়ে তাকে করতে হবে। আম্বিয়াকে অনেক ভালো লাগছিল তার। সেদিন যদি বুড়ো মকবুল বলতে তাহলে তক্ষুণি রাজি হয়ে যেত সে। আজ ভাবতে গিয়ে অদূরে দাঁড়ানো টুনির দিকে তাকালো মন্তু।
বুড়ো মকবুল বলল, অমন সম্বন্ধ আর পাইবি না মন্তু। চিন্তা করার কিছু নাই। মতো দিয়া দে। কাইল রাইতে গিয়া ওর চাচা ছমির শেখের সঙ্গে আলাপ কইরা আহি।
ফকিরের মা বলল, আপনেরা মুরুব্বি, আপনেরা ঠিক কইরা ফালান।

আমেনা বলল, ঠিক কথা কইছ চাচি।
মন্তু তখনও ভাবছে।
একটা বসতবাড়ি। একটা নৌকা। আর বাড়ির ওপরে এক টুকরো ক্ষেত। দেখতেও সুন্দরী সে।
বুড়ো মকবুল বলল, তাইলে ওই কথাই রইল। কাইল রাইতের বেলা ওর চাচার সঙ্গে আলাপ করি গিয়া।
মন্তু চুপ করে রইল, তারপর খুব আস্তে করে বলল ও আপনেরা যেইডা ভালা মনে করেন, করেন।
মুখ তুলে তাকাতে পারলো না সে। রসুই ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে টুনি। দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাঁছে সে। মন্তুর কথা শুনে সহসা শব্দ করে হেসে উঠল সে। বলল, আমাগো মন্তু মিয়ার বিয়ায় কিন্তুক বড় দেইখ্যা একখানা পালকি আনন লাগব।
বিয়ের কথা শুনে সুরত আলী আর আবুলও সমর্থন জানালো। গনু মোল্লা বলল, ভালা অইছে। মন্তু এইবার সংসারি অইবো।
রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর টুনি মকবুলকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমার একডা কথা আছে।
মকবুল রেগে উঠল। এই রাতেরবেলা এখন ঘুমাতে যাবে। এই সময়ে আবার এমন কি কথা বলতে চায় টুনি। রেগে বলল, কাইল দিনের বেলা কইয়ো।
টুনি বলল, না অহনি লাগব।
বুড়ো মকবুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, আচ্ছা কও কি কথা।
চারপাশে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে কথাঁটা বলল টুনি। মকবুল বড় বোকা। নইলে এমন সুযোগটা কেন হেলায় হারাচ্ছে সে। একটা বসত বাড়ি। একটা ক্ষেত। আর একটা নৌকা। ইচ্ছে করলে ওগুলোর মালিক সেও হতে পারে। সে কেন বিয়ে করে না আম্বিয়াকে। বুড়ো মকবুল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এ সম্ভাবনার কথা সে নিজেও ভাবে নি এর আগে। টুনি যা বলল, শুধু তাই নয় আরো লাভ আছে আম্বিয়াকে বিয়ে করায়।
সারাদিন একটানা ধান ভানতে পারে সে। খাঁতে পারে অসম্ভব।
ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বলল, চিন্তা কইরতাছ কি, চিন্তা করার কিছুই নাই।
এ মুহূর্তে টুনিকে ওর নিজের চেয়েও অনেক বড় বলে মনে হল মকবুলের। মনে হল টুনির কাছে নেহায়েত একটা শিশু সে।
একটু পরে চাপা গলায় মকবুল বলল, বড় বউ আর মাইঝা বউ যদি রাজি না হয়?
টুনি বলল, রাজি অইবো না ক্যান। নিশ্চয় অইবো।
মকবুল বলল, ওগো না অয় রাজি করুন গেল। কিন্তু আম্বিয়া?
মকবুলের কণ্ঠস্বরে গভীর অন্তরঙ্গতা।
টুনি বলল, চেষ্টা কইরলে সব অয়, অইব না ক্যান?
এতেঠক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ওরা। মকবুল বলল, বহ বউ। বহ।
টুনি বসল ওর পাশে। দুজনে পাশাপাশি। মকবুলের কাঁধের ওপর একখানা হাত রাখল টুনি। তারপর নীরবে অনেকক্ষণ বসে রইল ওরা। বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের ওঠোনে বসিয়ে কিচ্ছা বলছে ফকিরের মা। সওদাগরের কিচ্ছা। একমনে হা করে শুনছে সবাই।
সালেহা কাঁদছে ওর ঘরে। কাল দুপুরে ওর মুরগিটাকে শিয়ালে নিয়ে গেছে ধরে। সেই শোকে কাঁদছে সে।
আমেনা আর ফাতেমা দুজনকে ডেকে এনে সামনে বসিয়ে কথাঁটা বলল বুড়ো মকবুল।
শুনে আমেনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, এমন কি অভাব আছে আপনের যে ওকে বিয়ে করতে চান।
ফাতেমা বলল, এই বুড়ো বয়সে মাইনষে কইবো কি?
টুনি বলল, মাইনষের কথা হুইনা কি অইবো। মাইনষে তো অনেক কথা কয়। তবু ফাতেমা আর আমেনা ঘোর আপত্তি জানাল। মকবুল অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল ওদের। কিন্তু ওরা রাজি হল না।
অবশেষে মকবুল রেগে গেল, শাসিয়ে বলল, অত কথা বুঝি না। আম্বিয়ারে বিয়া আমি করমুই। তোমরা পছন্দ কর কি না কর।

শব্দার্থ ও টীকা

অবিরাম বর্ষণ – একটানা বৃষ্টি। **ঠিকে নিবে** – ধার নেবে। **সরেস** – শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, উত্তম। **জমিন** – জমি শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **খেদমতো** – সেবা, যত্ন, পরিচর্যা। **ইনছাফ** –ন্যায় বিচার। **ধান তো ফালায়া দিলাম** – ধান মাটিতে বুনে দিলাম এ অর্থে। **সান্ত্বনা** – আশ্বাস দিয়ে শান্ত করা, প্রবোধ। **গাজী কালু, সোনাভান** – পুঁথি সাহিত্যের বিখ্যাত সব চরিত্র। **ফয়সালা** – মীমাংসা, মিটিয়ে ফেলা। **চোখ পইড়াছে** – অনেকের নজর পড়েছে। **সম্বন্ধ** – বিয়ের প্রস্তাব অর্থে

এখানে ব্যবহৃত। **নেহায়েত** – সামান্য। **গভীর অন্তরঙ্গতা** – খুব অন্তরঙ্গভাবে। **কিচ্ছা** – গল্প, অধিকাংশই রূপকথা বিষয়ক। **প্রতিবাদ** – আপত্তি। **শাসানো** – ভয় দেখানো।

বস্তুসংক্ষেপ

ওলা বিবি চলে যাবার পর আকাশ কালো করে নেমে এল অবিরাম বর্ষণ। পাথরের মতো শক্ত মাটি বৃষ্টির ছোঁয়ায় নরম হয়ে এলো। বাড়ির সবাই মাঠে চলে গেল চাষের জন্য। বুড়ো মকবুল, মন্তু, রশীদ, সুরত আলী কেউ বাদ রইল না। জমিতে চাষ দেয়া, ধান, ফেলা এগুলোর ফাঁকে ফাঁকে গান গায় মন্তু আর সুরত আলী। কাজের ফাঁকে আলের ওপর গাছের ছায়ায় বসে খানিকটা জিরিয়েও নেয় সকলে। সে অবসরে হুঁকো টানতে টানতে মকবুল সন্ধ্যে বেলা মন্তুকে বাড়িতে থাকতে বলে, তার সঙ্গে জরুরি আলাপ আছে বলে।

সন্ধ্যা বেলা মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ের প্রস্তাবটা দেয় মকবুল। সবাই প্রস্তাবটা এক বাক্যে মেনে নেয় না। রশীদ বলল, আম্বিয়ার হাঁপানি আছে, ফলে ঐ মেয়ে বাড়ির বৌ হয়ে এলে সবাইকে বিপদে ফেলবে।

সে রকম কথা যে মকবুলও ভাবে নি এমন নয়। কিন্তু নন্তু শেখ আর করিম শেখের মৃত্যুর পর আম্বিয়া জমি, নৌকা, বাড়ি এ সব কিছুর একাই মালিক হয়ে উঠবে। আর যদি নিতান্তই হাঁপানি হয়েই যায় তবে জমিগুলো হাত করে আম্বিয়াকে তালাক দিয়ে দেবে মন্তু। এ-কথা বলে বাড়ির সবাইকে রাজি করায় মকবুল।

রাতেরবেলায় খাবার-দাবার শেষ হলে টুনি কৌশলে মকবুলকে বলে যে যদি নিজেই মকবুল আম্বিয়াকে বিয়ে করে তবে মন্তুর বদলে ঐ সব সম্পদের মালিক মকবুলও হতে পারে। প্রথমটায় মকবুল খানিকটা আপত্তি করে, লোকের কথা ভেবে পিছিয়েও যায়। কিন্তু টুনি তাকে সাহস দেয়, কীভাবে অন্যদের কথা মোকাবেলা করবে সে ব্যাপারে পরামর্শ দেয়। অবশেষে মকবুল টুনির কথামতো আমেনা আর ফাতেমাকে ডেকে বলে মন্তু নয় আম্বিয়াকে মকবুল নিজেই বিয়ে করবে। দুই বউয়ের প্রবল আপত্তিকে তোয়াক্কা না করে মকবুল তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. ওলা বিবি চলে গেলে প্রকৃতিতে কী হল?
   ক. অবিরাম বর্ষণ — খ. সারারাত মেঘের গর্জন
   গ. প্রচণ্ড বাতাস — ঘ. ক, খ, গ তিনটিই

২. আকাশে মেঘ দেখে মকবুল কী করেছে?
   ক. দুটো গরু ধার নিয়েছে — খ. ঘরের চালটা মেরামতো করেছে
   গ. পুরনো লাঙ্গল ঠিক করেছে — ঘ. বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করেছে

৩. বড় মিয়ার জমিতে লাঙ্গল নামিয়েছে কে কে?
   ক. মন্তু আর সুরত — খ. মন্তু আর মকবুল
   গ. সুরত আর মকবুল — ঘ. রশীদ আর মকবুল

৪. 'জমির খেদমতো করণ লাগে' - কে বলেছিল এ-কথা?
   ক. রশীদ — খ. সুরত
   গ. মকবুল — ঘ. মন্তু

৫. হঠাৎ কোন খানে টাকা পেয়ে গেলে সুরত কী করবে?
   ক. জমিটাকে আবার কিনে নেবে — খ. গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে
   খ. থাকার ঘরটা মেরামতো করবে — ঘ. আর একটা বিয়ে করবে

৬. আম্বিয়াকে বিয়ে করার বুদ্ধি মকবুলকে কে দেয়?
   ক. আমেনা — খ. সালেহা
   গ. ফাতেমা — ঘ. টুনি

৭. 'মন্তু এইবার সংসারী হবে।' গনু মোল্লা কেন এটা ভেবেছিল?

ক. মন্তুর সংসারে একটা বন্ধন হবে বলে　　খ. মন্তু অনেক সম্পদ পাবে বলে
গ. মন্তুর জীবনে সুখ আসবে বলে　　ঘ. ওপরের কোনটিই নয়

৮. 'বহু লোকের চোখ পইড়াছে মকবুল এ-কথা কার সম্পর্কে বলেছিল?
ক. হীরন সম্পর্কে　　খ. আম্বিয়া সম্পর্কে
গ. টুনি সম্পর্কে　　ঘ. কলিমুল্লা মাঝির মেয়ে সম্পর্কে

৯. সুরত কেন তার জমিটা বড় মিয়াকে বিক্রি করে দিয়েছে?
ক. চিকিৎসার টাকার জন্য　　খ. বোনের বিয়ের টাকা জোগাড়ের জন্যে
গ. খাজনার টাকা জোগাড় করতে না পেরে　　ঘ. জমিতে ভাল ফসল হত না বলে

এক কথায় উত্তর দিন

(প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত স্থানে উত্তর লিখুন)

ক. মকবুল কার কাছ থেকে এক জোড়া গরু ঠিকে নেবে বলে ভেবেছিল?
ক. ... ...

খ. পাথরের মতো মাটি বৃষ্টির ছোঁয়ায় কী হয়েছে?
খ. ... ...

গ. বড় মিয়ার জমিটা এককালে কার ছিল?
গ. ... ...

ঘ. জমির প্রতি দরদ না থাকলে জমি কী করে?
ঘ. ... ...

ঙ. কার জমিতে রশীদ বর্গা চাষ করে?
ঙ. ... ...

চ. 'ওই দিয়া থুইয়া যা থাকে তাই লাভ' - মকবুল কাকে বলেছিল একথা?
চ. ... ...

ছ. 'গাজী কালুর দুনিয়া নেই বলে কে আক্ষেপ করেছিল?
ছ. ... ...

জ. মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ে একথা মন্তুকে মকবুল কখন বলে?
জ. ... ...

ঝ. মন্তুর বিয়ের আলোচনার সময় টুনি কোথায় দাঁড়িয়েছিল? কী করছিল?
ঝ. ... ...

ঞ. ফকিরের মা ওঠোনে বসিয়ে কিসের কিচ্ছা শুনাচ্ছিল?
ঞ. ... ...

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৃষ্টির পর কৃষি নির্ভর গ্রামীণ জীবনে যে পরিবর্তন ঘটে তার পরিচয় দিন।
২. মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ের ব্যাপারে বাড়ির অন্যদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৩. মকবুল কেন আম্বিয়াকে বিয়ে করতে চাইল? এতে টুনির ভূমিকা কি ছিল? - ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ঘ　২. গ　৩. ক　৪. খ　৫. ক　৬. ঘ　৭. ক　৮. খ　৯. গ

এক কথায় উত্তর

ক. রওশন ব্যাপারির কাছ থেকে।
খ. বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে নরম হয়ে গেছে।
গ. বড় মিয়ার জমিটা এককালে সুরতের ছিল।

ঘ. জমিও ফাঁকি দেয়।
ঙ. বড় মিয়ার জমিতে।
চ. মকবুল একথা বলেছিল রশীদকে।
ছ. সুরত আলী।
জ. সন্ধ্যে বেলায়
ঝ. রসুই ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে টুনি দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাঁছিল।
ঞ. সওদাগরের কিচ্ছা।

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন-১ : বৃষ্টির পর কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনে যে পরিবর্তন ঘটে তার পরিচয় দিন।

উত্তর : এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার সর্বটাই প্রায় নির্ভরশীল প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর। শুকনো মওসুমে কৃষকেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে কখন বৃষ্টি আসবে আর কখন তারা জমিতে বীজ বুনবে। তাই বৃষ্টি হবার পর গ্রামের সবাই বেরিয়ে পড়ে জমির কাজে। বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ পাওয়া যায় না তখন।

জমিতে কাজ করতে করতেই তখন তারা নিজেদের সুখ দুঃখের কথা ভাগাভাগী করে নেয়। কোন জমি কার ছিল, খেদমতো না করার ফলে জমির কী দুর্গতি হয় এ-সব নিয়ে তারা কথা বলে। ক্লান্ত হয়ে পড়লে আলের ধারে বসে তামাক খায়। আবার মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে গান গায়। গানের মধ্যেও প্রকাশিত হয় তাদের জীবনের না পাওয়ার যত বেদনা।

প্রশ্ন-২ঃ মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ের ব্যাপারে বাড়ির অন্যদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।

উত্তর : মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ের ব্যাপারে প্রধানত উদ্যোগী হয় মকবুল। বাড়ির মুরুব্বি হিসেবে সে এটাকে তার দায়িত্ব বলে মনে করেছে। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবটি সবার সামনে উত্থাপনের পর একবাক্যে বাড়ির সবাই রাজি হয়ে যায় না। বিশেষত রশীদ আপত্তি করে আম্বিয়ার হাঁপানি আছে বলে। এক সময় মকবুলও একই কারণে আপত্তি করেছিল। কিন্তু আম্বিয়া তার বাপ-ভাইয়ের মৃত্যুর পর একসঙ্গে বেশ কিছু সম্পত্তির মালিক হয়েছে বলে মকবুল আর এখন আপত্তি করছে না। তা-ছাড়া মকবুলের সোজা সাপ্টা মীমাংসা যদি তেমন কোন সমস্যা দেখা দেয় তবে জমিগুলো হাতে এসে যাবার পর তাকে মন্তু তালাক দিয়ে দিতে পারবে। এ কথা শুনে সুরত আলী আর আবুল মকবুলকে সমর্থন করলো। গনু মোল্লা মন্তুর বিয়ের পর সে এবার সংসারী হতে পারবে, এ আশা করে খুশি হল। টুনি যদিও এসব আলোচনায় ছিল না, সে খুশি হলো কি-না বোঝা গেল না। কেবল রসুই ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বলল, মন্তুর বিয়ের সময় একটা বড় পালকি আনতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ১৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- টুনি কিভাবে আম্বিয়া আর মন্তুর বিয়েতে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল তা বলতে পারবেন;
- কোন পরিপ্রেক্ষিতে মকবুল তার দুই স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন;

কথাঁটা চাপা থাকল না।
পরদিন বাড়ির সবাই জেনে গেল ব্যাপারটা।
মন্তুর বিয়ে সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে নিজের বিয়ের কথা বলে এসেছে মকবুল।
কথাঁটা আমেনা আর ফাতেমার কাছ থেকে শুনেছে সবাই।
মন্তু রীতিমতো অবাক হল।
সালেহা ওঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, ইতা কেমন কথা অ্যাঁ। মাইনষে হুনলে কইবো কি?
ফকিরের মা বলল, মকবুল মিয়ার এইডা উচিত অয় নাই। যাই কও মিয়া, এইডা উচিত অয় নাই।
আমেনা আর ফাতেমা দুজনে মিলে গনু মোল্লার কাছে কাঁদাকাটি করেছে। বলেছে, মাইনষে হাসা-হাসি কইরবো। আপনে উনারে বাধা দেন। আপনের কথা ওনি হুনবেন। সুরত আর আবুলকে ডেকে ওদের সঙ্গে আলাপ করল গনু মোল্লা। বলল, বাড়ির বদনাম অইয়া যাইব।
শুনে সুরত আলী আর আবুল দুজনে ক্ষেপে উঠল। এইসব কি অ্যাঁ, বুড়ার কি ভীমরতি অইছে নাহি?
আবুল বলল, বুড়ো বয়সে এইসব কি পাগলামি শুরু অইছে।
কিছু বলল না শুধু মন্তু।
রাতে গনু মোল্লার ঘরে জমায়েত হল সবাই।
রশীদ এল। আবুল এল। সুরত আলী, সালেহা, আমেনা, ফাতেমা, ফকিরের মা সবাই এল।
এল না শুধু মন্তু, টুনি, আর যাকে নিয়ে বসা সেই বুড়ো মকবুল।
মকবুল তার ঘরের মধ্যে নীরবে বসে রইল।
সব কিছু সেও শুনেছে।
গনু মোল্লার ঘরে ওরা কেন জমায়েত হয়েছে সব বুঝতে পেরেছে সে।
এর মূলে আমেনা আর ফাতেমা। ওর দুই স্ত্রী। যাদের এতেঠদিন খাইয়েছে পরিয়েছে সে। নিমকহারাম, এক নম্বরের নিমকহারাম। চাপা আক্রোশে গর্জাতে লাগল বুড়ো মকবুল। টুনি বলল, ওগো হিংসা অইতাছে। ওরা চায় না আপনে সম্পত্তির মালিক অন।
টুনি ঠিক বলেছে, বাড়ির কেউ চায় না ও আম্বিয়াকে বিয়ে করুক।
বিয়ে করলে একদিনে অনেকগুলো সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে বুড়ো মকবুল। বাড়ির কেউ সেটা সহ্য করতে পারছে না।
এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে ওর হাতে তুলে দিল টুনি। বলল, মাথা গরম কইরেন না। এই সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখন লাগে।
গনু মোল্লার ঘরে সবাই জমায়েত হলেও মকবুলকে সেখানে ডেকে আনার জন্যে যেতে কেউ সাহস করল না।
আবুল বলল, সুরতকে যেতে।
সুরত বলল, ফকিরের মার কথা। ফকিরের মা ভয়ে আঁতকে ওঠে বলল, ওরে বাবা আমি যাইবার পারমু না।
অবশেষে গনু মোল্লাকে আসতে হল।
ওঠোন থেকে মকবুলের নাম ধরে ডাকলো সে। মকবুল বেরুলো না। বেরিয়ে এল টুনি।
একটু পরে ভেতরে এসে টুনি বলল, আপনারে যাইতে কয়, গনু মোল্লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বুড়ো মকবুল বলল, ক্যান, ক্যান, যাইতে কয়।
টুনি বলল, কি কথা আছে।
মকবুল বলল, কথা এখানে আইসা কইতে পারে না। আমি যামু ক্যান? টুনি ওকে শান্ত করল। বলল, মাথা গরম কইরেন না, যান না ওরা কি কয় শুনেন গিয়া।
স্ত্রীর মুখের দিকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাকাল বুড়ো মকবুল।

তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়াল সে।
বুড়ো মকবুলকে গনু মোল্লার ঘরে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে বসল সবাই।
কারো মুখে কথা নেই।
টুনি এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো মকবুলের পাশে।
গনু মোল্লা তার নামাজের চৌকিটার ওপরে বসল। সবাই চুপ।
কেউ কিছু বলছে না।
কথাঁটা কি দিয়ে যে শুরু করবে ভেবে উঠতে পারছে না কেউ।
টুনিই প্রথম কথা বলল, কই আপনেরা কিছু কইতেছেন না ক্যান। ক্যান ডাকছেন, কন না।
সুরত আলী নড়েচড়ে বসল।
আমেনা নীরব।
ফাতেমা মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
গনু মোল্লা বলল, মন্তুর বিয়ার ব্যাপারে কি অইছে। কথাঁটা বলে, মকবুলের দিকে তাকাল সে।
বুড়ো মকবুল কোন জবাব দেবার আগেই টুনি বলল, মন্তু কইছে ও আম্বিয়াকে বিয়া করবো না।
ওর কথা শুনে পরস্পর মুখের দিকে তাকাল সবাই।
ফকিরের মা বলল, কই মন্তু মিয়া কই, তারে ডাহ না।
কিন্তু মন্তুকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে সে। টুনি বলল, ডাহন লাগবো না ওরে, ও আমারে কইছে বিয়া কইরবো না।
আবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তাইলে আমি বিয়া করুম আম্বিয়ারে। আমার ঘরে বউ নাই খানাপিনার অসুবিধা অয়।
ওর কথা সম্পূর্ণ না হতেই আমেনা আর ফাতেমা একসঙ্গে বলে উঠল, হু তোমার একটা বউ দরকার।
বুড়ো মকবুল টুনির দিকে তাকাল।
টুনি বলল, ক্যান, ধইরা ধইরা মাইরা কবরে পাঠাইবার লাইগা নাহি।
আবুল রেগে উঠল, আমার বউ যদি আমি মারি তোমার তাতে কি?
চুপ কর বেয়াদব, হঠাৎ গর্জে উঠল মকবুল। এই জিন্দেগিতে আর তোরে বিয়া করামু না আমরা। তিন তিনটা মাইয়ারে তুই কবরে পাঠাইছস। আবার বিয়ার নাম করছে, সরমও লাগে না। একটুখানি দম নিয়ে বুড়ো পরক্ষণে বলল, আম্বিয়ারে আমি বিয়া করমু ঠিক করছি। বলে টুনির দিকে তাকাল সে।
আমেনা আর ফাতেমা পরমুহূর্তে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, আপনেরা শুনছেন, শুনছেন আপনেরা ইতা কিতা কইবার লাগছে উনি।
যা কইছি ঠিক কইছি। আঙ্গুল তুলে ওদের দুইজনকে শাসাল মকবুল। তোমাগো যদি ভালো না লাগে তোমরা বাড়ি ছাইড়া চইলা যাও।
শুনছেন শুনছেন আপনেরা। কি কয় শুনছেন। আমেনা কেঁদে ফেলল। গনু মোল্লা বলল, এইডা ঠিক অইলো না মকবুল মিয়া। এইডা কোন কামের কথা অইলো না। এই বুড়ো বয়সে আরেকডা বিয়া কইরলে মাইনষে কি কইবো।
সুরত আলী আর ফকিরের মা বলল, মাইনষে বাড়ির বদনাম করবো।
আমেনা বলল, মাইয়া বিয়া দিছে, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছি ছি কইরবো না।
কটমট চোখে আমেনার দিকে তাকাল মকবুল।
ফাতেমা বলল, বুড়ো বয়সে ভূতে পাইছে।
'নিমকহারাম' বলে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল বুড়ো মকবুল। তারপর অকস্মাৎ এক অবাক কান্ড ঘটিয়ে বসল সে। ঘরের মাঝখানে, এতেঠগুলো লোকের সামনে হঠাৎ আমেনা আর ফাতেমা দুজনকে একসঙ্গে তালাক দিয়ে দিল সে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, তোরা বাইরইয়া যা আমার বাড়ি থাইক্যা।
ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে চমকে উঠল।
পরক্ষণে একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আমেনা।
ফাতেমা মূর্ছা গেল।
ফকিরের মা চিৎকার করে উঠল, আহারে পোড়াকপাইল্যা, এই কি কইরলি তুই, ওরে পোড়াকপাইল্যারে এই কি কইরলি
আবুল হঠাৎ বসার পিঁড়িটা হাতে তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারল মকবুলের কপাল লক্ষ করে। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ অ্যাঁ। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ, বেআকেইল্যা কোনহানের।
দুহাতে কপাল চেপে মাটিতে বসে পড়লো মকবুল। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ফিনকির মতো রক্ত ঝরছে ওর।

কান্না, চিৎকার, গালাগালি আর হা-হুতাশে সমস্ত ঘরটা মুহূর্তে নরকের রূপ নিল।
মকবুলকে দুহাতে কাছে টেনে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল টুনি।
ফাতেমার মাথায় পানি ঢালতে লাগল সালেহা।
ফকিরের মা আমেনাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলল।
ওঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে সব শুনল মন্তু। সব দেখল সে।
কিন্তু কাউকে কিছু বলল না। নীরবে পরীর দিঘির দিকে চলে গেল সে।
পরদিন বিকেলে খবর পেয়ে আমেনা আর ফাতেমার বাড়ির লোক এসে নিয়ে গেল ওদের। যাবার সময় করুণ বিলাপে পুরো গ্রামটাকে সচকিত করে গেল ওরা। এতেঠদিনের গড়ে তোলা সংসার এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ঘরের পেছনে লাগানো লাউ কুমড়ার মাচাগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমেনা। যাবার সময় ফকিরের মাকে কেঁদে কেঁদে বলে গেল, হীরনকে খবরডা দিয়ো না। শুইনলে, মাইয়া আমার বুক ভাসাইয়া মইরা যাইব। খোদার কসম রইল, বুয়া, মাইয়ারে আমার খবরডা দিয়ো না।
ফাতেমাকে নেয়ার জন্য ভাই এসেছিল ওর। যাবার সময় বাড়ির সবাইকে শাসিয়ে গেছে ও। বলে গেছে শিকদার-বাড়ির লোকগুলোকে একহাত দেখে নেবে সে। বোনের জন্য চিন্তা করে না ও। আগামী তিন মাসের মধ্যে এর চেয়ে দশগুণ ভাল ঘর দেখে ফাতেমার বিয়ে দিয়ে দেবে।
মকবুল বিছানায়। মাথায় ওর একটা পট্টি বেধেঁ দিয়েছে টুনি। হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে বুড়োর। মাঝে দুএকবার চোখ মেলে তাকিয়েছিল। এখন নীরবে ঘুমুচ্ছে। টুনি পাশে বসে বাতাস করছে ওকে। রাতে গনু মোল্লা এল ওর ঘরে। বুড়ো মকবুলের গায়ে মাথায় হাত দিয়ে ওর জ্বর আছে কিনা দেখল। তারপর আস্তে করে বলল, রাগের মাথায় ইতা কিতা কইরলা মিয়া। শরীর ভালা অইয়া গেলে ভাবীসাবগোরে বাড়ি নিয়া আহ। রাগের মাথায় তালাক দিলে তো আর তালাক অয় না। ওই তালাক অয় নাই তোমার।
এক বাটি বার্লি হাতে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল টুনি। ওকে আসতে দেখে গনু মোল্লা চুপ করে গেল।
টুনির ওপরে আক্রোশ পড়েছে সবার। সবাই বুঝতে পেরেছে, এই যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে এর জন্যে টুনিই দায়ী।
ওঠোনে দাঁড়িয়ে অনেকে অনেক কথা বলল। ওর নাম ধরে অনেক গালাগাল আর অভিশাপ দিল বাড়ির ছেলেমেয়েরা।
টুনি নির্বিকার। একটি কথারও জবাব দিল না।

শব্দার্থ ও টীকা

ওনারে - তাঁকে, এখানে মকবুলকে। **ক্ষেপে উঠল** - ভীষণ রেগে গেল। **ভীমরতি** - বয়সের কারণে বুদ্ধি লোপ বা কমে যাওয়া। **সম্পত্তি** - সম্পদ, টাকা পয়সা, জমি ইত্যাদি। **নামাজের চৌকি** – নামাজ পড়বার জন্য ছোঁ আকারের চৌকি। **খানাপিনা** – খাবার দাবার। **এই জিন্দেগিতে** – এ জীবনে। **সরম** – লজ্জা। **শাসাল** – সতর্ক বা সাবধান করল। **নিমকহারাম** – যে উপকারী উপকার স্বীকার করে না বা ক্ষতি করে। **বাইরইয়া যা** – বের হয়ে যায়। **আর্তনাদ** – তীব্র চিৎকার। **মূর্ছা** – জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। **বেআকেইল্যা** – বুদ্ধিহীন। **ফিনকি** – খুব বেগে বের হয়ে আসা। **নরক** – দোজখ। **সচকিত** – ভয়ে চমকে বা কাঁপিয়ে দেয়া। **আক্রোশ** – রাগ, ক্রোধ। **নির্বিকার** – বিকারহীন, ভাবলেশহীন।

বস্তুসংক্ষেপ

আম্বিয়ার সঙ্গে মন্তুর বিয়ে সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে মকবুল পাত্র হিসেবে নিজের বিয়ের কথা বলে এসেছে- এ-কথাঁটা বাড়িতে আর চাপা থাকলো না। অদ্ভুত কথাঁটা জানাজানি হয়ে গেলে বাড়িতে সবার মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। ব্যাপারটাকে কেউ ভালভাবে নেয় না। বিশেষ করে আমেনা আর ফাতেমা। তারাই বাড়ির সবাইকে ডেকে গণু মোল্লার ঘরে একত্রিত করে, ব্যাপারটার একটা বিহিত করানোর জন্যে। গনু মোল্লার ঘরে সকলে সমবেত হলেও টুনি, মকবুল আর মন্তু এলো না। গনু মোল্লা মকবুলকে ডেকে এনে সবার মধ্যে হাজির করলো। মন্তুর বিয়ের ব্যাপারটা তার কাছে বাড়ির সবাই জানতে চাইলে তাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই টুনি বলে, মন্তু আম্বিয়াকে বিয়ে করতে চায় না বলে তাকে জানিয়েছে। সে কারণে মকবুল নিজেই আম্বিয়াকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু বাধ সাধে আবুল, বাড়ির অন্য সবাই, বিশেষ করে ফাতেমা আর আমেনা। কিন্তু আম্বিয়ার সঙ্গে আবুলের বিয়ে দিতে মকবুল রাজি হয় না। কারণ এর মধ্যেই সে তিন তিনটে বউকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। এসব তর্কবিতর্কে যখন গনু মোল্লার ঘরে প্রবল উত্তেজনা চলছিল তারই এক পর্যায়ে ফাতেমা আর আমেনার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে মকবুল তাদেরকে তালাক দিয়ে দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতবাক হয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ

আবুল তার বসার পিঁড়িটা মকবুলের কপাল লক্ষ করে সজোরে ছুঁড়ে মারে। পিঁড়ির আঘাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে মকবুলের কপাল থেকে। এসব কিছুই মন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে সবার অলক্ষে বেরিয়ে যায় পরীর দিঘির পাড়ে।
পরদিন আমেনা আর ফাতেমার বাপের বাড়ির লোকজন এসে তাদেরকে নিয়ে যায়। তালাকপ্রাপ্ত দুই সতীন চলে যাবার পর যদিও টুনি সংসারের সব কাজ দেখাশুনা এবং বুড়ো মকবুলের সেবা-যত্ন করছিল, তবুও বাড়ির সবাই টুনির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কারণ তারা বুঝতে পারে এতেঠসব ঘটনা, সবই ঘটিয়েছে টুনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের বাম দিকের দেয়া প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান দিকের খালি জায়গায় উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'কথাঁটা চাপা থাকল না'। - কোন কথাঁটা?
২. ফাতেমা আর আমেনা মকবুলকে কোন ব্যাপারে বাধা দিতে বাড়ির সকলকে বলেছিল?
৩. রাতে বাড়ির সবাই কোথায় সমবেত হয়েছিল?
৪. বাড়ির সবাই সমবেত হলেও অনুপস্থিত ছিল কে কে?
৫. মকবুলকে গনু মোল্লার ঘরে কে ডেকে এনেছিল?
৬. 'মন্তু কইছে ও আম্বিয়াকে বিয়া করবো না।' - কে বলেছিল?
৭. তাইলে আমি বিয়া করুম আম্বিয়ারে' - কে বিয়ে করতে চেয়েছিল?
৮. 'নিমকহারাম' বলে চিৎকার করে বুড়ো মকবুল কি কাণ্ড ঘটাল?
৯. আবুল কিভাবে মকবুলকে মেরেছিল?
১০. আমেনা বাবার বাড়ি যাবার সময় ফকিরের মাকে কি অনুরোধ করেছিল?
১১. বাড়ির লোকেরা এতেঠ সব ঘটনার জন্য কাকে দায়ী করলো?
১২. ফাতেমার ভাই মকবুলের বাড়ির সবাইকে কি বলে শাসিয়েছিল?

শূন্যস্থান পূরণ করুন

K. ইতা কেমন কথা অ্যাঁ। ---------- হুনলে কইবো কি?
L. এই সব কি অ্যাঁ, বুড়ার কি ---------- অইছে নাহি?
M. টুনি বলল, ওগো হিংসা ----------। ওরা চায়না আপনে ---------- হন।
N. ---------- ঘরে সবাই জমায়েত হলেও মকবুলকে সেখানে ডেকে আনার জন্যে যেতে কেউ ----------।
0. বুড়ো মকবুলকে গণু মোল্লার ঘরে ঢুকতে দেখে ---------- সবাই।
P. ---------- আর তোরে বিয়া করামু না আমরা। তিন তিনটা মাইয়ারে তুই ----------।
Q. আমেনা বলল, ----------, আর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ----------।
R. ---------- বুড়া অইছ, ---------- কোন হানের।
S. যাবার সময় ---------- পুরো গ্রামটাকে ---------- গেল ওরা।
T. টুনি ----------। একটি ---------- দিল না।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. টুনি কেন এবং কিভাবে মন্তু আর আম্বিয়ার বিয়েতে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল?
২. আমেনা ও ফাতেমা কে মকবুল কোন পরিপ্রেক্ষিতে তালাক দেয় তা বর্ণনা করুন।

উত্তরামালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মকবুল যে নিজেই আম্বিয়াকে বিয়ে করতে চায় সেই কথাঁটা।

২. আম্বিয়াকে বিয়ে করার ব্যাপারে।
৩. গনু মোল্লার ঘরে বাড়ির সবাই সমবেত হয়েছিল।
৪. মন্তু, টুনি আর মকবুল অনুপস্থিত ছিল।
৫. গনু মোল্লা নিজেই মকবুলকে ডেকে এনেছিল।
৬. টুনি মকবুলের হয়ে একথা বলেছিল।
৭. আবুল বিয়ে করতে চেয়েছিল আম্বিয়াকে।
৮. চিৎকার করে আমেনা আর ফাতেমাকে তালাক দিয়ে দিল।
৯. আবুল তার বসার পিঁড়ি ছুঁড়ে দিয়ে মকবুলকে মেরেছিল।
১০. তাকে তালাক দেবার খবর যেন কোনভাবেই হীরনকে দেয়া না হয়।
১১. এতেঠসব অঘটনের জন্য টুনিকেই বাড়ির লোকেরা দায়ী করল।
১২. সে সিকদার বাড়ির লোকদের দেখে নেবে।

শূন্যস্থান পূরণ

ক. মাইনষে
খ. ভীমরতি
গ. অইতাছে, সম্পত্তির মালিক
ঘ. গনু মোল্লার, সাহস করল না
ঙ. নড়েচড়ে বসল
চ. এই জিন্দেগিতে, কবরে পাঠাইছস।
ছ. মাইয়া বিয়া দিছে, ছি ছি কইরবো না।
জ. ঘাস খাইয়া, বে আকেইল্যা
ঝ. করুণ বিলাপে, সচকিত
ঞ. নির্বিকার, কথারও জবাব

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ১ : টুনি কেন এবং কিভাবে মন্তু আর আম্বিয়ার বিয়েতে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল?

উত্তর : টুনি প্রকৃতপক্ষে মন্তুকে ভালবাসতো, এ ব্যাপারটা তার নানারকম কথা, আচার আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বুড়ো মকবুলের তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে টুনির জীবনে তার স্বামীকে কেন্দ্র করে কোন সুখ বা আনন্দ ছিল না। মকবুলের সংসারে সে একটা মূল্যহীন পরগাছার মতোই বসবাস করছিল। ফলে সংসার জীবনের একটি বিরূপ পরিস্থিতিতে তার সমবয়সী, যার সঙ্গে তার মনের মিল সম্ভব হয়েছিল সেই মন্তুর প্রতি সে উৎসাহী হয়ে পড়েছিল, ভালবেসে ফেলেছিল মনের অজান্তেই, সুতরাং তার সমব্যথী, যাবতীয় কর্মকান্ডের সঙ্গী মন্তুর যখন বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল, স্বাভাবিকভাবেই টুনি তা মেনে নিতে পারেনি। মন্তুর বিয়ে হয়ে গেলেই সে টুনির কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাবে, এ ভাবনাই টুনিকে ষড়যন্ত্র করতে উৎসাহী করে।

যাতে মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ে না হয় সেজন্য মকবুলকে সে প্রলুব্ধ করে আম্বিয়াকে বিয়ে করার জন্যে। মকবুলও টুনির কথায় এবং হঠাৎ করে কতকগুলো সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠার লোভে আম্বিয়াকে বিয়ে করতে রাজি হয়। মকবুলের এই সিদ্ধান্তে বাড়ির সবাই প্রতিবাদ করে কিন্তু সে তার অবআন থেকে সরে আসতে রাজি হয় না। এই নিয়ে সারা বাড়িতে একটা প্রবল সমস্যা উপস্থিত হয়। গনু মোল্লার ঘরে সালিশ বসে, আবুলের সঙ্গে, আমেনা আর ফাতেমার সঙ্গে মকবুরের বাদানুবাদ, তর্ক-বির্তক হয়। উত্তেজিত হয়ে মকবুল তার দুই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফেলে। আর এ ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে আবুল পিঁড়ি ছুড়ে মেরে মকবুলকে আহত করে দেয়। সব মিলিয়ে একটি বিশ্রী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় মকবুলের পরিবারে। বাড়ির সবাই বুঝতে পারে এসব কিছুই ঘটেছে টুনির ষড়যন্ত্রে- ফলে তারা টুনিকে নানা কটু কথা শোনায়। কিন্তু টুনি নির্বিকারভাবে সব কিছু শুনে যায়, কারো কোন কথার জবাব দেয় না।

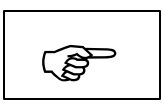

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ১৬

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- অসুস্থ মকবুলের প্রতি টুনির সেবা পরায়ণতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মন্তু ও আম্বিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

দিন কয়েক পরে আম্বিয়ার চাচা ছমির শেখ জানিয়ে দিয়ে গেল, বুড়ো মকবুলকে বিয়ে করবে না আম্বিয়া। তাছাড়া খুব শীঘ্রই আম্বিয়ার বিয়ের সম্ভাবনাও নেই।

কথাঁটা শুনল বুড়ো মকবুল। শুনে কোন ভাবান্তর হল না। ঘরের কড়ি-কাঠের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। ইদানীং দিনরাত মকবুলের সেবা শুশ্রুষা করছে টুনি। সারাক্ষণ সে ওর আশেপাশে থাকে। একটু অবকাশ পেলে রসুই ঘরে গিয়ে রান্নাবান্নার পাঁটা সেরে আসে সে। মরিচ ক্ষেত আর লাউ কুমড়োর গাছগুলোর তদারক করে আসে। মাঝে মাঝে ফকিরের মা আর সালেহার আলাপ শুনে টুনি। মন্তু আর আম্বিয়াকে নিয়ে আলাপ করে ওরা। আজকাল নাকি অনেক রাত পর্যন্ত আম্বিয়াদের বাড়িতে থাকে মন্তু। টুনি শুনে। কিছুই বলে না। একদিন বিকেলে মন্তু যখন বাইরে বেরুবে তখন তার সামনে এসে দাঁড়াল টুনি। বলল, জ্বরডা ওর ভীষণ বাইড়া গেছে। কবিরাজের কাছ থাইকা একটু ওষুধ আইনা দিবা?

ওর মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মন্তু। ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি। হঠাৎ বয়সটা যেন অনেক বেড়ে গেছে ওর। চোখের নিচে কালি পড়েছে। চুলগুলো শুকনো।

মন্তু ইতস্তত করছিল।

টুনি আবার বলল, আজকা না হয় মাঝি-বাড়ি না গেলা। একটু ওষুধটা আইনা দাও।

ওর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো ম্লান হাসি।

মন্তু কি জবাব দেবে ভেবে পেল না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বলল, যাইবা না ক্যান, একশ বার যাইবা। ঘর থেকে বুড়ো মকবুলের ডাক শুনে আর সেখানে দাঁড়াল না টুনি। পরক্ষণে চলে গেল সে।

ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মন্তু। তারপর বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেল।

রাতে কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল মন্তু। বর্ষা এগিয়ে আসছে।

আম্বিয়া বলেছে, নৌকাটা ঠিক করে নেবার জন্যে। চাচা ছমির শেখ চেয়েছিল নৌকাঁটা নিজে বাইবে।

কিন্তু আম্বিয়া রাজি হয়নি। মন্তু ছাড়া অন্য কাউকে ওতে হাত দেবার অধিকার দিতে রাজি নয় সে।

ছামির শেখ রেগে গালাগাল দিয়েছে ওকে। মন্তু সম্পর্কে কতগুলো অশ্লীল মন্তব্য করে বলেছে, ওর সঙ্গে তোমার মিলামিশা কিন্তুক ভালো অইতাছে না আম্বিয়া। গেরামের লোকজনে পাঁচ রকম কথাবার্তা কইতাছে।

কউক। তাগো কথায় আমার কিছু আইবো যাইবো না। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিয়েছে আম্বিয়া।

ওর স্পষ্ট উত্তরে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়েছে ছমির শেখ। বলেছে, তোমার কিছু আহে না আহে, আমাগো আহে। মন্তুরে কিন্তুক এই বাড়িতে আইতে নিষেধ কইরা দিও বইলা দিলাম। তবু বারবার মন্তুকে বাড়িতে ডেকেছে আম্বিয়া।

ও গেলে সংসারের নানা কথা নিয়ে আলাপ করেছে ওর সঙ্গে।

আজও মন্তুর জন্যে অপেক্ষা করছিল আম্বিয়া।

ও আসতে একখানা পিঁড়ি এগিয়ে দিল আম্বিয়া।

অর্ধেকটা মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। সলজ্জ হাসির ঈষৎ আভাঁটা চোখে পড়েও যেন পড়তে চায় না। আম্বিয়া বলল, এতেঠ দেরি অইলো?

মন্তু বলল, কবিরাজের কাছে গিছলাম।

কেন গিয়েছিল তা নিয়ে আর প্রশ্ন করে না আম্বিয়া।

দূরে নিজ ঘরের দাওয়ায় বসে আড়চোখে বারবার এদিকে তাকায় ছমির শেখ আর বিড়বিড় করে কি যেন সব বলে।

রাতে ওখানে খেলো মন্তু।

পানটা মুখে পুরে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

বাইরে তখন ইলশেগুঁড়ি পড়ছে।

ক'দিন পর পর বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার ওপর দিয়ে পানি গড়াচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশে। পানির সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ ছোঁ বেলে আর পুঁটি ছুটোছুটি করছিল এদিকে সেদিকে।
অন্ধকারের ভেতর মকু আর ছকু দুভাই মাছ ধরছিল বসে বসে।
মন্তুকে দেখে বলল, কি মিয়া এতেঠ রাইতে কোন্ দিক থাইক্যা?
মাঝি-বাড়ি।
হুঁ। একটু পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে ছকু বলল, চইল্যা যাও ক্যান মন্তু মিয়া। তামুক খাইয়া যাও।
না মিয়া শরীরডা ভালা নাই।
মন্তু যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে ছকু বলল, আরে মিয়া যাইবা আর কি বও। কথা আছে।
কি কথা কও। জলদি কও। পায়ের পাতায় ভর করে মাটিতে বসল মন্তু।
নিঝুম রাত। শুধু একটানা জল গড়ানোর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দুএকটা ব্যাঙ ডাকছে এখানে ওখানে। আরো তিন চারটে পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে ছকু আস্তে বলল, কি মন্তু মিয়া তুমি নাহি করিমনের বইন আম্বিয়ারে বিয়া কইরতাছ হুনলাম। বলে অন্ধকারে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসল সে। তামাক খেতে খেতে ওর দিকে তাকাল মন্তু। কিছু বলল না।
কি মন্তু মিয়া চুপ কইরা রইলা যে? ওকে কনুইয়ের একটা গুঁতো মারল ছকু। বিয়া শাদি করবার আগে আমাগোরে একটু জানাইয়ো, একটু দাওয়াত ইওয়াত কইরো।
করমু। করমু। আগে বিয়া ঠিক হোক তারপর করমু। একলাফে ওঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে।
দাওয়ার পাশে টুনি দাঁড়িয়ে। অন্ধাকরে হঠাৎ চেনা যায় না।
মন্তুর পায়ের গতিটা শ্লথ হয়ে এল।
ওঠোনে সালেহা আর ফকিরের মা বসে। মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ে নিয়ে আলোচনা করছে ওরা। আম্বিয়ার চাচা আজ বলেছে, সামনের শুক্রবার জুমার নামাজের পর গাঁয়ের মতোবরদের কাছে কথাঁটা তুলবে সে। বিচার চাইবে।
ফকিরের মা বলল, আমি কিন্তুক একটা কথা কইয়া দিলাম বউ। এই মাইয়া একেবারে অলক্ষুইণা। যেই ঘরে যাইবো সব পুড়াইয়া ছাই কইরা দিবো।
সালেহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক কইছ চাচি।
কথাঁটা বলতে গিয়ে আমেনা আর ফাতেমার কথা মনে পড়ে গেছে ওদের। আম্বিয়ার জন্যেই তো ওদের তালাক দিয়েছে বুড়ো মকবুল।
নিজেও পড়েছে মরণ রোগে।
ওঠোনে এসে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল মন্তু।
সালেহা আর ফকিরের মা কথা থামিয়ে তাকাল ওর দিকে।
টুনি কিছু বলল না। একটু নড়লো না। চুপচাপ রইল।
মন্তু ঘরে গিয়ে দরজা এঁটে দিল।
কাল ভোরে আবার বেরুতে হবে ওকে।
অবশেষে মকবুল মারা গেল।
ধলপহর হওয়ার অনেক আগে যখন সারা গ্রাম ঘুমে অচেতন তখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিল সে।
সারা রাত কেউ ঘুমাল না।
গনু মোল্লা, আবুল, রশীদ, সালেহা, মন্তু, টুনি সবাই জেগে রইল মাথার পাশে।
সন্ধ্যাবেলা ফকিরের মা বলছিল লক্ষণ বড় ভালা না।
তোমরা কেউ ঘুমায়ো না মিয়ারা, জাইগা থাইকো।
বহু লোককে হাতের ওপর দিয়ে মরতে দেখেছে ফকিরের মা। তাই, রোগীর চেহারা আর তার ভাবভঙ্গি দেখে সে অনেকটা আন্দাজ করতে পারে।
সারা রাত প্রলাপ বকেছে বুড়ো মকবুল।
কখনো আমেনার নাম ধরে ডেকেছে সে। কখনো ফাতেমার জন্য উতলা হয়ে ওঠেছে। আবার কখনো প্রলাপের ঘোরে গরু তাড়িয়েছে। হুঁ হট-হট। আরে মরার গরু চলে না ক্যান। হুঁ হট-হট।
মাথার কাছে বসে সারাক্ষণ কোরান শরীফ পড়লো গনু মোল্লা।
তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এলো বুড়ো মকবুল। প্রলাপ বন্ধ হল।
একটু পরে মারা গেল সে।

ওর বুকের ওপর পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল টুনি।
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল সে।
তার বিলাপের শব্দ অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে দূরে পরীর দিঘির পাড়ে মিলিয়ে গেল।
বিস্ময়ভরা চোখে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল মন্তু।
পরদিন দুপুরে বুড়ো মকবুলের মৃতদেহটা যখন কাফনে আবৃত করে খাটিয়ার ওপর তোলা হল তখন বুক ফাঁটা আর্তনাদ করে ওঠোনের মাঝখানে ডাঙায় তোলা মাছের মতো তড়পাতে লাগল টুনি। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা নানা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল ওকে। সালেহা, ফকিরের মা, সুরতের বউ ওরাও অনেক কান্নাকাটি করল অনেকক্ষণ ধরে।
পরীর দিঘির পাড়ে বুড়ো মকবুলকে কবর দিয়ে আসার পর সবার মনে হল বাড়িটা যেন কেমন শূন্য হয়ে গেছে। একটা থমথমে ভাব নেমে এসেছে গাছের পাতায়। ঘরের চালে। ওঠোনে। বাড়ির পেছনে। ছোঁ পুকুরে। আর সবার মনে। একটি লোক দীর্ঘদিন ধরে একবারও ঘরের দাওয়ায় বেরুতে পারেনি, বিছানায় পড়ে ছিল। যার অস্তিত্ব ছিল কি ছিল না সহসা অনুভব করা যেত না, সে লোকটা আজ নেই। কিন্তু তার এই না থাকাই যেন সমস্ত থাকার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে।
সারা দুপুর টুনি কাঁদল।
সারা বিকেল।
সারা সন্ধ্যা।
সালেহা অনেক চেষ্টা করল ওকে কিছু খাওয়াতে। সে খেল না।
ফকিরের মা বলল কিছু খাও বউ। না খাইলে শরীর খারাপ অইয়া যাইবো। কিছু খাও।
তবু খেল না টুনি।
মন্তু, সুরত আলী, আবুল, রশীদ, কারো মুখে কোন কথা নেই। কেউ দাওয়ায়, কেউ ওঠোনে, কেউ দোর-গোড়ায় বসে।
আজ সহসা যেন সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলেছে ওরা।
মিয়াবাড়ির মসজিদ থেকে আযানের শব্দ ভেসে আসছে। মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে গামছাঁটা কাঁধে চড়িয়ে নামাজ পড়তে চলে গেল গনু মোল্লা। সুরত আলী, রশীদ আর আবুলও ওঠে দাঁড়াল।
রোজ যে তাড়া নামাজ পরে তা নয়। কিন্তু আজ পড়বে। বুড়ো মকবুলের মৃত্যু হঠাৎ পরকাল সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে ওদের।
পুকুর থেকে অজু করে এসে সুরত আলী বলল, কই যাইবা না মন্তু মিয়া?
মন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর বলল, চলো।
বলতে গিয়ে গলাঁটা অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে উঠলো ওর।
দিন তিনেক পর নৌকা নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল মন্তু।
টুনি ডাকলো, শোন।
মন্তু তাকিয়ে দেখল এ কয়দিনে ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি।
চোয়ালের হাড় দুটো বেরিয়ে পড়েছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে তার। মুখখানা বিষণ্ন। মাথায় ছোঁ একটা ঘোমটা।
মন্তু বলল, কি।
টুনি চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে আস্তে করে বলল, আমার একটা কথা রাইখবা?
মন্তু বলল, কও।
মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল টুনি। তারপর আস্তে করে বলল, আমারে একদিন সময় কইরা আমাগো বাড়ি পৌঁছায়া দিয়া আইবা? টুনির চোখজোড়া পানিতে ছলছল করছে।
বুড়ো মকবুল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ির সাথে সকল সম্পর্কে শেষ হয়ে গেছে টুনির। আর কতদিন এখানে এমনি করে পড়ে থাকবে সে।
মন্তু আস্তে করে বলল, ঠিক আছে যামুনি। কোন্ দিন যাইবা?
টুনি মৃদু গলায় বলল, যেই দিন তোমার সুবিধা হয়। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল সে।
মন্তু বিব্রত বোধ করল। কি বলে যে ওকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেল না সে।

শব্দার্থ ও টীকা

অবিরাম বর্ষণ – একটানা বৃষ্টি। **ঠিকে নিবে** – ধার নেবে। **সরেস** – শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, উত্তম। **জমিন** – জমি শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **খেদমতো** – সেবা, যত্ন, পরিচর্যা। **শীঘ্রি** – তাড়াতাড়ি। **ইদানীং** – সম্প্রতি, বর্তমানে, আজকাল। **কড়ি-কাঠ** – ঘরের চাল ধরে রাখার জন্য লোহা বা কাঠের আড়াআড়ি দেয়া কাঠ। **সেবা-শুশ্রুষা** – আদর যত্ন। **তদারক করে** – দেখাশুনা করে। **অশ্লীল মন্তব্য** – অশালীন বা খারাপ কথা। **পাঁচরকম** – নানা রকম। **নির্লিপ্ত** – উদাসীন। **হক চকিয়ে** – হতভম্ব হয়ে।। **সলজ্জ হাসি** – লজ্জা মাখানো হাসি। **ইলশেগুঁড়ি** – গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। **নিঝুম রাত** – গভীর রাত। **শ্লথ** – ধীর। **অলক্ষুইণা** – অশুভ লক্ষণযুক্ত। **এঁটে দিল** – আঁকে দিল। **প্রলাপ** – বিলাপ, অর্থহীন কথাবার্তা। **উতলা** – অস্থির। **দাওয়ায়** – বারান্দায়। **অস্তিত্ব** – যা আছে এমন, সত্তা। **ছলছল** – চোখে জলপূর্ণ হয়ে থাকা, কাঁদো কাঁদো অবস্থায় চোখের পাতা পানিতে ভিজে আসা।

বস্তুসংক্ষেপ

আম্বিয়ার চাচা ছমির শেখ একদিন জানিয়ে যায় যে, বুড়ো মকবুলকে বিয়ে করতে আম্বিয়া রাজি হয়নি। অসুস্থ মকবুল ছমির শেখের কথা শুনলো নীরবে, কোন কথা বলল না। মকবুল অসুস্থ হবার পর থেকে অধিকাংশ সময় বিছানাতেই কাঁটায়। বাড়ির সকল কাজকর্ম সামাল দিয়ে টুনি যারপরনাই আন্তরিকতার সঙ্গে মকবুলের সেবাযত্ন করে।

এদিকে মন্তু সকলকে উপেক্ষা করে মাঝি বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলো। আম্বিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক গভীর হতে থাকলো এই যাতায়াতের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আম্বিয়ার চাচা বিষয়টাকে ভাল চোখে দেখতে পারলো না। তিনি আম্বিয়াকে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও যখন আম্বিয়া মন্তুকে তাদের বাড়িতে আসতে বারণ করে না, তখন তিনি ব্যাপারটা সামনের জুমার নামাজের পর গ্রামের মোড়লদের কাছে তুলবেন বলে আম্বিয়াকে শাসালেন। কিন্তু আম্বিয়া এ-সব কথায় মোটেই পাত্তা দেয় না। এ সব ঘটনার মধ্য দিয়ে টুনির কাছ থেকে মন্তু আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে থাকে।

অসুস্থতায় ধুঁকে ধুঁকে মকবুল একরাতে মারা যায়। টুনি মকবুলের মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদে, গোসল, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে শোকে মোহ্যমান হয়ে পড়ে। পরীর দিঘির পাড়ে বুড়ো মকবুলের কবর দেয়া হয়। তার মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটা যেন ফাঁকা হয়ে যায়, বাড়ির সবার মধ্যেই এক ধরনের মৃত্যু ভয় জাগিয়ে তোলে মকবুলের মৃত্যু।

কয়েকদিন পর টুনি মন্তুকে কাছে পেয়ে তাকে সময় করে বাপের বাড়ি নবীনগরে রেখে আসতে বলে। মন্তুও তাকে সময় করে একদিন রেখে আসবে বলে জানায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মকবুলকে বিয়ে করতে যে আম্বিয়া রাজি হয়নি এ-কথা মকবুলকে কে জানায়?

ক. টুনি　　খ. ছমির শেখ

গ. গনু মোল্লা　　ঘ. সালেহা

২. টুনি মন্তুকে অসুস্থ মকবুলের জন্য কী এনে দিতে অনুরোধ করে?

ক. কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ　　খ. বাজার থেকে কিছু ফল

গ. মকবুলের ক্ষেতের ধান কেটে দিতে　　ঘ. হাঁ থেকে কিছু ভাল চাল

৩. আম্বিয়ার ওপর তার চাচা রেগে ছিল কেন?

ক. নৌকাঁটা তাকে দেয়নি বলে　　খ. মন্তুকে আম্বিয়া নৌকা দিয়েছিল বলে

গ. মন্তু মাঝি বাড়িতে আসতো বলে　　ঘ. ওপরের সবগুলোই

৪. 'তাগো কথায় আমার কিছু আইবো যাইবো না' কে, কাদের সম্পর্কে বলেছিল?

ক. মন্তু বলেছিল, মকবুল সম্পর্কে　　খ. টুনি বলেছিল, গ্রামের লোকদের সম্পর্কে

গ. আম্বিয়া বলেছিল, গ্রামের লোকদের সম্পর্কে　　ঘ. আম্বিয়া বলেছিল, তার চাচাদের সম্পর্কে

৫. মাঝি বাড়ি থেকে বেরিয়ে মন্তু দেখলো-
ক. বাইরে ইলশেগুঁড়ি পড়ছে
খ. বাইরে ঝড় বইছে
গ. বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার
ঘ. বাইরে হাড় কাঁপানো শীত

৬. রাস্তায় গড়িয়ে যাওয়া পানিতে কে মাছ ধরছিল?
ক. মন্তু আর আবুল
খ. ছকু আর আবুল
গ. গনু মোল্লা আর মকু
ঘ. ছকু আর মকু

৭. 'এই মাইয়া একেবারে অলক্ষুইণা' - কে, কার সম্পর্কে বলেছিল?
ক. আম্বিয়ার চাচা, আম্বিয়া সম্পর্কে
খ. টুনি, আম্বিয়া সম্পর্কে
গ. ফকিরের মা, আম্বিয়া সম্পর্কে
ঘ. সালেহা, টুনি সম্পর্কে

৮. মকবুল কখন মারা যায়?
ক. ভোর রাতের আগে
খ. খুব সকাল বেলায়
গ. মাঝ রাতের দিকে
ঘ. ধল পহর হওয়ার অনেক আগে

৯. মকবুলকে কোথায় কবর দেয়া হল?
ক. বাড়ির ওঠোনে
খ. পরীর দিঘির পাড়ে
গ. গ্রামের গোরস্থানে
ঘ. মিয়া বাড়ির মসজিদের পাশে

১০. বুড়ো মকবুলের মৃত্যু বাড়ির সকলকে কোন ব্যাপারে সচেতন করে তোলে?
ক. মৃত্যু সম্পর্কে
খ. ধর্ম সম্পর্কে
গ. জীবন সম্পর্কে
ঘ. পরকাল সম্পর্কে

বাক্য গঠন করুন

কড়ি কাঠ = ...
নির্লিপ্ত = ...
হকচকিয়ে = ...
সলজ্জ হাসি . . . . . .
ইলশে গুঁড়ি = ...
নিঝুম রাত = ...
শ্লথ = ...
প্রলাপ = ...
উতলা = ...
অস্তিত্ব = ...

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অসুস্থ মকবুলের প্রতি টুনির সেবা পরায়ণতার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
২. মন্তু ও আম্বিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে আপনার ধারণা বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. ঘ ৪. গ ৫. ক ৬. ঘ ৭. গ ৮. ঘ ৯. খ ১০. ঘ

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন : অসুস্থ মকবুলের প্রতি টুনির সেবা পরায়ণতার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়েকে কেন্দ্র করে একটি ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিল টুনি। সে চায়নি মন্তু আম্বিয়াকে বিয়ে করে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাক। ঐ উদ্দেশ্য সফল করতে বুড়ো মকবুলকে সে ব্যবহার করে। কিন্তু তার ষড়যন্ত্রের কারণে আমেনা আর ফাতেমাকে বুড়ো মকবুল তালাক দিয়ে দেবে এবং আবুল মকবুলকে আঘাত করে এভাবে আহত করবে এমনটি আশা করে নি। সে কেবল মন্তু আর টুনির বিয়েটা যাতে না হয় তাই চেয়েছিল। কিন্তু তারই ষড়যন্ত্র বিষময় ফলে সমগ্র পরিবারের ওপরেই যখন নেমে আসে একটি বিপর্যয় তখন টুনি নিজেই যেন অবাক হয়ে যায়। ঘটনার নিয়ন্ত্রণ আর কোনভাবেই তার হাতে থাকে না। বিপর্যস্ত পরিবারের দিকে তাকিয়ে টুনির মনে যেন একটা অনুশোচনা জেগে ওঠে। সে অনুশোচনার মধ্যে দিয়েই তার মানসিকতায় এক ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়। যে বুড়ো মকবুলকে সে কোন দিনই সহ্য করতে পারত না তাকেই টুনি অসুস্থ অবস্থায় প্রাণপণে সেবা করতে শুরু করে। ঘরদোর গুছিয়ে, রান্না-বান্না করে, মরিচ ক্ষেত আর লাউ-কুমড়োর গাছগুলোকে যত্ন করে আবার মকবুলকেও সেবাযত্ন করে। এতেঠ পরিশ্রমের ফলে টুনির চেহারায় ক্রান্তির একটা ছাপ পড়ে যায়। তবুও সে অক্লান্তভাবে বুড়ো মকবুলকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

বুড়ো মকবুলের মৃত্যুর পর টুনির আর্ত চিৎকারে সমস্ত বাড়ি যেন সচকিত হয়ে ওঠে, সে খাবার-দাবার ভুলে যায়। এসব আচরণের মধ্যে দিয়ে আমরা যেন অনুশোচনায় দগ্ধ টুনির মনের ছবিই দেখতে পাই।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ১৭

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- টুনি ও মন্তুর জীবনের পরিণতির কথা বলতে পারবেন;

একে একে বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিল টুনি।

সবার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদল সে।

পরীর দিঘির পাড়ের ওপর দিয়ে আসার সময় দূর থেকে বুড়ো মকবুলের কবরটা চোখে পড়ল। শুকনো মাটির সাদা ঢেল গুলো ঢিপির মতো উঁচু হয়ে আছে। সেদিকে তাকাতে সারা দেহে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কি এক অজানা ভয়ে বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে যেন।

ভাঁটার স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে দিল মন্তু।

সেই নৌকা।

যার মধ্যে চড়িয়ে টুনিকে তার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল সে। দুধারে গ্রাম। মাঝখানে নদী। যতদূর চোখে পড়ে শুধু অথই জলের ঢেউ। বর্ষার পানিতে নদী-নালা ক্ষেত সব এক হয়ে গেছে। এ সময়ে ভরা নদী দিয়ে নৌকা চালানোর প্রয়োজন হয় না। ক্ষেতের ধারে গেরস্থ বাড়ির পেছনের ডোবার পাশ দিয়ে নৌকা চালিয়ে নেয়া যায়। এতে করে পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।

টুনি ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসে রইল। মাথায় ছোঁ একখানা ঘোমটা।

মন্তু সহসা বলল, বাইরে আইসা বস না। গায়ে বাসাত লাইগবো।

টুনি পরক্ষণে বলল, আইতাছি। কিন্তু সহসা এল না সে।

এল অনেকক্ষণ পরে।

বাইরে কাঠের পাঁটাতনের ওপরে ছোঁ হয়ে বসল টুনি।

সেই নদী।

পুরনো নদী।

আগে যেমনটি ছিল তেমনি আছে।
আজ নদীর জলে হাতের পাতা ডুবিয়ে দিয়ে খেলা করল না টুনি।
উচ্ছল দৃষ্টি মেলে তাকাল না কোন দিকে।
শুধু বলল, আম্বিয়ারে বিয়া কইরলে এই নাওডা তোমার অইয়া যাইবো না?
মন্তু সংক্ষেপে বলল, হু।
টুনি বলল, বিয়ার পরে এই বাড়িতে থাইকবা, না আম্বিয়াগো বাড়ি চইলা যাইবা?
এ কথার কোন জবাব দিল না মন্তু। সে শুধু দেখল, ঘোমটার ফাঁকে একজোড়া চোখ গভীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।
উত্তর না পেয়ে টুনি আবার বলল, চুপ কইরা রইলা যে?
মন্তু হঠাৎ দূরে আঙুল দেখিয়ে বলল, শান্তির হাঁ।
টুনি চমকে তাকাল সেদিকে।
ভাঁটার স্রোত ঠেলে নৌকাঁটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে শান্তির হাটের দিকে। সার বাঁধা দোকানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।
সহসা জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগল মন্তু। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল নৌকা। পড়তে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল টুনি। মাথার ওপর থেকে ঘোমটাটা পড়ে যেতে পরক্ষণে সেটা তুলে নিল আবার।
মন্তু এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গভীরভাবে কি যেন দেখছে সে।
নৌকাঁটাকে ঘাটের দিকে এগোতে দেখে টুনি বরল, ঘাটে ভিড়াইতাছ ক্যান, নামবা নাকি?
মন্তু চুপ করে রইল।
টুনি আবার বলল, হাটে কি কোন কাম আছে?
মন্তু মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ মরিয়া গলায় বলল, মনোয়ার হাজিরে কথা দিছলাম ওরা ওইখানে এক রাইতের লাইগা নাইয়র থাকুম। চল যাই।
টুনির দেহটা ধরে কে যেন একটা সজোরে নাড়া দিল। মুহূর্তে চোখজোড়া পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলে ওর। মন্তুর মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে।
মন্তু আবার বলল, মনোয়ার হাজিরে কইলে ও মোল্লা ডাইকা সব ঠিক কইরা দিবো। আবেগে গলাঁটা কাঁপছে ওর।
টুনির চোখের কোণে তখনও দুফোঁটা জল চিকচিক করছে। অত্যন্ত ধীরে ধীর মাথাঁটা নাড়াল সে। আর অতি চাপা স্বরে ফিসফিস করে বলল, না তা আর অয় না মিয়া। তা অয় না। বলতে গিয়া ডুকরে কেঁদে উঠল সে। হাতের বৈঠাঁটা ছেড়ে দিয়ে বোবা চাউনি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মন্তু। একটা কথাও আর মুখ দিয়ে বেরুল না ওর।
তারপর।
তারপর নদীর স্রোতে বয়ে চলল। কখনো ধীরে কখনো জোরে। কখনো মিষ্টি মধুর ছন্দে।
সেদিন হাঁবার। সওদা করে বাড়ি ফিরছে মন্তু। দুই পয়সার পান।

শব্দার্থ ও টীকা

অবিরাম বর্ষণ – একটানা বৃষ্টি। **ঠিকে নিবে** – ধার নেবে। **সরেস** – শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, উত্তম। **জমিন** – জমি শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **খেদমতো** – সেবা, যত্ন, পরিচর্যা। **পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে** – পথের দূরত্ব কমে যায়। **নাওডা** – নৌকাঁটা। **নাইয়র** – যাত্রা বিরতি। **বোবা চাউনি** – ভাবলেশহীন চোখে।

বস্তুসংক্ষেপ

মকবুলের মৃত্যুর কয়েকদিন পর টুনি বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়। পরীর দিঘির পাড় দিয়ে যাবার সময় বুড়ো মকবুলের কবরটা চোখে পড়লে একটা অজানা ভয়ে টুনির বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।
মন্তু টুনিকে নিয়ে ভাঁটার স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে দিল। সেই নৌকা যাতে করে মন্তু টুনিকে নিয়ে এসেছিল তার বাপের বাড়ি থেকে। টুনি নৌকার ছইয়ের মধ্যে নিঃশব্দে বসে রইল। এখন বর্ষার সময়। ভরা নদী বলে নৌকা পার ঘেঁষে চালিয়ে নিচ্ছিল মন্তু। টুনিকে মন্তু ছইয়ের বাইরে এসে বসতে বলল, কারণ বাইরে বাতাস ছিল। সেই একই নদী দিয়ে নৌকা চালিয়ে নিয়ে

যাচ্ছিল মন্তু, কিন্তু আগের বারের মতো নদীর পানিতে হাত দিয়ে খেলা করলো না টুনি, উচ্ছল চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখলো না।

মন্তুর মুখেও কথা নেই। তারা দুজনেই সেই পুরনো মানুষ, পুরনো তাদের সম্পর্ক কিন্তু মকবুলের মৃত্যু তাদের দুজনকে যেন পৃথিবীর দুই প্রান্তের মানুষ করে দিয়েছে। টুনি হঠাৎ দুএকটা প্রশ্ন করল মন্তুকে, কোনটারই ঠিকমতো জবাব দিল না সে। কিন্তু খেয়াল করলো টুনির দুটি পলকহীন চোখ তার দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে।

এমন সময় শান্তির হাঁ দেখে মন্ত সেখানে নৌকা ভেড়ানোর চেষ্টা করে। কেন সে শান্তির হাটে নৌকা ভিড়াচ্ছে জানতে চায় টুনি। মন্তু জানায় এর আগে সে মনোয়ার হাজিকে কথা দিয়েছিল একদিন তার বাড়িতে থেকে যাবে। আজ সে নামবে ওখানে, হাজিকে বললে মোল্লা ডেকে তাদের বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। কথাঁটা বলবার সময় আবেগে মন্তুর গলাঁটা থরথর করে কাঁপে। কিন্তু টুনি সায় দেয় না মন্তুর এ-প্রস্তাবে। সে কেবল ফিসফিস করে বলে, 'না তা আর অয় না মিয়া। তা অয় না।' কথাঁটা বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে টুনি। ওর কথায় মন্তুর হাতের গতি যেন নিঃশেষিত হয়ে যায়। একটা বোবা চাউনি মেলে সে তাকিয়ে থাকে টুনির দিকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের বাম দিকের দেয়া প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং ডান দিকের খালি জায়গায় উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বিদায় নেবার সময় টুনি কী করেছিল?
২. পরীর দিঘির পাড় দিয়ে আসবার সময় মকবুলের কবর দেখে টুনির কী প্রতিক্রিয়া হয়?
৩. মন্তু যখন নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল টুনি তখন কী করছিল?
৪. শান্তির হাঁ দেখে মন্তু জোরে নৌকা চালাতে শুরু করল কেন?
৫. 'মনোয়ার হাজিরে কইলে ও মোল্লা ডাইকা সব ঠিক কইরা দিবো'। মন্তু কী ঠিক করে দেবার কথা বলেছে?
৬. বর্ষার সময় ভরা নদী দিয়ে নৌকা চালানোর প্রয়োজন হয় না কেন?

শূন্যস্থান পুরণ

১. --- --- --- --- স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে দিল মন্তু।
২. বর্ষার পানিতে --- --- --- --- সব এক হয়ে গেছে।
৩. টুনি --- --- --- --- চুপচাপ বসে রইল। মাথায় ছোঁ একখানা --- --- --- --- ।
৪. বাইরে কাঠের পাঁটাতনের --- --- --- --- বসল টুনি।
৫. সে শুধু দেখল, --- --- --- --- ফাঁকে --- --- --- --- গভীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।
৬. মনোয়ার হাজিরে কথা দিছিলাম ওর ওইখানে --- --- --- লাইগা --- --- --- --- থাকুম।
৭. টুনির দেহটা ধরে কে যেন একটা --- --- --- --- দিল।
৮. মুহূর্তে --- --- --- --- মতো স্থির হয়ে গেল ওর।
৯. হাতের বৈঠাঁটা ছেড়ে দিয়ে --- --- --- --- মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মন্তু।
১০. তারপর নদীর স্রোতে --- --- --- ---। কখনো --- --- --- ---। কখনো --- --- --- ---।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মন্তু ও টুনির জীবনের পরিণতি বর্ণনা করুন।

ব্যাখ্যা লিখুন

১. তারপর নদীর স্রোতে বয়ে চলল। কখনো ধীরে কখনো জোরে। কখনো মিষ্টি মধুর ছন্দে।

উত্তরমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় টুনি সবার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল।

২. পরীর দিঘির পাড়ে বুড়ো মকবুলের শুকনো কবরটা দেখে টুনির সারা দেহ কাঁটা দিয়ে ওঠে। একটা অজানা ভয়ে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।
৩. টুনি তখন নৌকার ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসে ছিল।
৪. শান্তির হাটে মন্তু নৌকা ভিড়িয়ে মনোয়ার হাজির বাড়িতে রাত্রিযাপন করতে চেয়েছিল। হাঁ কাছাকাছি চলে আসায় উৎসাহে মন্তু জোরে নৌকা চালাতে শুরু করেছিল।
৫. মন্তু আর টুনির বিয়ের ব্যাপারটা ঠিক করে দেবার কথা বলেছে।
৬. বর্ষার পানিতে নদী-নালা, ক্ষেত এক হয়ে যায় বলে ক্ষেতের ধার দিয়ে বা গেরস্ত বাড়ির ডোবার পাশ দিয়েও নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

শূন্যস্থান পূরণ

১. ভাঁটার
২. নদী-নালা, ক্ষেত
৩. ছইয়ের মধ্যে; ঘোমটা
৪. ওপরে ছোঁ হয়ে
৫. ঘোমটার; এক জোড়া চোখ
৬. এক রাইতের; নাইয়র
৭. সজোরে নাড়া
৮. চোখজোড়া পাথরের
৯. বোবা চাউনি
১০. বয়ে চলল; ধীরে কখনো জোরে; মিষ্টি মধুর ছন্দে।

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন ১ : মন্তু ও টুনির জীবনের পরিণতি বর্ণনা করুন।

উত্তর : মন্তু আর টুনি বাংলাদেশের যেকোন গ্রামের দুটি যুবক যুবতী। তাদের জীবনের অসংখ্য রঙিন স্বপ্ন, কিন্তু সে স্বপ্ন অধিকাংশ সময়ই সফলতার মুখ দেখতে পায় না। এক্ষেত্রে মন্তু আর টুনির জীবনের চাওয়া-পাওয়া আরো বেশি সমস্যা সম্পন্ন। টুনি সমাজ ব্যবস্থার শিকার হয়ে অল্প বয়সে বুড়ো মকবুলের সংসারে তার তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে উপস্থিত হয়। প্রায় কিশোরী একটি মেয়ে জীবনের শুরুতেই যেন অচরিতার্থতার বেদনা নিয়ে জেগে ওঠে বাস্তবের কঠিন জগতে। মকবুলকে কোনভাবেই সে স্বামী হিসেবে মেনে নিয়ে শ্রদ্ধা-সম্মান ও ভালবাসার আসনে বসাতে পারে না। ফলে তার স্বপ্নগুলো কোন দিনই দল মেলে বিকশিত হবার সুযোগ পায় না। জীবনের এই রূঢ়তার মধ্যে টুনির জীবনে মকবুল এক টুকরো মুক্ত আকাশের মতো, যেখানে সে মুক্তির আনন্দ খুঁজে পায়। ফলে দুজনের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ একটি পবিত্র সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা দুজনে একসঙ্গে শাপলা তুলতে যায়, রাতেরবেলা অন্যের পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরে।

মন্তুও মা-বাবা হারা অসহায় এক যুবক। কাজের তেমন কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, যখন যা-পায় তাই করে। টুনির তার জীবনে যেন স্নেহের পরশ হিসেবে দেখা দেয়; আনন্দহীন জীবনে সে যেন খুঁজে পায় আনন্দময় এক স্বপ্ন জগত। কিন্তু বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে সে কেবল দুঃখই পায়। টুনিকে সে ভালবাসে, টুনিও তাকে ভালবাসে কিন্তু মকবুলের স্ত্রী হিসেবে টুনির যে পরিচয় তাকে সে কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারে না। মন্তুও পারে না টুনিকে নিয়ে সব কিছু পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও গিয়ে নিজেদের মতো করে সংসার শুরু করতে। কোথায় যেন তার সাহসে কুলায় না।

মকবুলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে টুনি আর মন্তু পরস্পর চিরদিনের মতো কাছে আসবার সুযোগ পায়, তখন একটি মানসিক দ্বিধা টুনিকে মন্তুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। ফলে সমগ্র উপন্যাসে এ দুটো চরিত্রের মানবিক আবেদন আমাদেরকে আনন্দ দেয় কিন্তু তাদের জীবনের অচরিতার্থ ও অপূর্ণ স্বপ্ন আমাদের দুঃখ দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পাঠ ১৮

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- হাজার বছর ধরে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি বলতে পারবেন।

এক আনার তামাক। আর দশ পয়সার বাতাসা।

কার্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের শুরু। ঘরে ঘরে ধান উঠছে। অনেক রাত পর্যন্ত কারো চোখে ঘুম থাকে না। কাজ আর কাজ। সারাদিন ধান কেটে এনে পাহারা দিয়ে রাখে। রাতে গরু দিয়ে মাড়ায়। তারপর ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখতে রাখতে রাত অনেক গড়িয়ে পড়ে।

হাঁ থেকে বাড়ি ফিরে এসে মন্তু দেখে, ওঠোনে আসর জমিয়ে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত আলীর বড় ছেলেটা। মৃত বাবার এ গুণটি অতি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছে সে। দূর থেকে শুনলে অনেক সময় বোঝাই যায় না । মনে হয় সুরত আলী বুঝি বসে বসে পুঁথি পড়ছে।

শুন শুন বন্ধুগণরে শুন দিয়া মন।
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন।

আজ ওঠোনে এসে দাঁড়াতে ওদের সবার কথা মনে পড়ল মন্তুর।

বুড়ো মকবুল, রশীদ, আবুল, সুরত আলী।

কেউ নেই।

জীবনের হাটে সকল বেচাকেনা শেষ করে দিয়ে একদিন অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা।

টুনির সঙ্গে দেখা হয়নি অনেক বছর।

প্রথম প্রথম খোঁজ-খবর নিত। আজকাল সে সময় হয়ে ওঠে না মন্তুর। সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে।

হীরন আজকাল বুড়ো মকবুলের ঘরে থাকে। বহু আগে প্রথম স্বামী তালাক দিয়েছে ওকে। আবার বিয়ে হয়েছিল। বছর তিন চারেক ঘর-সংসার করার পর সেখান থেকেও তালাক পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। তারপর আর বিয়ে হয় নি।

আবার ওর একটা ভাল দেখে বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে মন্তু। এখন সে বাড়ির কর্তা। সবার বড়। যে-কোন কাজে সবাই এসে পরামর্শ নেয় ওর।

ওঠোনে এসে দাঁড়াতে ওর হাত থেকে পান, তামাক আর বাতাসাগুলো এগিয়ে নিল আম্বিয়া। তারপর কোলের বাচ্চাঁটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, দুপুর থাইকা কানছে, একটু কোলে নাও।

কোলে নিয়ে ছেলেকে আদর করল সে।

মন্তুকে এগিয়ে আসতে দেখে সবাই পথ ছেড়ে আসরের মাঝখানে বসাল ওকে। এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে এনে ওর হাতে দিয়ে গেল আম্বিয়া। ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগল। চাঁদ হেলে পড়ল পশ্চিমে।

ওঠোনের ছায়াঁটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল। পরীর দিঘির পাড়ে একটা রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা গেল। সুরত আলীর ছেলেটা তখনো একটানা পুঁথি পড়ে গেল।

কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ।
আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকুলের পরী।

সুর করে ঢুলে ঢুলে এক মনে পুঁথি পড়ছে সে।

রাত বাড়ছে।

হাজার বছরের পুরনো সেই রাত।

বস্তুসংক্ষেপ

এ পাঠটির মধ্যে সমগ্র উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি বর্ণনা করা হয়েছে। উপন্যাসটির পরিশেষে আমরা দেখতে পাই টুনি আর মন্তুর জীবনে সে ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তা অচরিতার্থই রয়ে গেছে। মন্তু বিয়ে করেছে আম্বিয়াকে। তাদের একটি সন্তানও আছে। অনেক বছর হল টুনির সঙ্গে দেখা হয় না। প্রথম প্রথম খোঁজ খবর নিতো টুনির কিন্তু কাজে কর্মে এখন ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আজকাল আর টুনির খোঁজখবর নিতে পারে না মন্তু। বুড়ো মকবুল, আবুল, সুরত আলী সবাই পরপারে চলে গেছে। হীরনের বার দুয়েক বিয়ে হয়েছিল, দুবারই তালাক হয়ে গেছে। এখন সে বুড়ো মকবুলের ঘরে থাকে। মন্তু চেষ্টা করছে তাকে আর একটি ভালো বিয়ে দেবার। কারণ এখন সে-ই বাড়ির কর্তা।

সবাই মরে যায় কিন্তু রেখে যায় উত্তরাধিকার। যেমন সুরত আলী তাঁর ছেলেকে রেখে গেছে আর দিয়ে গেছে পুঁথি পড়ার চমৎকার গুণ। মকবুল নেই কিন্তু হীরন রয়েছে। একদিন হয়তো মন্তুও থাকবে না কিন্তু তাদের উত্তরাধিকার থাকবে। এই দিন থাকবে না অন্য দিন এসে যাবে, যেমন এই সকল মানুষ থাকবে না অন্য মানুষেরা এসে পৃথিবীতে বসবাস করতে শুরু করবে। 'হাজার বছর ধরে' পৃথিবী এভাবেই চলেছে-হয়তো চলবে আরো হাজার হাজার বছর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ঘরে ঘরে কখন নতুন ধান ওঠে?
২. কীভাবে ধান মাড়াই করা হয়
৩. মন্তু এখন টুনির খোঁজখবর নিতে পারে না কেন?
৪. হীরন আজকাল কোথায় থাকে?
৫. ওঠোনে এসে দাঁড়াতেই আম্বিয়া মন্তুর হাত থেকে কী নেয়?
৬. সুরত আলীর ছেলেটা পুঁথি পাঠের গুণটি কীভাবে রপ্ত করেছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি বর্ণনা করুন।

ব্যাখ্যা লিখুন

১. জীবনের হাটে সকল বেচাকেনা শেষ করে দিয়ে একদিন অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা।
২. রাত বাড়ছে। হাজার বছরের পুরনো সেই রাত।

উত্তরমালা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. কার্তিকের শেষে, অগ্রহায়ণের শুরুতে।
২. গরু দিয়ে ধান মাড়াই করা হয়।
৩. কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকে বলে।
৪. বুড়ো মকবুলের ঘরে।
৫. ওঠোনে এসে মন্তু দাঁড়াতেই আম্বিয়া তার হাত থেকে পান, তামাক আর বাতাসাগুলো নেয়।
৬. তার বাবার কাছ থেকে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উপন্যাস কাকে বলে? উপন্যাস হিসেবে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটির সার্থকতা বিচার করুন।
২. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করুন।
৩. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে বিধৃত গ্রামীণ সমাজজীবনের পরিচয় দিন।

৪. 'মন্তু' চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে লেখক পুরাতনের বিদায় ও নতুনের আগমন বার্তা ঘোষণা দিয়েছেন। - মন্তুর চরিত্র আলোচনা করে উক্তিটি বিচার করুন।
৫. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোকে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবন-কাহিনী আলোচনা করুন।
৬. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কে? উপন্যাসটির পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।
৭. বুড়ো মকবুলের চরিত্র আলোচনা করুন।
৮. আম্বিয়া চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে উপন্যাসে তার গুরুত্ব কোথায় তা বুঝিয়ে লিখুন।
৯. বুড়ো মকবুল কেন আম্বিয়াকে বিয়ে করতে চায়? আম্বিয়াকে বিয়ে করতে চাওয়ার ফলে বুড়ো মকবুলের সংসারে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা দিন।
১০. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে বিধৃত গ্রামীণ একান্নবর্তী পরিবারের বর্ণনা দিন।

প্রশ্ন ১ : উপন্যাস কাকে বলে? উপন্যাস হিসেবে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটির সার্থকতা বিচার করুন।

উত্তর : শুধু কতগুলো শব্দের সাহায্যে কোন সৃষ্টিশীল বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করা দুরূহ। উপন্যাস যেহেতু একটি সৃষ্টিশীল প্রকাশ মাধ্যম ফলে সকলের কাছে সমানভাবে গৃহীত কোন সংজ্ঞা উপন্যাসের বেলাতে সৃষ্টি হয়নি। তবে বৈশিষ্ট্যানুসারে বলা যায় 'গ্রন্থাকারের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনীকে অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্প কর্মে রূপায়িত হয়, তাকে উপন্যাস বলে' অন্যদিকে উপন্যাস শব্দটির অর্থের মধ্যেও পাওয়া যায় এর প্রকৃতিগত পরিচয়। 'উপ'পূর্বক 'নি'পূর্বক '√অস' ধাতুর সঙ্গে 'অ' প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে 'উপন্যাস' শব্দটি; যার অর্থ 'উপস্থাপনা'। Dictionary of Literary Terms এ উপন্যাসকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে- It is a form of story or prose narrative containing characters, action and incidents and perhaps a plot.
মানুষের জীবন বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার পুঞ্জীভূত রূপ। জীবনের সুখ-দুঃখ, পাওয়া না পাওয়া, সাফল্য-ব্যর্থতার বিপরীতমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সব সময় হাত ধরাধরি করে চলে। একজন ঔপন্যাসিক মানুষের জীবনের ঐ সব চেতনাপুঞ্জকে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভবের আলোকে বিশ্বাসযোগ্য ও রসময় করে ঠাঁই দেন উপন্যাসে। এ কারণে উপন্যাস লেখককে হতে হয় মানব জীবনের বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতার নিখুঁত রূপকার। কোন একটি উপন্যাস সার্থক কিংবা ব্যর্থ তা নির্ভর করে ঐ উপন্যাসে লেখক ঘটনা (Plot) বিন্যাসে, চরিত্র (Character) নির্মাণে, সংলাপ (Dialogue) রচনায়, ভাষা (Diction) ব্যবহারে এবং উপন্যাসে লেখকের জীবন দর্শন (Author's philosophy) প্রকাশে কতটা সার্থক বা ব্যর্থ তার ওপর। সার্থক উপন্যাসের যে-সকল বৈশিষ্ট্য ওপরে নির্দেশ করা হয়েছে তার সাহায্যে এবারে বিবেচনা করে দেখা যাবে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের শিল্প সাফল্য বা সার্থকতা।

উপন্যাস হিসেবে 'হাজার বছর ধরে'

ঘটনা বিন্যাস

আলোচনার শুরুতেই বিবেচনা করা যাক 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটির ঘটনা বিন্যাসে লেখকের সাফল্য কতটুকু। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে হাজার বছর ধরে উপন্যাসটি চিরকালের বাংলাদেশের পটভূমিতে রচিত। উপন্যাসটির নামকরণের মাধ্যমেই লেখক নির্দেশ করেছেন যে এখানে যে গ্রামীণ জনজীবনের সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সাফল্য-ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে তা মূলত হাজার বছরের পুরনা, সেখানে পরিবর্তন নেই, জীবনের গতি নেই, সংস্কার ও অগ্রগতির কোন ছোঁয়া নেই। এই অপরিবর্তিত সমাজ কাঠামোর মধ্যকার সহজ, সরল, অনাড়ম্বর মানুষগুলোই জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের মূল উপজীব্য। কিন্তু সার্থক উপন্যাসের অনিবার্য শর্ত হিসেবে ঘটনার যে দৃঢ়বদ্ধ বুনন প্রয়োজন, 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে তেমনটি আমরা দেখতে পাই না। টুকরো টুকরো ঘটনা গেঁথে লেখক ঘটনার পূর্ণ রূপ দিতে চেয়েছেন বটে তবে তা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে এমন বলা যাবে না।

চরিত্র নির্মাণ : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র মন্তু আর টুনি। তবে সমগ্র উপন্যাসে দেখা যায় মকবুলের চরিত্রই উপন্যাসটির গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। এগুলো ছাড়া অসংখ্য অপ্রধান চরিত্রও উপন্যাসটিতে এসে ভিড় করেছে কিন্তু চরিত্রগুলো আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপরে দাঁড়িয়ে পাঠকের কাছে স্মরণীয় হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। উপন্যাসটির প্রতিটি চরিত্রই প্রতিটি চরিত্রের চেনা ও জানা কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতা ও নিবিড়তা গড়ে ওঠেনি। ফলে

চরিত্রগুলো বিকশিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবে স্বল্প পরিসরে হলেও মকবুল, মন্তু, টুনি ও আম্বিয়া চরিত্র লেখকের শিল্প কুশলতা ও চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

সংলাপ রচনা : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে লেখক সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষাকে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন এ উপন্যাসে। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা উপন্যাসটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ায় তা হয়ে ওঠেছে মূল্যবান এবং পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক এখানে পূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ভাষা ব্যবহার : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের ভাষা বর্ণনাধর্মী, আবেগময় ও চিত্তাকর্ষক। গ্রামীণ সহজ-সরল মানুষগুলোর মতো এ উপন্যাসের ভাষাও সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর। চরিত্রগুলোর আঞ্চলিক উচ্চারণ এবং তাদের বাক্যগঠন প্রক্রিয়াকে লেখক দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

জীবনদর্শন : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটি গ্রামবাংলার এক বিশ্বস্ত দলিল। গ্রামবাংলার পরিবর্তনহীনতার মধ্য দিয়ে এবং নারী সমাজের দুঃখজনক ও মর্মন্তুদ সামাজিক অবস্থা প্রকাশের মধ্য দিয়ে লেখক এ-সত্যে উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন যে, মানবিকতার মূল্য স্বীকৃত না হলে, সমাজের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব না হলে ব্যক্তিমানুষের মুক্তি নেই। জীবনের প্রতি লেখকের এই যে প্রবল আগ্রহ ও আসক্তি তাই-ই এ উপন্যাসকে মহত্ত্ব দিয়েছে।

উপসংহার : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক জহির রায়হান পরিবর্তনহীন, নিস্তরঙ্গ, গ্রামীণ জীবনকে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ঘটনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সঙ্গতি ও দৃঢ়বদ্ধতার অভাব থাকলেও তা পাঠকের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। নির্মাণের ক্ষেত্রে অবিন্যস্ততা লক্ষ করা গেলেও প্রধান চরিত্রগুলো তাদের সামগ্রিকতা দিয়ে পাঠকের হৃদয় জয় করে নিতে পেয়েছে। 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটিকে এ কারণে পূর্ণাঙ্গ সফল উপন্যাস না বলে একটি স্কেচধর্মী উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আর স্কেচধর্মী উপন্যাসও যেহেতু সমগ্রতার আভাস ও আস্বাদ দেয়। এ-বিবেচনার মাধ্যমেই আমরা 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটিকে একটি অনন্য ও সার্থক উপন্যাস বলতে পারি।

প্রশ্ন ২ : হাজার বছর ধরে উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করুন

উত্তর : ভূমিকা : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার একটি বিখ্যাত চরণের কয়েকটি শব্দবন্ধ নিয়ে। কবিতাটির ঐ চরণটি হচ্ছে 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'। জীবনানন্দ দাশের ঐ কবিতাটিতে চিরকালের প্রকৃতি এবং মানব প্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয় এবং সে সঙ্গে মানব জীবনের হাজার বছরের ধারাবাহিকতা ও অগ্রগতি সম্পর্কে কবির মনোভাবও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কথাশিল্পী জহির রায়হান তাঁর উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। কারণ 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসেও লেখক হাজার বছরের বাংলাকে এবং তার জনজীবনকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছেন। সুতরাং উপন্যাসের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত জীবন সত্যের প্রতি লক্ষ রেখেই ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের নামকরণ করেছেন, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে বিষয়বস্তু ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের বিবেচনায় উপন্যাসের এ নামকরণ কতটুকু সার্থক তা বিচার করে দেখতে হবে।

হাজার বছর ধরে উপন্যাসের বিষয়বস্তু : হাজার বছরের নিস্তরঙ্গ গ্রামবাংলার যেকোন একটি গ্রামের অধিবাসী টুনি, মন্তু, আম্বিয়া মকবুলসহ আরো অনেকে। তারা ছোঁ ছোঁ ঘর তুলে একসঙ্গে গাদাগাদি করে বাস করে। এদের জীবনের ব্যাকরণটাই যেন আলাদা। কারো দুই বউ, কারো বা তিন; কেউ বা একটার পর একটা বউ পিটিয়ে মেরে ফেলে; কেউ বা হালের বলদের অভাবে বউদের জুড়ে দেয় জোঁয়ালের সঙ্গে। আবার অন্যদিকে সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যে জন্মে ভালবাসার মুকুল। কিন্তু সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে তাদের সে ভালবাসা বিকশিত হবার সুযোগ পায় না। তারা প্রতিদিন ভোর না হতেই খাল থেকে তুলে আনে প্রস্ফুটিত শাপলা কিন্তু তাদের বাসনার ফুল কোন দিনই প্রস্ফুটিত হয় না। এই সব সরল, অনাড়ম্বর, সাধারণ মানুষের ভাললাগা-মন্দলাগা, চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা, ঈর্ষা-অসূয়া নিয়েই রচিত হয়েছে 'হাজার বছর ধরে'। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় সময়ের হাত ধরে বিদায় নেয় একটি কালের প্রতিনিধি মকবুল, সুরত আলীসহ আরো অনেকে কিন্তু ঐ সমাজের নতুন প্রতিনিধি এসে আগের স্থান অধিকার করে নিলেও সমাজ বদলায় না- একই সুরে পুঁথি পড়া হয় আর

উঠানে বসে সবাই তা শোনে। এই পরিবর্তনহীন হাজার বছরের গ্রামবাংলা এবং গ্রামবাংলার মানুষকে সার্থকভাবে তুলে এনেছেন জহির রায়হান এ উপন্যাসে।

নামকরণের সার্থকতা বিচার : জহির রায়হান তাঁর এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনজীবনের পরিবর্তনহীনতা, ও গতিহীনতাকে পাঠকের সামনে পরম মমতোয় ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন জন্মগ্রহণ, বিয়ে ও মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে যে গ্রামবাংলা দীর্ঘকাল ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে তার গহীন অন্ধকারে সভ্যতার কোন আলো পৌঁছাতে পারে না। মকবুল মারা যায় কিন্তু মন্তু হয়ে ওঠে নতুন মকবুল, সুরত আলী মারা যায় কিন্তু তার পুত্র শিখে নেয় পুঁথি পাঠের কৌশল, হীরন তার দ্বিতীয় স্বামীর সংসারেও টিকতে পারে না, যেমন পারেনি তার মা। সুতরাং কোন কিছুই বদলায় না, কোন পরিবর্তনের ছোঁয়াই তাতে লাগে না। হাজার বছরের এই পুরাতন, অনড়, অজড় গ্রামীণ জনজীবনকেই ঔপন্যাসিক নামকরণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপসংহার : গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তনহীনতার যে চিত্র ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন তার সূত্র ও তাৎপর্য প্রকাশের জন্য 'হাজার বছর ধরে' নামটি যথার্থ, সার্থক ও অসামান্য। তাছাড়া কাব্যধর্মী এ নামটি জীবনানন্দ দাশের কবিতার অংশ হওয়ায় তা বিশেষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে ওঠেছে।

প্রশ্ন ৩ : হাজার বছর ধরে উপন্যাসে বিধৃত গ্রামীণ সমাজ জীবনের পরিচয় দিন।

উত্তর : ভূমিকা : জহির রায়হান বাংলাদেশের কথা সাহিত্যে এক অনন্য নাম। তাঁর রচনায় বাংলাদেশের জন্য জীবন, জীবনের সংঘাত-সংগ্রাম, দুঃখ-বেদনা এবং স্বপ্ন-সম্ভাবনার কথা অত্যন্ত আন্তরিকতায় ও পরম আগ্রহে রূপায়িত হয়। 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে ঔপন্যাসিক পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জীবন এবং সামাজিক বাস্তবতাকে নিপুণ শিল্পীর মতো পরম সংবেদনশীলতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে গ্রামবাংলার যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার কোন পূর্ণাঙ্গ রূপ সমগ্র উপন্যাসে পাওয়া যায় না। লেখক অবশ্য সে চেষ্টাও করেননি। এ উপন্যাসে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামবাংলার কতগুলো স্কেচকে তিনি একত্রে উপস্থাপন করে তার মাধ্যমে পাঠকের মনে গ্রামীণ সমাজ বাস্তবতার একটি সামগ্রিক ধারণা প্রদান করবেন। বস্তুত লেখকের এই উদ্দেশ্য হাজার বছর ধরে উপন্যাসে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। নিম্নে গ্রামীণ সমাজ বাস্তবতার যে সকল ক্ষেত্রে জহির রায়হান সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন সেগুলোর পরিচয় দেয়া হল :

গ্রামীণ সমাজের পরিবেশ ও প্রতিবেশ : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের পটভূমি এমন এক গ্রামকে কেন্দ্র করে উন্মোচিত যেখানে সভ্যতার আলো খুব সুলভ নয়। জীবন যাপনে এবং চিন্তায় উপন্যাসে পাত্রপাত্রীরা আঁকা পড়ে আছে সামন্ত সমাজের কঠোর বন্ধনে। শিক্ষাবিহীন সরল ও ধর্মভীরু ঐ সকল মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জায়গা করে নেয় নানাবিধ কুসংস্কার। ফলে তারা ওলা ওঠাকে মনে করে আল্লাহর গজব, কিশোরী মেয়ের বয়:সন্ধির অস্বাভাবিক আচরণকে মনে করে জিনে ধরা আর সেই সুবাদে গনু মোল্লার ঝাড় ফুঁক ও বশীকরণ সব মিলে এক অদ্ভুত সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয় এ-উপন্যাসে।

নারীর অবস্থান : যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চিত্র 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে সেখানে নারী জীবনের মূল্যই সবচেয়ে উপেক্ষিত ও অবহেলিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্বাধীন অস্তিত্ব অস্বীকৃত, তাই তাদের মতোটামতো দেবার উপযুক্ত বয়স হবার আগেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। তারা পুরুষের ইচ্ছার পুতুল এবং পশুতুল্য। এ কারণেই মকবুল তার তিন বউকে দিয়ে ধান মাড়াই করে, মাটি কোপানোর কাজ করায়, রাত জেগে ধান ভানায় এমন কী হালের বলদের অভাবে বউকে জোঁয়ালের সঙ্গে বেঁধে দিতেও দ্বিধা করে না। এ-ছাড়া কারণে অকারণে আবুলের মতো বদরাগী মানুষেরা একেরপর এক বউ পিটিয়ে মেরে ফেলে, কথায় কথায় তালাক দিয়ে দেয় কিন্তু তার কোন বিচার হয় না।

সামাজিক আচার-আচরণ : উপন্যাসটিতে সামাজিক আচার আচরণের বেশ কয়েকটি প্রাণবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে হীরনের বিয়েকে কেন্দ্র করে ফকিরের মায়ের নৃত্য এবং মেয়েদের সম্মিলিত গীত বিশেষভাবে গ্রামীণ সমাজকে প্রকাশ করে। তাছাড়া হীরণের বিয়ের দিন খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা, টুনিদের বাড়িতে মন্তুর প্রতি দেখানো আতিথেয়তা গ্রামবাংলার চিরকালীন অতিথিপরায়ণতার কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া বিয়ের কথাবার্তা পাকা করতে এসে পণ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে দরকষাকষি, বিয়ের পর মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাবার সময় খালি হাতে না গিয়ে ডিম নিয়ে যাওয়া এসব কিছুই গ্রামীণ সমাজকে পাঠকের সামনে একটি অনবদ্য রূপে উপস্থিত করে।

জীবন স্পন্দন : আবহমান বাংলার গ্রামীণ সমাজের শোষণ-বঞ্চনা, অভাব-অনটনের মধ্যে টুনি আর মন্তুর জীবনধারার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক একটি ভিন্ন ধারার প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। টুনি আর মন্তু সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রতিদিন ভোরে শাপলা তুলে আনে, রাতেরবেলায় জাল ফেলে অন্যের পুকুর থেকে মাছ ধরে, কিংবা খেজুরের রস নামিয়ে আনবার জন্য টুনির গাছে ওঠার দৃশ্য বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি পরিবর্তনহীন গ্রামীণ সমাজেও জীবনের অমোঘ স্পন্দন থেমে থাকে না, জীবন তার আপন গতিতেই বয়ে চলে।

উপসংহার : সমাজের খণ্ড খণ্ড চিত্র রচনার মধ্য দিয়ে জহির রায়হান 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে আবহমান গ্রামবাংলাকেই তুলে আনতে চেয়েছেন। এ উপন্যাসে চরিত্রগুলো যে সমাজের মধ্যে বিচরণশীলতার মধ্যে সমস্যাই প্রকট, সমাধানের মধ্যে বিচরণশীলতার মধ্যে সমস্যাই প্রকট, সমাধানের ইঙ্গিতও নেই। জহির রায়হান তাঁর অসামান্য শিল্প দৃষ্টি দিয়ে পাঠককে উপহার দিয়েছেন গ্রামবাংলার চির চেনা ও চিরকালের সামাজিক রূপকে।

প্রশ্ন ৪ঃ "মন্তু' চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে লেখক পুরাতনের বিদায় ও নতুনের আগমন বার্তা ঘোষণা।" - মন্তু চরিত্র আলোচনা করে উক্তিটি বিচার করুন।

***উত্তর :* ভূমিকা :** 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মন্তু এবং তাকে নায়ক চরিত্রও বলা যায়। মন্তু চরিত্রটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখক তাঁর ইতিহাস চেতনা এবং সময়ের বিবর্তনের বোধটিকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা সবকিছুই বদলে যায়। অতীত বিদায় নেয় কালের নিয়মেই আর ভবিষ্যৎ এসে সেখানে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। নিচে মন্তুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হল।

মন্তুর সামাজিক পরিচয় : শিকদার বাড়ির কয়েক ঘর বাসিন্দার একজন হচ্ছে মন্তু। সংসারে তার মা-বাবা নেই, একেবারে নিঃসঙ্গ একা মানুষ সে। চাচাতো ভাই মকবুলই তার একমাত্র আপনজন। সরল, গ্রাম্য যুবক মন্তু লেখাপড়া জানে না, তাছাড়া চাষের যোগ্য নিজের কোন জমিও নেই তাই অন্যের জমিতে কাজ করে। যখন মাঠের কাজ না থাকে লাকড়ি কাটে কিংবা করিম শেখের নৌকা চালায়। সুতরাং শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমেই মন্তু তার জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে বয়সের দিক দিয়ে তার মধ্যেকার কৈশোরতা চপলতা থাকলেও অভাব, দারিদ্র্যের কঠিন কষাঘাতে তার কিশোর সুলভ আচরণ সব সময় প্রকাশ পায় না।

কিশোর মন্তুর জীবন : যদিও অভাব দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মন্তু সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকে জীবিকার তাগিদে তবুও টুনির সঙ্গে সবাইকে লুকিয়ে যখন শাপলা তুলতে যায় কিংবা রাতের অন্ধকারে অন্যের পুকুরে লুকিয়ে মাছ ধরে তখন মনে হয় কোথায় যেন এই গ্রাম্য যুবকটির মধ্য থেকে কৈশোরের চাপল্য সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়নি।

নিরাসক্ত মনের অধিকারী মন্তু : মন্তু ছিল নিরাসক্ত মনের অধিকারী এক যুবক। গ্রামীণ পরিবেশে নানা ধরনের সামাজিক জটিলতা থাকলেও মন্তু কোথাও তার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেনি। এমন কী বাড়ির অন্যদের সঙ্গে যখন কারো না কারো ঝগড়া বিবাদ হয় তখন মন্তু নিজেকে তা থেকে সযত্নে পৃথক করে রাখে। শুধু তাই নয়, দূরের প্রতি একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ছিল মন্তুর। এ-কারণে করিম শেখের নৌকা নিয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে, এক গঞ্জ থেকে আরেক গঞ্জে ঘুরে বেড়াতে তার ভালো লাগতো। মা-বাবার স্নেহ বঞ্চিত হওয়ায় কিংবা কোন ধরনের পিছু টান না থাকায় তার মধ্যে এ-ধরনের উদাসীনতা ও নিরাসক্তি তৈরি হয়েছিল।

মন্তু ও টুনির সম্পর্ক : মন্তুর সঙ্গে টুনির যে মানবিক সম্পর্ক তাকে ঠিক বিশেষ কোন নামে অভিহিত করা যায় না। তবে প্রতিকূল পরিবেশের চাপে পড়েই মন্তু আর টুনি পরস্পরের কাছে এসেছিল। টুনি বুড়ো মকবুলের মধ্যে তার স্বপ্নের কোন মিল খুঁজে পায়নি। অন্য দিকে মন্তু ছিল নিঃসঙ্গ, একা একটি মানুষ। সেই সঙ্গে তাদের বয়সের সমতোটার কারণেও মন্তু আর টুনি পরস্পর কাছাকাছি এসেছিল। হয়তো মনে মনে তারা দুজন দুজনকে ভালও বাসতো। কিন্তু তাদের মধ্যে সামাজিক শাসনের দীর্ঘ দেয়াল ছিল কিছুতেই তা তারা অতিক্রম করতে পারেনি। মকবুলের মৃত্যুর পর মন্তু যখন একান্ত নিজের করে পেতে চেয়েছিল তখন টুনির যে মানসিক অবস্থার বিরাঁ পরিবর্তন এসে গিয়েছিল তার কারণেই আর দুজনের পক্ষে নতুন করে জীবন শুরু করা সম্ভব ছিল না।

মন্তুর পরিবর্তিত জীবনবোধ : সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মন্তুর পরিবর্তন ঘটেছে- যে পরিবর্তন যেমন একদিকে মানসিক তেমনি অন্যদিকে অবস্থানগত। জীবনের একটি পর্যায়ে এসে মন্তু আম্বিয়াকে বিয়ে করে সংসারী হয়। তাদের কোল আলো করে সন্তানের জন্ম হয়। একদিন শিকদার বাড়িতে মকবুলের অবস্থান যা ছিল সেখানে আজ মন্তুর স্থান। কালের নিয়মেই মকবুল চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে আর তার জায়গা অধিকার করেছে মন্তু। এ-যেন মহাকালের অমোঘ প্রবাহে জীবনের এক নির্দিষ্ট চক্র। অতীতের বিদায়ের ঘণ্টা বাজে আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হয় নতুনের আগমন বার্তা।

উপসংহার : মন্তু চরিত্রটি ঔপন্যাসিক জহির রায়হানের এক অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি তাঁর মানবিক সহানুভূতি এবং পরিবর্ধমান কালের বোধের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তু চরিত্রকে স্থাপন করেছেন। এ-চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক যে অমোঘ সত্য পাঠকের কাছে প্রদান করতে চেয়েছেন তার সার্থকতা ও যথার্থতা লাভ করেছে।

প্রশ্ন ৫ঃ 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কে? উপন্যাসটির পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটি পাঠ করতে শুরু করলে বেশ কয়েকটি চরিত্র পাঠককে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়, তাদের ভালবাসার দাবীদার হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে মন্তু, টুনি, বুড়ো মকবুল এবং আম্বিয়ার গুরুত্ব উপন্যাসের শুরু থেকেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু যতই উপন্যাসের জটিলতা ঘনীভূত হয়, যতই উপন্যাস সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে দেখা যায় বুড়ো মকবুল এবং আম্বিয়া চরিত্র দুটি ক্রমশ পাঠকের দৃষ্টি থেকে সরে যায়। অবশিষ্ট দুটি চরিত্র- মন্তু ও টুনি হয়ে ওঠে উপন্যাসের মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু উপন্যাসের পরিণতিতে এসে আমরা দেখি উপন্যাসের সকল জটিলতা ও তার অবসান ঘটে টুনি চরিত্রকে কেন্দ্র করে, টুনিই হয়ে ওঠে উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ফলে আমরা সহজেই 'হাজার বছর ধরে' কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে টুনিকে মেনে নিই, বা নিতে বাধ্য হই। নিচে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে টুনির চরিত্র বিশ্লেষণ করা হল।

টুনি গ্রামবাংলার এক সাধারণ মেয়ে। নবীনগর গ্রামে তার জন্ম এবং সেখানকার আলো-বাতাসেই সে বেড়ে ওঠেছে। কিন্তু জীবনের ছন্দ ও আনন্দময় কৈশোর অতিক্রম করার আগেই সামাজিক অপরাধের অংশ হিসেবে টুনি হয়ে পড়ে শিকদার বাড়ির অভিজ্ঞ ও প্রধান পুরুষ মকবুলের তৃতীয় স্ত্রী। ছিপছিপে গড়নের কালো দুটি আয়ত চোখের অধিকারী তের-চোদ্দ বছরের বালিকা টুনি সংসার সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবার আগেই সাংসারিক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়।

যদিও সে তার স্বভাবসুলভ কৈশোর চাপল্য, সমবয়সীদের সঙ্গে আনন্দ করার অভ্যাস তখনো পুরোপুরি ছাড়তে পারেনি।

টুনির যে পরিচয় আমরা ওপরে পেলাম তা থেকে বোঝা গেল টুনি সামাজিক নিষ্ঠুরতার অসহায় বলী। সে কিশোরী কিন্তু তাকে বৃদ্ধ স্বামীর তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে তাকে সংসার করতে হচ্ছে যদিও সে সংসারের কিছুই জানে না। নারীর প্রতি এ-ধরনের অন্যায় আচরণ গ্রামবাংলায় প্রতিনিয়তই ঘটে; টুনি এ-উপন্যাসে তাদেরই একজন হিসেবে ওঠে এসেছে। এদের জীবনে কোন প্রাপ্তি নেই- রয়েছে কেবল বঞ্চনা, কেবল নির্যাতন, কেবল নিপিড়ন। সেই বঞ্চনাময় জীবনের মধ্যে বেঁচে থাকার সম্বল হিসেবে বিবেচনা করতো মন্তুর সঙ্গে তার মানবিক ও নির্মল সম্পকর্কে।

টুনি আর মন্তু প্রায় সমবয়সী, মন্তু খানিকটা বড়। মকবুলের সংসারে যে বিরুদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে টুনির দিন কাঁতো সেখানে খানিকটা স্বস্তির আস্বাদ ছিল মন্তুর সঙ্গে তার সম্পর্কের ফলে। ভোর না হতেই শাপলা তোলা, অন্যের পুকুর থেকে মাছ ধরা, কিংবা মাঝ রাতে খেজুর রস নামিয়ে আনার মধ্য দিয়ে টুনি আর মন্তুর সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্কটি প্রকাশিত হয়। তাদের এই সম্পর্ক একটি চমৎকার পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলে হয়তো আমরা অবাক হতাম না। কিন্তু জীবনের বিচিত্র জটিলতায় তাদের মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি হয়ে যায়। ফলে যে মুহূর্তে টুনিকে মন্তু একান্ত করে পেতে চায়। ততদিনে টুনি আর উচ্ছলতায় ভেসে যাওয়া কিশোরী নেই। সে পরিণত হয়েছে বিধবা নারীতে। ফলে তার জীবনে নেমে আসে না-পাওয়ার এক অসীম শূন্যতা। শূন্যতার, অপ্রাপ্তির এই চরম ট্রাজিক রূপই টুনিকে পাঠকের কাছে অমর করে দেয়।

টুনিকে জহির রায়হানের এ উপন্যাসে পরিপূর্ণ মানবিক করে অঙ্কন করেছেন। তার চরিত্রের এক দিকে যেমন রয়েছে সেবা পরায়ণতা স্বামীর প্রতি ভালবাসা, অন্যদিকে মন্তুর ভালবাসাকে একান্ত নিজের করে পাবার জন্য আম্বিয়ার প্রতি তার ঈর্ষার অন্ত ছিল না। আম্বিয়ার ব্যাপারে তার মনোভাব মাঝে মাঝে প্রতিহিংসার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই সে বুড়ো মকবুলকে প্ররোচিত করে আম্বিয়াকে বিয়ে করতে। কিন্তু মকবুলের আহত হওয়া এবং তার বড় দুই বউকে তালাম দেবার ঘটনার আকস্মিকতায় টুনির চরিত্রে ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন। সে পরিবর্তিত টুনিকেই আমরা দেখতে পাই উপন্যাসের পরিণামী ট্রাজেডিকে ধারণ করে দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিতে।

টুনি জহির রায়হানের এক অসাধারণ সৃষ্টি। প্রথাগত উপন্যাসের নারী চরিত্রের মতো টুনি অচল কোন চরিত্র নয়। সে সদা চঞ্চল, কর্মকুশলী এবং উপন্যাসের মূল গতি ও প্রকৃতির নিয়ন্তা। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের অন্য সব চরিত্র। ফলে উপন্যাসের পরিণামী বেদনাও সে নিঃসঙ্গ ও একাকী ধারণ করেছে। ফলে নিঃসন্দেহে তাকে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূল পাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।